শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত।

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক
[illegible]।

তৃতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ সংস্করণ

১৩৩৪

মূল্য—১॥০ টাকা।

-প্রকাশক—
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
২নং আনন্দ চাটুজ্জির লেন
বাগবাজার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

—•:✻:•—

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

পাঠকগণের প্রতি।

রসলোলুপ পাঠক প্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, প্রভুর নবদ্বীপের বাহিরের লীলায় সে রস প্রত্যাশা করিতে পারেন না। প্রভুর মাধুর্য্য লীলাই মধুর; আর মাধুর্য্য লীলা শ্রীজগন্নাথ, শচী, বিশ্বরূপ, বিষ্ণুপ্রিয়া, নদেবাসী ভক্ত ও সখাগণ লইয়া। প্রভু যখন গৃহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার নিজজন প্রায় সকলেই শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। প্রভুর নীলাচল লীলাতেও কারুণ্যরস প্রচুর আছে সত্য বটে, কিন্তু তবু, "নিমাই সন্ন্যাস" একবার বই দুইবার হয় না। বলিতে কি, যিনি নিমাইচাঁদ, শচীর দুলাল, বিষ্ণুপ্রিয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও মুরারির প্রভু,—তিনি কাটোয়া হইতে গুপ্ত হইলেন, কি গুপ্তভাবে শ্রীনবদ্বীপে রহিলেন। যিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী, ত্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ। নবদ্বীপে যিনি গুপ্তভাবে রহিলেন, তিনি পূর্ণ; নীলাচলে যিনি গমন করিলেন, তিনি নারায়ণ,—শ্রীভগবানের সৎ ও চিৎ শক্তি। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর লীলা বলিতেছি, সুতরাং স্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে। অতএব এ খণ্ডে শুদ্ধ রসচর্চ্চা চলিবে না।

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যখন শ্যামসুন্দর মথুরায় গমন করিলেন, তখন সেই মুরলীধর দণ্ডধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনমালী, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ বেষ্টিত মহারাজ হইলেন। সেইরূপ মাধুর্য্যময়, কৌতুকপ্রিয়, স্নেহশীল, চঞ্চল এবং সুকেশ ও সুবাস-মালতীমাল,

সম্বলিত নিমাইচাঁদ, এখন অতি জ্ঞানী, গম্ভীর, ধীর, দয়ালু, দণ্ড-কৌপীন ও ছিন্নকন্থাধারী, গুরুরূপে প্রকাশ পাইলেন।

অপর, নির্লজ্জ হইয়া এস্থলে নিজের একটি কথা বলিতে হইল বলিয়া বলিব। আপনারা আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যখন আমি এই খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বহুদিন আমার এরূপ হয়েছে যে, নিশিযোগে শয়নকালে আমি আমার নিজ-জনের নিকট বিদায় লইয়া শয়ন করিয়াছি। কারণ কোন কোন দিন আমি আপনাকে এত দুর্ব্বল দেখিতাম যে, বোধ হইত, এই রজনীর মধ্যে আমার আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।

এক নিশিতে আমি অতি দুর্ব্বল অবস্থায় শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত জগৎ নীরব, আমি স্বয়ং কি অবস্থায় আছি ঠিক বলিতে পারি না। কখন বোধ হইতেছে, আমি এ জগতে আছি, কখন বোধ হইতেছে অন্য জগতে গিয়াছি। এমন কি, আমি মনের মধ্যে বিচার করিতেছি যে, আমি কোথায়? এমন সময় যেন কেহ আমাকে বলিলেন, "হিন্দুধর্ম্মে প্রচার নাই, এ কথা ঠিক নহে।"

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে এই কথা অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হইয়াছিল, যথা—"হিন্দুধর্ম্মে প্রচার কার্য্য নাই, হিন্দুর পুত্র হিন্দু হয়, হিন্দুরা ভিন্ন-জাতীয়গণকে স্বধর্ম্মে গ্রহণ করেন না।"

উপরি উক্ত কথা আমাকে কে বলিলেন, স্বভাবতঃ আমার তাহা অনুসন্ধান করা উচিত ছিল; কিন্তু আমার সেদিকে প্রবৃত্তি হইল না। আমি কেবল তাঁহার কথা শুনিয়া সেই কথায় মন নিবিষ্ট করিলাম। অতএব তিনি কে, কিরূপ, কোথায়, ইত্যাদি অনুসন্ধান না করিয়া, মনে মনে তাঁহার কথার উত্তর দিলাম, যথা—"কেন?"

তিনি। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের এক শাখা, উহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে

প্রচারিত হইল। আর শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম এইরূপে মুসলমানদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি, সেদিন অনার্য্যজাতীয় মণিপুর-বাসিগণ, দেশ সমেত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর আশ্রয় লইলেন। অতএব এ কথা বলিও না যে, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম নয়।

তখন আমি বলিলাম, "ঠাকুর, তা'তো হলো, কিন্তু আপনার অভিপ্রায় কি ?"

তিনি। যদি জীবের মঙ্গল কামনা কর, তবে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম—যাহা জীবের অধিকারের চরম সীমা, যাহা অতি সরল ও সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহী—জগতে প্রচার কর। জীবমাত্রই দুঃখে অভিভূত ;—রাজনৈতিক, সামাজিক, কি অন্যরূপ উন্নতিতে জীবের দুঃখ যাইবে না। যেহেতু এ জগতে জীব অতি অল্পকাল বাস করে। এই অল্পকাল, তাহার দুঃখে ও সুখে যায়। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এ দুঃখ মোচনের উপায় কিছুই নাই, কেবল আত্মোৎকর্ষ দ্বারা উহা অপনয়ন করা যাইতে পারে। যাহাতে চির-নিবাসের স্থান অর্থাৎ পরকাল সুখের হয়, তাহাই করা জীবের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। অতএব সর্ব্বহৃদয়-গ্রাহী যে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম, তাহা জগতে প্রচার কর।

আমি। কিরূপে এ দুরূহ কার্য্য করিব ? ধর্ম্মপ্রচার ত ইচ্ছা করিলেই করা যায় না ?

তিনি। তাহা ঠিক, তবে তোমার কাজ তুমি কর। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বস্তু ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম কি, ইহা যাহাতে সকল জীবে বেশ বুঝিতে পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া লেখ।

আমি তখন অতি কাতর হইলাম ; কারণ এরূপ কার্য্যে আমি আপনাকে কিছুমাত্র শক্তিমান্ বলিয়া বোধ করিলাম না।

তখন কাতর হইয়া, আমি আপনার দুর্দ্দশার কথা একে একে

বলিলাম। বলিলাম, একে ত আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাহাতে বিষয় জ্বালায় জর্জ্জরিত। আমি গ্রন্থ লিখিয়া ভুবন উদ্ধার করিব, এরূপ ভরসা আমার কেন হইবে? যে মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নামে ভুবন পবিত্র হয়। আমি কেবল তাঁহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া, সমগ্র গৌরলীলা একত্র করিতেছি এইমাত্র।

তিনি। "তুমি কর," "আমি করি," এ কথা ঠিক নহে। তিনিই সব করেন। আর তুমি কি শুন নাই যে, তাঁহার ইচ্ছায় অন্ধ দিব্যচক্ষু পায়, খঞ্জ নর্ত্তনশীল হয়? শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ বড় বড় মহাজনের লেখা সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সমুদায় গ্রন্থ প্রধানতঃ বৈষ্ণবগণের নিমিত্ত। যাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারা ওরূপ গ্রন্থ দ্বারা অতি অল্প উপকার পাইবেন, যেহেতু তাঁহারা উহার তত্ত্বকথা আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। তুমি তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেখ যে, কি হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই, শ্রীগৌরাঙ্গ কি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে। তুমি বৈষ্ণবগণের নিগূঢ় তত্ত্বগুলির এরূপ বেশ দাও যে, ভিন্ন জাতীয়গণ উহার মধ্যে কতকগুলিকে পরিচিত বলিয়া চিনিতে কি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, ও যেগুলি অপরিচিত, সে-গুলিকেও সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

আমি। আমি এ জগতের যা কিছু সংবাদ রাখি তাহাতে দেখিতে পাই যে, প্রায় জীবমাত্রই কেবল কুকুরের ন্যায় কলহ করিতেছে। কে কাহাকে দংশন করিবে তাহা লইয়াই প্রায় জীবমাত্র ব্যস্ত। এরূপ হৃদয়ে শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিরূপে অঙ্কুরিত হইবে? শ্রীপ্রভু যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন উহা অতি সূক্ষ্ম, মনুষ্যবুদ্ধির চরম সীমা! উহা মদ্যমাংসলোলুপ, বিষয়-মদে অন্ধ, যুদ্ধপ্রিয় জীবগণে কিরূপে বুঝিবে? শ্রীরাধার "কিলকিঞ্চিত" ভাব, যদি অধ্যাপক মোক্ষমোলারের নিকট বিবরিয়া বলা যায়, হয়ত

তিনিও বুঝিতে পারিবেন না। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম সর্ব্ব-জীবের হৃদয়গ্রাহী, কি সরল, ইহা কিরূপে বলিব?

তিনি। তোমার যতদূর সাধ্য তুমি বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া অঙ্কিত কর। উহার অতি সূক্ষ্ম হইতে স্থূল অঙ্গ পর্য্যন্ত, সমুদায় সেই চিত্রে যথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। তুমি একটি কথা মনে রাখিও। সে কথা কেবল বৈষ্ণবগণেই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অধিকারী ভেদে সাধন। যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ সাধন করিবে। এমন কি, তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রসাস্বাদনের পাত্র কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র ছিলেন। তাহার পরে এই পদটী স্মরণ কর, যথা—

বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম সংকীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস-আস্বাদন॥

তুমি যতদূর পার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মটী আঁকিও। উহার কেহ স্থূল, কেহ সূক্ষ্ম অঙ্গ লইবে, উহার কেহ চরণ, কেহ মস্তক, কেহ অন্য অঙ্গ, কেহবা সর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপ গ্রহণ করিবে।

তখন হঠাৎ একটী কথা আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম, গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যতীত আর কি উপায়ে এ ধর্ম্ম প্রচার করিব আমি জানি না। ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় আছে কি না; তাহাও মনে উদয় হয় না। অথচ গ্রন্থ-প্রচার করিয়া যে কোন ধর্ম্ম-প্রচার হয়, ইহাও মনে ধারণা হয় না।

তখন তিনি বলিলেন, "তুমি ইহা জানিয়াছ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোক শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।"

আমি। তাঁহারা হিন্দু, তাঁহাদের হৃদয়-কলিকা অর্দ্ধস্ফুটিত, তাঁহারা

পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমার গ্রন্থ তাঁহাদের উপলক্ষ্যমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু মনে ভাবুন, ভিন্ন দেশে, অর্থাৎ আমেরিকা কি ইউরোপ প্রভৃতি দূরদেশে, কিরূপে আমি প্রমাণ করিব যে, শ্রীনবদ্বীপ বলিয়া একটী নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া, এই গ্রন্থের লিখিত সমুদায় লীলা করিয়াছিলেন? ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি কিছু দিতে পারিব না। প্রমাণের মধ্যে কেবল গ্রন্থ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়।

তিনি। যাঁহারা এদেশে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ। যাঁহারা জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে প্রমাণ করেন যে, উত্তরবঙ্গদেশে বুদ্ধ নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের প্রমাণও একখানি গ্রন্থ। লোকে কেন যে নূতন-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে নিগূঢ় তত্ত্বের বিচার করা এখানে প্রয়োজন নাই। তবে ইহা মনে রাখিও যে, জাপানে বুদ্ধের কথা ও তাঁহার শিক্ষার ও লীলার কথা শুনিয়া কোন কোন লোকে তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার কথা শুনিয়া কোন কোন লোকে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে। এইরূপে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর লোকে শ্রীগৌরাঙ্গ দত্ত সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া, উহা নিম্নশ্রেণীতে বিতরণ করিবে। একটী সূক্ষ্ম কথা বলি। ধর্ম্ম "বিচারের" বস্তু নয়, "আস্বাদের" বস্তু। সদ্যোজাত শিশুর মুখে তিক্ত দিলে সে ক্রন্দন করিবে, মধু দিলে সে আনন্দ প্রকাশ করিবে। কথা যদি প্রকৃত ভাল হয়, তবে শুনিবামাত্র উহা চিত্তকে আপনাপনি অধিকার করিয়া লইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রের বিবাদের মীমাংসক, সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুলভ, এমন জীব অতি দুর্লভ, যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আস্বাদন করিয়া

মুগ্ধ না হইবে। এতদিন যে এই সুধা জীবমাত্রে গ্রহণ করে নাই, তাহার কারণ, যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারা উহা জীবগণকে বিতরণ করেন নাই। যিনি ধর্ম্মকে আস্বাদ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সে ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও ধর্ম্ম যদি আস্বাদে মিষ্ট লাগে, তবে জীবে উহা আপনাপনি গ্রহণ করিবে। তাহারা আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিবে না।

এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমার নিপট্ট বাহ্য হইল। উপরে যে "কথা" গুলি বলিলাম, তাহা আমি পরে যোজনা করিয়াছি, কিন্তু উহার "ভাব"গুলি বিদ্যুদ্গতির ন্যায় তখনি আমার মনে উদয় হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কোন ব্যক্তি আমাকে উপরের কথাগুলি বলিলেন, অথবা ও কথাগুলি সমুদায় আমার নিজের মনের ভাব, তাহা লইয়া এ পর্য্যন্ত আমি বিচার করি নাই, আর বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীভগবান্ সর্ব্ব জীবের প্রাণ ও আশ্রয়। জীবগণ তাঁহার আশ্রয় লইলেই তাহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

জীবগণের এক স্থান হইতে উৎপত্তি, আর এক স্থানে তাহাদের যাইতে হইবে। তাহারা পরস্পর অকাট্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর সকলে সেইরূপ আবদ্ধ থাকিয়া সেই প্রাণের যে প্রাণ, তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। কবে জীবের চৈতন্য হইবে যে, ঈর্ষা, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি রিপু হইতে যে সুখ,—স্নেহ, মমতা, দয়া ও প্রীতি উৎকর্ষে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক সুখ? কবে তাহাদের এ জ্ঞান হইবে যে, অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের যত অনিষ্ট হয়, তত অন্যের হয় না? হে দুর্ব্বলজীব! যদি আশ্রয় চাও তবে অন্যকে আশ্রয় দাও; যদি অন্যের প্রিয় হইতে চাও, তবে অন্যকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর। শ্রীভগবান্ সর্ব্বগুণের আকর, যতদূর পার তাঁহার মত হও, তবেই ব্রজে যাইতে পারিবে।

উৎসর্গপত্র।

শ্রীমান্ অমিয়কান্তির প্রতি—

তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এপারে আছি। এরূপ পিতা পুত্রে ছাড়াছাড়ি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। কিন্তু তোমার কি আমার, ইহাতে দুঃখ করিবার কারণ নেই; যেহেতু তুমি এখন সেই সকলের পিতার শ্রীহস্তদ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের নিকট পিতা অনেক আশা করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেলা ভবসাগর পার হইয়াছ, তাই পিতৃঋণ কিছু শোধ করিতে পার নাই বলিয়া ক্ষোভ করিও না। এই সংসারে নানা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা বিচলিত হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইতেও মলিন হইয়াছিল। তোমার বিয়োগ-জনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয়ৎ পরিমাণে ধৌত হয়, তাহা না হইলে আমার যে কি দশা হইত, তাহা মনে করিতে আমার হৃৎকম্প হয়। তার পরে আমার সর্ব্বস্বধন নিমাইচাঁদ;—তাঁহাকে কত চেষ্টা করিয়া একটু ভালবাসিতে পারিলাম না। তাই তাঁহার প্রতি একটু প্রীতি বাড়াইবার আশয়ে আমি তোমার নাম তাঁহার নামের সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। প্রকাশ্যে তাঁহাকে আমি শুধু "নিমাই" বলিয়া ডাকি; কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি, তখন তাঁহাকে "অমিয়নিমাই" বলিয়া সম্বোধন করি। দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাঁহাকে পাই।

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

(আদি ও অন্ত)

জগতের নাথ, কেহ নাহি সাথ,
একা দুঃখ পান চিতে।
রসের হৃদয়, সঙ্গী কেহ নাই,
সেই রস আস্বাদিতে॥
নাহি হেন জন, মনের বেদন,
বলিয়া জুড়াবেন বুক।
প্রাণ উঘাড়িয়া, পিরীতি করিয়া,
ভুঞ্জিবেন প্রেম-সুখ॥
মনের মতন, সঙ্গীর সৃজন,
করিতে বাসনা হ'লো।
আপন হৃদয়, হইতে উদয়,
হ'লো জীব জল স্থল॥
সুখের কানন, করিল সৃজন,
মরি কিবা কারিগরি।
তাঁহার অন্তর, কিরূপ সুন্দর,
পরিষ্কার সাক্ষী তারি॥
জীব সৃষ্টি হ'লো, ভ্রমিতে লাগিল,
ক্রমে বিকসিত হ'য়ে।
জীব পরিণাম, মানব জনম,
লভে লক্ষ জন্ম পেয়ে॥

নামেতে মানুষ, স্বভাবে রাক্ষস,
দুর্গন্ধ সকল অঙ্গ।
যান মিলিবারে, মিলিতে না পেরে,
শ্রীভগবান্ দেন ভঙ্গ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, ফুটিল ব্রজেতে,
গোপ গোপী সখাগণ।
জগতের নাথ, স্বীয় মনমত,
পাইলেন নিজ জন॥
ডাকেন তখন, এস প্রিয়াগণ,*
মুরলীতে করি গান।
মুরলী বাজিল, কেহ না শুনিল,
বিনা গোপ গোপীগণ॥
আকুল হইয়া, চলিল ধাইয়া,
যথা সে রসিকবর।
তাদের চাহিয়া, বলেন হাসিয়া,
"যাহা চাহ দিব বর॥"

গোপী বলিতেছেন—

"নিঠুর বচন, বল কি কারণ,
চাহিবার কিছু নাই।
কান্দিছে পরাণ, শুনি বাঁশী গান,
তাই আনু তোমা ঠাঞি॥
মধু হতে মধু, তুমি প্রাণবঁধু,
চরণের দাসী কর।

* ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল এক জন, তিনি কানাইলাল, আর সকলেই প্রকৃতি।

কিছু নাহি চাব, চরণ সেবিব,
দেহ নাথ এই বর॥"
গোপীগণ ভাস, শুনি স্বপ্রকাশ,
পদ্ম আঁখি ছল ছল।
"পিরীতি করিবে, কিছু না চাহিবে,
এ কথা আবার বল॥
"দাও" "দাও" কথা, শুনে থাকি সদা,
দিতে নারি, গালি খাই।
মন-কথা কই, হৃদয় জুড়াই,
হেন মোর সঙ্গী নাই॥
একাকী বেড়াই, হেন নাহি পাই,
আমারে পিরীতি করে।
হৃদয়ে যা ছিল, সুরস কোমল,
সব গেল ছারে খারে॥
নূতন জীবন, পাইনু এখন,
শুনি তোমাদের বাণী।
সুখ-বৃন্দাবন, রব চিরদিন,
করি প্রেম বিকি কিনি॥"
ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব, সকল মহত্ত্ব,
সব ফেলি দিয়া দূরে।
বলরাম দাসে, কান্দিছে নিরাশে,
কিরূপে যাব ব্রজপুরে॥

প্রথম অধ্যায়।

বন্ধুর লাগিয়া, কতই রান্ধিনু,
লুকায়ে যাইব লয়ে।
রজনী আসিছে, কিছু নাহি আছে,
বার জনে গেল খেয়ে॥
এবে শুধু হাতে, বন্ধুর আগেতে,
কেমনে যাইব আমি।
রান্ধিতে সময়, আর সখি নাই,
উপায় বলহ তুমি॥
(আমার) ভাণ্ডারেতে পোরা, কতই সামগ্রী,
রান্ধিবার শক্তি নাই।
করুণা করিয়া, কে দিবে রান্ধিয়া,
বন্ধুরে খাওয়াব যাই॥
সংকেত কুঞ্জেতে, বন্ধুর আগেতে,
বসিয়া খাওয়াতাম নিতি।
(আইজ) কেমনে যাইব, কিবা তারে দিব,
অভাগ্য বলাই অতি॥

শচীর কোলে নিমাইকে রাখিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছি। আমরা আরও কিছুক্ষণ তাঁহাকে মায়ের কোলে রাখিব, রাখিয়া একটি নিগূঢ় রস অর্থাৎ পরকীয়া রসের কথা কিঞ্চিৎ বলিব। বেশীক্ষণ রাখিতে পারিব না। ভাগ্যবান পাঠক এইবেলা মনের সাধে ও প্রাণ ভরিয়া

"শচীর কোলে নিমাই" দৃশ্যটি দর্শন করুন, কারণ, এই দৃশ্য বহুদিন আর দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীগৌড়ীয় বাদসাহের তখনকার মন্ত্রিদ্বয়, সাকর মল্লিক (রূপ) ও দবীর খাস (সনাতন)। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও সহোদর। যখন তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারের কথা শুনিলেন, তখন আপনারা আসিতে না পারিয়া প্রভুর নিকট দৈন্য করিয়া বারে বারে পত্র লিখিতে লাগিলেন, "প্রভু! আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এই দুই ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে তখনকার গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন। যিনি নামে বাদশা, তিনি আমোদ আহ্লাদে, কি যুদ্ধ বিগ্রহে, বিব্রত থাকিতেন।

তাঁহাদের এইরূপ বিষয়-সুখের প্রতি ঔদাস্য দেখিয়া প্রভু তাঁহাদের উপর কৃপার্ত্ত হইলেন, এবং যদিও তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিলেন না, তবু তাঁহাদের কথা মনে করিয়া একটি শ্লোক করিয়াছিলেন। শ্রীমুখের শ্লোকটি এই—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

এ শ্লোকের অর্থ এই—কুলটা রমণীগণ গৃহকার্য্যে ব্যগ্র থাকিলেও অন্তরে উপপতির নবসঙ্গরূপ রসায়নই আস্বাদন করে। এই দুই ভ্রাতাও ঠিক তাহাই করিতেছেন; অর্থাৎ তাঁহারা কুলটার মত বিষয়কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তরে শ্রীকৃষ্ণরূপ উপপতির সঙ্গই আস্বাদন করিতেছেন।

এখন দেখুন, প্রভু এই দুই ভ্রাতাকে কুলটার সহিত তুলনা করিলেন কেন? "পরকীয়া" কথাই বা কেন ভজন সাধনের মধ্যে আসে? পরকীয়া রস শুনিলে পবিত্র লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয়। অতএব

এ সব কথা এ সমুদায় পবিত্রতার মধ্যে কেন? শচী ও নিমাইয়ের এখনকার অবস্থা বুঝাইবার নিমিত্ত এ কথার অল্প একটু বিচার করিতে হইতেছে। প্রিয়বস্তু সুলভ হইলে তাহার মিষ্টতা কমিয়া যায়। পাখী বড় সুন্দর, তাহার বিশেষ কারণ পাখী ধরা যায় না। পাখী যদি ইচ্ছা করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার সৌন্দর্য্য অনেক কমিয়া যাইত। চণ্ডীদাস একটি পদে বলেন, গুপ্ত প্রীতিতে অনেক মাধুর্য্য। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, উপপতি কি উপপত্নী, পতি কি পত্নী অপেক্ষা দুর্ল্লভ। অতএব যদি পতি উপপতির ন্যায় দুর্ল্লভ হয়েন, তবে পতিও উপপতির ন্যায় মিষ্ট হয়েন। পতির সঙ্গসুখ ইচ্ছা করিলেই করা যায়, কিন্তু উপপতির সঙ্গসুখ করিতে নানারূপ বিপদ ও পরিণামে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা আছে। এই নিমিত্ত দুর্ল্লভ বলিয়া পতি অপেক্ষা উপপতি মিষ্ট।

শ্রীভগবানের মধুর ভজন করিতে হইলে দুই প্রকারে করা যায়। পতি ভাবে ও উপপতি ভাবে। এ কথার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। ভগবান্ যাঁহার পতি, কাজেই তিনি একট বঞ্চিত। ভগবান্ যাহার উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। ভগবান্ আস্বাদের সামগ্রী। তিনি যদি পতির ন্যায় সুলভ হইলেন, তবে তাঁহার মিষ্টতা কমিয়া গেল। যদি উপপতির ন্যায় দুর্ল্লভ হইলেন, তবেই তাঁহার মিষ্টতা পূর্ণ মাত্রায় রহিয়া গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান্, দুজনে একত্রে বাস করেন; কিন্তু লক্ষ্মী ব্রজগোপীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যে এ কথা লেখা আছে, এখন তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন।

শ্রীভগবানকে উপপতি বলিয়া ভজনা করিবার আরও কারণ আছে। শ্রীভগবানের মধুর ভজনের সহিত উপপতি ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উপপতি ভজনে আনন্দে উন্মাদ করে; ভদ্রাভদ্র, বিপদাপদ, জ্ঞান থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজনা দ্বারা

উপপতি প্রাপ্তির অনেক বাধা, ও নিশ্চিততা নাই। শ্রীভগবান্-ভজন সম্বন্ধেও তাহাই। তাই পতিরূপে শ্রীভগবানকে বর্ণনা করিলে সে বর্ণনা স্বাভাবিক হইত না, উপপতিরূপে বর্ণনায় স্বাভাবিক হইয়াছে। বিশেষতঃ পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে। যেহেতু পতি প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা ইত্যাদি। উপপতির সহিত যে সম্বন্ধ উহা বিশুদ্ধ প্রীতির দ্বারা গ্রন্থিত।

আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। আন্দাজ ত্রিশ বৎসরের একটী স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শিশির বাবু?" আমি বলিলাম, "হাঁ"। তখন সে বলিল, "নারায়ণ কোথা বলিতে পার?" নারায়ণ আমাদের গ্রামবাসী একটি ব্রাহ্মণযুবক, এই স্ত্রীলোকটীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটি শুনিয়াছিল নারায়ণ আমাদের একগ্রামস্থ। তাই সে একাকিনী কোন এক পল্লীগ্রাম হইতে তল্লাস করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতায় তল্লাস করিয়া আমার বাড়ী পাইয়াছে। নির্ভয়ে আমার কাছে আসিয়াছে। আমাকে চিনে না, তবু আমাকে লজ্জা কি ভয় করিল না। আসিয়াই বলিল, "নারায়ণ কোথা বলিতে পার?" স্ত্রীলোকটির বেশ পাগলিনীর মত। শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যিনি পাগলিনী, তাঁহার ঠিক এইরূপ দশা হয়। তাঁহার লজ্জা ভয় থাকে না; কৃষ্ণকে এইরূপে তল্লাস করিয়া বেড়ান, দুর্গম স্থানেও যান। তাই সাধুগণ মধুর ভজন পরিষ্কার বুঝাইবার নিমিত্ত "পরকীয়া" উদাহরণ দেখাইয়া থাকেন। তাহাই রূপসনাতন সম্বন্ধে প্রভু দেখাইয়াছিলেন।

ভক্তি কি প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছে এরূপ ভাগ্যবান্ জীব আমরা দুই একজন দেখিয়াছি। মদ্যপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, ভগবৎ-প্রেম উদয় হইলে ঠিক তাহাই হয়। এমন কি,

মদ্যপায়ীর মুখে যেরূপ লালা পড়ে, প্রেমোন্মত্ত ভক্তের মুখে সেইরূপ কখন কখন লালা পর্য্যন্ত পড়িতে থাকে। তবে সামান্য মাতাল দেখিলে ঘৃণা হয়, আর কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা দেখিলে হৃদয় দ্রবীভূত ও নির্ম্মল হয়। সাধুগণ জীবগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ-প্রেমকে মদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই বলে কি কৃষ্ণ-প্রেম দোষের হইল? সেইরূপ শ্রীভগবানের মধুর ভজন কিরূপ, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সাধুগণ পরকীয়া রসের সাহায্য লইয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি সাধুগণের দোষ হইল?

এখন পরকীয়া রসের সার লক্ষণ বলি। প্রিয়জন যখন দুর্ল্লভ হয়েন, কি প্রিয়জনকে প্রাপ্তির নিশ্চিততা যায়, তখনই পরকীয়া রসের উদয় হয়। প্রিয়জন যদি দুর্ল্লভ হয়েন, তবে তিনি পরম প্রিয় হয়েন। যদি স্বামী পরের অধীন হয়েন, তাঁহাকে প্রাপ্তি অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবে তিনিও উপপতির ন্যায় সুখের সামগ্রী হয়েন। যদি প্রিয়জন অন্যের অনুগত কি অপরের বস্তু হয়েন, তবে পরকীয়া রসের উদয় হয়।

শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন, স্ত্রী ও জননী ত্যাগ করিয়াছেন, স্ত্রী-লোক মাত্রকে তাঁহার জননী জ্ঞান করিতে হইবে। এমন কি, তাঁহাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবেন না। যদি দৈবাৎ স্ত্রীলোক সম্মুখে পড়ে, তবে হয় মুখ ফিরাইতে, নয়ন মুদিতে, কি অন্য পথে যাইতে হইবে। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীলোকের চিত্র পর্য্যন্ত দেখিতে নিষেধ। তাহাও নয়, স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে নিষেধ। তাহাও নয়, "স্ত্রী" শব্দ ব্যবহার করিতে বিধি নাই। তবে যদি কোন কারণে স্ত্রীলোকের কথা বলিতে হয়, তবে স্ত্রীর স্থানে "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। যেমন শিবানন্দ সেনের "স্ত্রী" না বলিয়া, শিবানন্দের "প্রকৃতি" বলিতে হইবে। পথে

কয়েকজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া, ইহা না বলিয়া, কয়েকজন "প্রকৃতি" দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক এরূপ ভয়ঙ্কর সামগ্রী।

নিমাইয়ের জননীর সঙ্গেও এইরূপে সম্পর্ক একেবারে গিয়াছে। শচী আর এখন তাঁহার জননী নহেন, তবে কি না, শচী তাঁহার "পূর্ব্বাশ্রমের" মা। তিনি আর এখন শচীর তনয় নহেন, তিনি এখন কেশব ভারতীর বেটা। শচী আর তাঁহাকে বাটী লইতে পারিবেন না। এমন কি, শ্রীনিমাই নিয়ম মত এখন শচীকে প্রণাম পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন না। নিয়ম মত শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন। অতএব শ্রীনিমাই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করাতে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার সামাজিক সম্পর্ক একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাই বলিয়া কি শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিমাইয়ের প্রতি ভালবাসা গিয়াছে? তাহার ত এক বিন্দুও যায় নাই, বরং উহা অনন্ত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু, নিমাই-রূপ যে অতি প্রিয়বস্তু, তিনি এখন তাঁহার নিজজন নহেন, অপরের বস্তু হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গমন করিয়া দৈবকীর ক্রোড়ে বসিলেন, তখন যশোদার কৃষ্ণ-প্রেম কোটিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দুর্ল্লভ হইলে, শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণে পিপাসা আরও কোটিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

শচীর প্রিয়বস্তু নিমাই। নিমাই তাঁহার পুত্র ছিলেন, এখন তাঁহার উপপুত্র হইলেন। এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়বস্তু নিমাই, এখন তাঁহার উপপতি হইলেন। ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর, প্রেমসাগরে ডুবিয়া গেলেন, থাই পাইলেন না।

এখানে আর একটি গুহ্য কথা বলি। এইরূপে বিয়োগে প্রিয় বস্তু আরও প্রিয় হয়েন। এইরূপে, মৃত্যুরূপ বিয়োগে প্রিয়বস্তুর সহিত প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব মৃত্যুর তাৎপর্য্য ছাড়াছাড়ি নয়, প্রীতি

পরিবর্দ্ধন। প্রিয়বস্তুর সহিত মৃত্যুরূপ বিচ্ছেদ হইলে, তাঁহার আর দোষ দেখা যায় না, তাঁহার গুণগুলিই কেবল হৃদয় মাঝারে মহামণির ন্যায় জ্বলিতে থাকে। আর যদিও ভবের তরঙ্গে জীব হাবুডুবু খাইতে খাইতে পরলোকগত প্রিয়জনের কথা বাহ্য দৃষ্টিতে ভুলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরলোকগত প্রিয়জনের কথা হৃদয়ে একটু ধ্যান করিলেই ইহা জানা যায়। দুইটী জীবে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত প্রণয়, কিন্তু দুইজনে খট্‌মটি হইতেছে,—কোথা কি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে, দুইজনে মিলিতেছে না। হঠাৎ দুইজনে বিচ্ছেদ হইল, তখন "দুহে দুহার" দোষ ভুলিয়া গেলেন, কেবল গুণই দেখিতে লাগিলেন। দুইজনে পূর্ব্বে কলহ করিয়াছেন বলিয়া এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরে দুইজনে মিলন হইল, তখন বাহু প্রসারিয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিলেন।

মহাভারতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনে যেই দেখা হইল, অমনি উভয়ে উভয়ের দোষ ভুলিয়া গিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সে যাহা হউক, এ সমুদয় রহস্য ক্রমেই বিস্তারিত হইবে।

শচীর কোলে নিমাই। যখন শচী প্রথমে নিমাইকে দেখিলেন, তখন পুত্রকে চিনিতে কষ্ট হইল, যেহেতু অরুণবসনধারী ও মুণ্ডিত মস্তক নিমাইয়ের তখন বেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহা নহে। তখন নিমাইয়ের আকৃতি অতিশয় ভক্তি-উদ্দীপক হইয়াছে। নন্দন আচার্য্যের বাড়ী প্রভুকে নিতাই যখন প্রথম দর্শন করেন, তখন তাঁহার পরিধান পট্টবস্ত্র, গলে ফুলের মালা, নটবর নবীননাগর বেশ;—ভক্তি-উদ্দীপক কোন উপকরণ নিমাইয়ের অঙ্গে ছিল না। কিন্তু তবু নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ

শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ দেখিয়া ব্রজবালা রাধা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছিলেন। শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্রপ্রেম সম্বন্ধ,—ভক্তি সম্বন্ধ নহে। নিমাইয়ের সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া শচীর ভক্তির উদয় হইল, কাজেই পুত্রের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহার বিভ্রাট ঘটিল। শচী কাজেই প্রথমে নিমাইকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন না, আর চিনিয়াও তাঁহার উপর পুত্রভাব অর্পণ করিতে পারিলেন না। ভক্তিতে গদগদ হইয়া শচী পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন,—ইচ্ছা যে প্রণাম করেন। কিন্তু তাহা পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ পারিতেছেন না। তাই, নিমাই যখন তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, তখন শচী ভয় পাইয়া বলিলেন, "বাপ্! তুমি আমাকে প্রণাম করিতেছ, আমার ভয় করিতেছে। তবে আমার ভরসা এই যে, যদি তোমার প্রণামে আমার অপরাধ হইত, তবে তুমি আমাকে কখনই প্রণাম করিতে না।"

এইরূপ ভক্তি-চক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন না করিলে একটী বিষম অনর্থ হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের সন্দেহরূপ নীলকাঁচে শ্রীভগবান্-রূপ সূর্য্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। সেইরূপ ভক্তিরূপ বাঁধে প্রেমের বন্যাকে নিবারণ করে। শচী তাঁহার জীবনের জীবন পুত্রকে হারাইয়া সেই পুত্রকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। তাঁহার নিমাইয়ের প্রতি যে স্বাভাবিক ভাব তাহা থাকিলে, পুত্রকে দর্শন করিবামাত্র, সেই শত সহস্র লোকের মধ্যে, "হা নিমাই' বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, এমন কি তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিমাইকে দর্শন করিবামাত্র শচীর ভক্তির উদয় হইল, অমনি প্রেমের হিল্লোলে একটি বাধ পড়িল, আর শচী ভাসিয়া গেলেন না; সচেতন রহিলেন ও সচেতন থাকিয়া পুত্রের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

শচী ভাবিতেছেন, "আমার পুত্রটি স্বয়ং ভগবান্, কিন্তু আমি কি নির্ব্বোধ, তবু নিমাইকে আমার পুত্র-বোধ গেল না।" ইহাতে আপনাকে একটু অপরাধী ভাবিতেছেন, আর আপনার কল্পিত অপরাধ যতদূর সম্ভব অপনয়ন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "নিমাই! তুমি যাই হও, তবু আমার এ বিশ্বাস যায় না যে তুমি আমার দুধের ছাওয়াল।" কিন্তু শচীর এই জ্ঞানরূপ দুর্দ্দশা অধিকক্ষণ রহিল না, দুই একটি কথা বলিতে উহা সমুদয় গেল, আর হৃদয় বাৎসল্য-রসে পূরিয়া উঠিল। তখন বাহু প্রসারিলেন, নিমাই অগ্রবর্ত্তী হইয়া গলা বাড়াইয়া দিলেন, আর জননী পুত্রের বদনে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন। মায়ে পুত্রে কথা আরম্ভ দেখিয়া সকলের ইচ্ছা হইল একটু দূরে যাইবেন; একটু দূরে গেলেন, কিন্তু তবু বেশী দূরে যাইতে পারিলেন না। শচী ও নিমাই বসিয়া কথা কহিতেছেন, লোক কিরূপে ইহা ফেলিয়া যাইবে? তাঁহারা চুপ করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

শচী প্রথমে ভক্তি, পরে বাৎসল্য, পরে অভিমান রসে বিভাসিত হইয়া কথা কহিতেছেন। বাসুঘোষ সেখানে দাঁড়াইয়া, সুতরাং তাঁহার কৃত পদে আমরা জানিতে পারিতেছি, শচী কি কি বলিলেন। শচী বলিতেছেন, "নিমাই! তুমি পিতৃহীন বালক, আমি সেই নিমিত্ত আরো যত্ন করিয়া তোমাকে বিদ্যা শিখাইলাম ও ভাগবত পড়াইলাম। সেই ঋণের শোধ কি তুমি এইরূপে দিলে? তোমাকে আমি বড় মানুষের ঘরে পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলাম; তুমি এখন তাঁহাকে আমার গলায় বাঁধিয়া দিয়া ফেলিয়া চলিলে। ইহাতে কি তোমার বড় ধর্ম্ম হবে?* আমি তোমার বৃদ্ধ মাতা, আমাকে তোমার দয়া হইল

---

* হাদেরে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই।
অভাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই॥ (পর পৃষ্ঠায়)

না। তা'তেও আমি তোমাকে দোষ দিই না। আমি তোমার মা, আমার প্রতি তুমি সমুদায় করিতে পার, কিন্তু পরের মেয়ে, তা'র অপরাধ কি ? বৌমাকে কি বলিয়া বুঝাইব, বল দেখি ?"

নিমাই মস্তক অবনত করিতেছেন। মায়ের দুঃখে ক্রমে তাঁহার মুখ মলিন হইতেছে। নিমাই মানুষের মত কথা কহিতেন, ব্যবহার করিতেন। ইহাতে যাঁহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ ভাবিতেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে তাঁহার ভগবত্তা ভুলিয়া থাকিতেন। ভিন্ন লোকে সেই কথা বলিয়া তাঁহার ভগবত্তায় দোষ ধরেন। তাঁহারা বলেন, প্রভু যদি শ্রীভগবান্ হইবেন, তবে মনুষ্যের অনিশ্চিততা, দৌর্ব্বল্য, অজ্ঞতা দেখাইবেন কেন ? কিন্তু এ কথা একবার স্মরণ করা উচিত যে, যদি শ্রীভগবান্ মনুষ্য

এত বলি ধরে শচী গৌরাঙ্গের গলে।
স্নেহভাবে চুম্ব খায় বদন-কমলে॥
মুই বৃদ্ধ মাতা তোর মোরে ফেলাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ দিলে গলায় গাঁথিয়া॥
তোর লাগি কান্দে সব নদীয়ার লোক।
ঘরে রে চলরে বাছা দূরে যাউক শোক॥
শ্রীনিবাস হরিদাস যত ভক্তগণ।
তা সবারে লয়ে বাছা করগে কীর্ত্তন॥
মুরারি মুকুন্দ বাসু আর হরিদাস।
এ সব ছাড়িয়া কেন করিলে সন্ন্যাস॥
যে করিলা সে করিলা চলরে ফিরিয়া।
পুনঃ যজ্ঞসূত্র দিব ব্রাহ্মণ আনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর বাণী।
পুনরায় নদে চল গৌর-গুণমণি॥

সমাজে উদয় হয়েন, তবে তাঁহার ঠিক মনুষ্য হইয়া না আসিলে, অর্থাৎ মনুষ্যের যে যে স্বভাব তাহা না লইয়া আসিলে, তাঁহার মনুষ্যের সহিত সঙ্গ কিরূপে সম্ভবে? মনুষ্য, ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবানের সঙ্গ সহ্য করিতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহার লীলাও মাধুর্য্যময় না হইয়া ঐশ্বর্য্যময় ও নীরস হয়। শ্রীরাধা কোপ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন হইয়া গেল। রাধাকৃষ্ণ-লীলায় এ সব কথা না থাকিলে উহা মিষ্ট হইত না। আর রাধার কোপে শ্রীকৃষ্ণের মুখ মলিন না হইলে, রাধাও কোপ করিতে পারিতেন না। পাঠকগণের অবশ্য স্মরণ আছে যে, সাত প্রহর শ্রীনিমাই ভগবান্-আবেশে ছিলেন, তাহাই ভক্তগণ সহ্য করিতে পারেন নাই।

আরব্য উপন্যাসের পাতসা গুপ্তবেশে প্রজা সমাজে বেড়াইতেন। তিনি প্রজাগণের সহিত রঙ্গ করিতেন, প্রজাগণও তাঁহার সহিত রঙ্গ করিত। তাহার কারণ প্রজাগণ তাঁহাকে তাহাদের মত একজন ভাবিত,—পাতসা জানিলে এ রস আর একটুও হইত না। অতএব শচী ও নিমাইয়ে যখন কথা হইতেছে, তখন প্রভু যে শচীর পুত্র, ইহা ব্যতীত আর কোন ভাব কাহারও মনে রহিল না, থাকিলে কোন রসই হইত না। পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া শচীর কোপ অন্তর্হিত হইল। তখন আর এক কথা মনে পড়িল। ভাবিতেছেন, নিমাই ত এখন আর তাঁহার নহে। যে ডোরে তাঁহার পুত্র তাহার নিকট বান্ধা ছিলেন, তাহা নিমাই ছিঁড়িয়াছেন। এখন নিমাইয়ের এক গতি, তাঁহার এক গতি। নিমাই তাঁহার বাড়ী যাইবে না, তাঁহার ঘরে শুইবে না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে না। অথচ নিমাই তাঁহার পুত্র, তাঁহার জীবনের জীবন। তখন জোর জুলুম ছাড়িয়া দিয়া, নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার কোন দাবি দাওয়া নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন,

"নিমাই! আমি তোমার বৃদ্ধমাতা, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। তুমি কেন আমাকে ফেলিয়া যাইবে? বাড়ী বসিয়া নিতাই, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, নরহরি, বাসুঘোষ,—ইহাদের সহিত সংকীর্ত্তন করিও। আমি আর মানা করিব না। তবে তুমি সন্ন্যাস লইয়াছ, ভাল ব্রাহ্মণ আনিয়া আমি তোমার পৈতা দিব। তুমি বৈরাগী হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাবে, ওমা তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব। এই সুন্দর শরীরে কাঙ্গালের ডোর-কৌপীন পরিয়াছ, ইহা দেখিয়া পশুপক্ষী কান্দিতেছে। আমি তোর মা, বাঁচিয়া আছি। অন্যে সহিতে পারে না, আমি মা কিরূপে সহিব? নিমাই তুমি সুবোধ। বল দেখি মা হইয়া কি কেহ ইহা দেখিতে পারে? আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভেবে দেখ দেখি? তাহার এই কচি বয়স। তাহাকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব? নদীয়া আঁধার হয়েছে। বৌমা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। আমি তোমাকে নিতে আসিয়াছি। বাপ্! বাড়ীর ধন বাড়ী চল। তোমার অঙ্গে ডোর কৌপীন, ইহা কে সহিবে?" ইহা বলিয়া নিমাইয়ের গলা ধরিয়া আবার ঘন ঘন চুম্বন দিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন।

ভক্তগণের স্বাভাবিক টান শচীর দিকে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, শচী ঠিক বলিতেছেন, প্রভুরই সমুদয় অন্যায়। ভক্তগণের অবস্থা ও মনের ভাব সেই স্থানে উপস্থিত বাসুঘোষের একটি পদে উত্তম বুঝা যাইবে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর একি রীতি? যিনি শ্রীভগবান্ প্রেমদান করিতে আসিয়াছেন, তিনি কৌপীন ও দণ্ড লইয়া, কেশ মুড়াইয়া, কেন আমাদের বুকে শেল হানিতেছেন? একবার তাঁহার নিজজনের অবস্থা দেখিলেন না? বৃদ্ধ জননী ছাড়িলেন, যুবতী ভার্য্যা ছাড়িলেন। শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি প্রাণে মরিতেছে, ভক্তগণের কান্দিয়া কান্দিয়া জীবন সংশয়

হইয়াছে।* অতএব আমাদের গঙ্গায় ডুবিয়া মরণই এ দুঃখের ঔষধ।

মায়ের বচনে নিমাইয়ের দুঃখ-তরঙ্গে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। কষ্টে নয়ন-জল নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, "মা, জানিয়া বা না জানিয়া যদি সন্ন্যাস করিয়া থাকি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনো উদাস হইব না। দেখ মা, তোমাকে দুঃখ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, তাহাতে বিঘ্ন হইল, যাইতে পারিলাম না। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমার যাহাতে ভাল হয়, তাহা তুমি বিচার করিয়া দিও, আমি আর স্বইচ্ছায় কিছু করিব না। এ দেহ তোমার, আমার ইহার প্রতি কোন অধিকার

---

* কি লাগিয়া দণ্ডধারী, অরুণ বসন পরি,
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে, রাধা রাধা বলি কান্দে,
কি লাগিয়া ছাড়ে গৌড়দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায়, পাষাণ গলিয়া যায়,
গদাধর না বাঁচে পরাণে।
বহিছে প্রেমের ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা,
মুকুন্দের ও দুটি নয়নে॥
কান্দে শান্তিপুর-নাথ, শিরে দিয়ে দু'টী হাত,
কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে।
অদ্বৈতঘরণী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্দে,
মরা যেন পড়িল ভুমিতে॥
এ তোমার জননী ছাড়ি, যুবতী রমণী এড়ি,
এবে তোমার সন্ন্যাসে গমন।
গঙ্গায় শরণ নিব, এ তনু গঙ্গায় দিব,
বাসুঘোষের অনলে জীবন॥

নাই। তুমি যাহা বল তাহাই করিব। যদি আবার বাড়ী যাইতে বল, বাড়ীই যাইব। সর্ব্ব-সমক্ষে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

শ্রীঅদ্বৈতের ঘরণী সীতাদেবী তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া। তিনি শচীর দুইখানি হাত ধরিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শচীও সম্মত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে তখন একটি সাধের উদয় হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়া সীতাদেবীকে বলিলেন, "আমি রাঁধিব, রাঁধিয়া নিমাইকে খাওয়াইব।" এই কথা শুনিয়া সকলের চোখে জল আসিল। শচী তখনি স্নান করিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন। কি কি ব্যঞ্জন নিমাইয়ের প্রিয় তাহা তিনি জানেন। অন্যের বাড়ী বলিয়া, রন্ধনের দ্রব্যের ফরমাইস করিতে শচীর একটু কুণ্ঠিত হইবার কথা, কিন্তু তাহার বিশেষ কাবণ ছিল না। কারণ নিমাইয়ের লোভ যা কিছু শাক্, থোড়, মোচা প্রভৃতির উপর, —মূল্যবান ক্ষীর ছানার উপর নহে।

শচী অন্তঃপুরে গমন করিলে, নিমাই বদন তুলিয়া ভক্তগণ পানে চাহিলেন। ভক্তগণের দশা দেখিয়া প্রভু আবার কাতর হইলেন। সকলের এলোথেলো বেশ, রোদন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ, অনাহারে দেহ শীর্ণ। তখন যদিও একটু প্রফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু তবু তাঁহারা যে একটু পূর্ব্বে দুঃখসাগরে ডুবিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা যাইতেছে। তখন প্রভু জনা জনাকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, আর যেন সেই শীতল স্পর্শে ভক্তগণের দুঃখ হরণ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, ভক্তগণ আর দুঃখ ভাবিতে বড় সময় পাইলেন না। প্রভু তখনি তাহাদের লইয়া স্নানে চলিলেন। এ দিকে শ্রীঅদ্বৈত সকলের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত বিষয়-সম্পত্তিতে একজন

বড়মানুষ, তখনকার বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার ভাণ্ডার, অক্ষয় অব্যয়। সুতরাং যতলোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন, তিনি অনায়াসে সকলের আতিথ্যের ভার লইলেন। যাঁহারা নবদ্বীপ কি দূরগ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের থাকিবার বাসা এবং সমুদয় আহারের সামগ্রী দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত বাহিরে এই আমোদ করিতেছেন, ওদিকে শচী এক মনে, যেন পরম যোগিনীর ন্যায়, রন্ধন করিতেছেন। নদেবাসিগণ সুরধুনীতে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। প্রভুকে মধ্যস্থলে করিয়া জল-যুদ্ধ, সন্তরণ, "কয়া" "কয়া" খেলারূপ আনন্দে সকলে প্রভুর সন্ন্যাস তখন একরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে প্রভুর সন্ন্যাসের পর ত্রিভুবন শীতল হইল, কেবল একজন ছাড়া,—তিনি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া!

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর বাড়ীতে সখী পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। তখন তিনি সে বাড়ীর কর্ত্রী, উত্তরাধিকারিণী। প্রভুর এই বাড়ীতে তিনি চিরজীবন যাপন করিয়াছিলেন। প্রভু বিংশতি দিবসের পথ অর্থাৎ নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে প্রভুকে পরে লইয়া যাইব। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁহার শূন্য-ভবনে স্থাপিত করিব।

বিষ্ণুপ্রিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির আদরের কন্যা। সুরধুনী তীরে শচীর অগ্রে দাঁড়াইয়া মুখ অবনত করিয়া মনে মনে বলিতেন, "মা! আমাকে ঘরে নিয়া চল।" তাহার পরে প্রকৃতই শ্রীনিমাইয়ের অঙ্গেঅঙ্গ দিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার রূপ কি প্রকার না, "ঝলমল করে যেন তড়িৎ প্রতিমা।" তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিসোহাগিনী, ত্রিভুবনের আদরিণী।

অগ্রহায়ণ মাসে তিনি পিত্রালয়ে গমন করিলেন, সেখানে হঠাৎ অমঙ্গল লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন। যথা—

বিষ্ণুপ্রিয়া সখী-সনে কহে ধীরে ধীরে।
আজ কেন প্রাণ মোর অকারণে ঝুরে॥
কাঁপিছে দক্ষিণ আঁখি, যেন স্ফুরে অঙ্গ।
না জানিয়া বিধি কিবা করে সুখ ভঙ্গ॥
আর কত অস্ফুরণ স্ফুরয়ে সদায়।
মনের বেদন কহিবারে ভয় পাই॥
আরে সখি পাছে মোরে গৌরাঙ্গ ছাড়িবে।
মাধব * এমন হলে অনলে পশিবে॥

আবার বলিতেছেন, "সখি! সুখের নবদ্বীপের এরূপ দশা কেন? যেন চতুর্দ্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে।

আজ কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে।
অঙ্গে নাহি পাই সুখ, দুটি আঁখি ঝুরে॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা।
ভ্রমর না খায় মধু, শুকাইল পাতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাহি মূখ হইল পারা॥
এই বড় ভয় লাগে বাসুর হিয়া মাঝে।
নবদ্বীপ ছাড়ে পাছে গোরা নটরাজে॥

তখন সখীগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে কথা গোপন রাখিলেন না, বলিলেন, "নগরে এরূপ কথা হইতেছে যে, সোণার ঠাকুর নাকি নবদ্বীপ ছাড়িবেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আর পিত্রালয়ে রহিলেন না। তদ্দণ্ডে আপনি আপন-গৃহে আসিলেন। সেই সময়

---

* মাধব বাসুঘোষের ভ্রাতা।

কিছুকালের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সহিত গার্হস্থ-রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের রজনীতে সেই রসের বন্যা উঠাইলেন।*

তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় কিরূপে পতিকে হারাইলেন, আর কোল শূন্য দেখিয়া "পালঙ্কে বুলায় হাত" ইত্যাদি লীলা পাঠকের স্মরণ আছে। এখন পতি হারাইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া শূন্য-নবদ্বীপের মাঝে, তাঁহার শূন্য-গৃহে বসিয়া আছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কখন শোকে, কখন ভক্তিতে, কখন ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি প্রাচীনা বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার শ্বাশুড়ীকে পালন করিতে হইবে। আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন, ও কখন বা নিরাশ হইয়া সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় মন উখাড়িয়া রোদন করিতেছেন। যথা—

হেদেরে পরাণ নিলাজিয়া।
এখনও না গেলি তনু ত্যজিয়া॥

---

* সেই রজনীর দম্পতি-রসলীলা বর্ণিত এই পদটি প্রস্তুত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়ার চিবুক ধরিয়া বলিতেছেন। যথা—

সলাজ নয়না বালা মুখ নাহি তোলে।
পড়িল পড়িল ভ্রমর পদ্ম-মধু লোভে॥
হিঙ্গুলে রঞ্জিত ঠোঁট কাঁপে মৃদু মৃদু।
প্রেম-সরোবর আঁখি ঝুরে বিন্দু বিন্দু॥
নয়নের তারা আধো পদ্মদলে ঢাকা।
জনমের মত হিয়ার মাঝে রইল আঁকা॥
নানা ভাব খেলে মুখে চঞ্চল চপল।
কঠিন পুরুষ আমি করিল পাগল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞা পেয়ে বলাই মালা গাঁথে।
অঞ্জলি করিয়া দিল প্রাণেশ্বরীর হাতে।

গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
মিছা প্রীতি আশ আশে রবে।
আর কি গৌরাঙ্গ চান্দে পাবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কান্দে বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে প্রাণী॥

ভাবিতেছেন, "আমার প্রভু বড় নিষ্ঠুর;" আবার ভাবিতেছেন, "সে কি! আমার দুঃখ, তাঁর দুঃখ না? আমিত ঘরে আছি, তিনি যে বৃক্ষতলে?" সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাই! সন্ন্যাসীর কি কি নিয়ম তোরা কিছু জানিস? আচ্ছা সন্ন্যাসীর যে স্ত্রী তাহার নিয়ম তোরা বলিতে পারিস্? আমি তাহার সমুদয় পালন করিব। প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া আমাকে জব্দ করিবেন। আমি আর শয্যায় শুইব না। তিনি প্রাণধারণের নিমিত্ত দুটি অন্ন মুখে দিবেন, আমিও তাই করিব।"*

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই অবস্থা ধ্যানের বস্তু। ইহাতে মন নির্ম্মল হয়, শ্রীগৌরাঙ্গে প্রীতি হয়, আর শ্রীভগবৎ বিরহরূপ যে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ তাহা পরিণামে লাভ হয়। তাই, আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রিয়াজী কর্ত্তৃক তাঁহার পতির নিকট শান্তিপুরে প্রেরিত দুইখানি লিপি রচনা করিয়াছিলাম।

* যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥—প্রেমদাস।

শুনি, কিন্তু শাস্ত্রে প্রমাণ নাই যে, যখন নদেবাসীরা শান্তিপুরে শ্রীনিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন প্রিয়াজী একটি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রভুকে এক খানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, সেই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই পত্রিকা লেখা হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনিমাইয়ের প্রতি—

যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া।
সে হ'তে আছেন মাতা উপোস করিয়া॥
সদা তাঁর সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী।
নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি॥
খাওয়াইতে করি যত সাধ্য সাধন।
মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন॥
মোর হাতে মা রাখিয়া চলে গেলে তুমি।
অকুল পাথারে দেখ পড়িলাম আমি॥
পিতা চেয়েছিলেন মোরে বাড়ী লইবারে।
তাকি আমি যেতে পারি মাকে একা ছেড়ে?
সন্ন্যাসী ঘরণীর নিয়ম কিছুই না জানি।
কি খাইব কি পরিব লিখিবে আপনি॥
হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হ'লো ভয়।
পাছে বা তোমার কিছু অমঙ্গল হয়॥
তোমার পাটের জোর গলার চাদর।
তোমার গলার হার চরণ নূপুর॥
কি করিব এ সকল সামগ্রী লইয়া।
রাখিব কি গঙ্গা মাঝে দিব ভাসাইয়া॥
এ সব বারতা আমি কাহারে সুধাই।
মাকে সুধাইলে মরি যাবেন নিশ্চয়॥

মার কাছে থাক যদি বড় ভাল হয়।
আমি কাছে না যাইব না করিহ ভয়॥
তা'হলে সে শান্ত হবেন দুঃখিনী জননী।
তাঁরে বলে দিও নিয়ম কি পালিব আমি॥
আপনি যে সব তুমি নিয়ম পালিবে।
তা'হতে কঠোর নিয়ম এ দাসীরে দিবে॥
বাঁচিব ত্যজিয়া আমি ভূষণ ভোজন।
সুখেতে করিব আমি মাটিতে শয়ন॥
লোকে বলে তুমি নাকি আমার লাগিয়া।
গার্হস্থ্য ছাড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী হইয়া॥
কেন আমি তোমার কি করিলাম ক্ষতি।
কোন দিন সংকীর্ত্তনে করেছি আপত্তি ?
আছাড়ে তোমার সর্ব্ব অঙ্গে লাগে ব্যথা।
বল দেখি কোন দিন কহিয়াছি কথা ?
খাট হ'তে ভূমে গড়াগড়ি দিতে তুমি।
বল কোন দিন রাগ করিয়াছি আমি ?
পাষাণ গলিত তোমার করুণ রোদনে।
মোর দুঃখ রাখিতাম আপনার মনে॥
আমারে দেখিলে যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
আমি নয় রহিতাম বাপের আলয়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া পত্র লেখে কান্দিয়া কান্দিয়া।
বলরাম দেখে পাছে থাকি দাঁড়াইয়া॥

শ্রীমতী কখন ভাবিতেন, তিনিও একজন। পূর্ব্বে তিনি যে পৃথক্ কেহ একজন তাহা বোধ ছিল না। এখন ভাবিতেছেন, তাঁহার

শাশুড়ীকে সেবা করিতে হইবে। শাশুড়ী যাহাতে উতলা না হয়েন এইরূপ ধৈর্য্য ধরিয়া তাঁহার চলিতে হইবে। বলিতেছেন, “সখি! আমার হাতে তিনি জননীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আপনার স্থানে আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার সেই ভার কুলাইতে হইবে। আবার বলিতেছেন, “সখি! আমার সমবয়সীরা বড় খুসী হইয়াছে, না? তাহারা ভাবিতেছে, খুব হয়েছে, বড় আদরিণী হইয়াছিলেন, মাটীতে পা দিতেন না। কিন্তু এ কথা অন্যায়, না? আমার কি গরব হইয়াছিল? গরব ত নয়, আমার একটু তাচ্ছিল্য হইয়াছিল। আমি পতিসেবা করি নাই। তিনি কিরূপ গুণের নিধি তাহা বুঝি নাই। প্রভুকে অনাদর করিয়াছিলাম, তিনি আদরের ধন, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।”

আবার ভাবিতেছেন যে, জগতের সমস্ত লোক তাঁহার নিন্দা করিতেছে। ভাবিতেছেন, ইহাতে তাঁর উপরে বড় অত্যাচার হইতেছে। সে অত্যাচারের নিমিত্ত অভিযোগ তিনি আর কাহার নিকট করিবেন, তাই পতির কাছে করিতেছেন। যথা—

আমার বয়সী, যে তোমা দেখিল,
কত না নিন্দিল মোরে।
সেত অভাগিনী, হেন গুণমণি,
কেন রবে তার ঘরে?
যদি রূপ গুণ, থাকিত তাহার,
পতি কি যৌবনকালে।
কৌপীন পরিয়া, কাঙ্গাল হইয়া,
গৃহ ছাড়ি বনে চলে?
নিঠুর রমণী, পাপিনী তাপিনী,
পতি দেশান্তরি করে।

নিদয় হইয়া, চলিছ ফেলিয়া,
লোকে গালি পাড়ে মোরে ॥
আমি কি তোমায় দিয়াছি বিদায়,
সত্য করে বল নাথ।
তোমার লাগিয়া, মরিছি পুড়িয়া,
তাহে লোক পরিবাদ ॥
তুমি মোর পতি, হইয়াছ যতি,
একা মোর সর্ব্বনাশ।
প্রিয়ার রোদন, তারিবে ভুবন,
আর বলরাম দাস ॥

কখন কখন "প্রভু" "প্রভু" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। তখন সখীগণ বায়ুবীজন করিতেছেন, কপালে সজোরে জলের ছিটা মারিতেছেন, দাঁত ছাড়াইতেছেন, প্রাণ আছে না আছে পরীক্ষার লাগি নাসায় তূলা ধরিতেছেন। শুশ্রূষায় চেতন পাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া সখীর গলা ধরিয়া রোদন করিতেছেন। আবার মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে, আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। সে কথা বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূমিকা করিলাম।

পাছে শ্রীমতীর দুঃখে কেহ অধীর হয়েন, তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত আমার সেই কথা বলিতে হইতেছে। সে কথাটি এই যে, গৌর-প্রণয়িনীর গৌর-বিরহে যেমন দুঃখ, তেমনি আবার তিনি আনন্দ ভোগ করিতেছিলেন। শ্রীভগবৎ বিরহের মত দুঃখ আর নাই। শেষ লীলায় প্রভু এই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ন্যায় আনন্দও আর নাই। প্রকৃত কথা, কৃষ্ণ-বিরহে যে দুঃখ সে বাহিরের। কৃষ্ণ-বিরহ উপস্থিত হইলে অন্তর আনন্দে পূরিয়া যায়। এখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দের কারণ বিবরিয়া বলিতেছি।

মদ্যমাংসে আরাম আছে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতেও অবশ্য মিষ্টতা আছে। অন্যকে দুঃখ দিয়া আপনার সুখ সংগ্রহ করিতেও জীবকে দেখা যায়। কিন্তু হে জীব! জীবকে দুঃখ দিয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা জীবের সুখের নিমিত্ত আপনি দুঃখ লইয়া যে সুখ, সে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বোধ জীব সচরাচর তাহার বিপরীত করিয়া থাকে; কিন্তু সে তাহারা জানে না বলিয়া। মনুষ্যের দেবত্ব ও পশুত্ব, এই দুই ভাব আছে। যে ভাবগুলি পশুর আছে মনুষ্যেরও আছে, সেই মনুষ্যের পশুভাব। যাহা পশুর নাই মনুষ্যের আছে, তাহা তাহার দেবভাব। একটি কাকের ছানা তাহার নীড় হইতে পড়িয়া গেলে, অন্যান্য কাকেরা তাহাকে ঘেরিয়া ঠোকরাইতে থাকে, ও এইরূপে তাহাকে বধ করে। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এরূপ নয়। তাহারা যদি কোন অনাথ শিশু দর্শন করে, তবে তাহাকে পোষণ করে। কাকেরা পশুভাবে কাক-শিশুর প্রতি নিঠুরতা করে, মনুষ্য দেবভাবে মনুষ্য-শিশুকে পোষণ করে। মনুষ্যের এই দেবভাবকে উদ্দীপনা করা ও পশুভাব গুলিকে উহার অধীন করাকে "সাধন" কি "যোগ" বলে, কি "উদ্ধার হওয়া" কি "মুক্তি" বলে। যখন কোন দুর্ব্বল জীব কোন সাধুর চরণে পতিত হইয়া বলে, "প্রভু! আমাকে উদ্ধার কর," তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এই যে, "প্রভু! আমার দেবভাব গুলি উত্তেজিত করিয়া দিয়া, আমার পশুভাব গুলিকে উহার অধীন করিয়া দাও।" কিন্তু এই পশুভাব গুলিরও প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত দেবভাব গুলি পরিবর্দ্ধিত হয় না। স্থানভ্রষ্ট না হইলে এই পশুভাব গুলি বড় উপকারী সামগ্রী। যথা, স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ে দেবভাব ও পশুভাব আছে। আর এই পশুভাবে সেই দেবভাবের পরিবর্দ্ধন ও সহায়তা করে।

এই দেবভাবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই,—প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া। এই কয়েকটি ভাবে স্বার্থরূপ মলিনতা নাই। ইহাতে স্বার্থরূপ মলিনতা স্পর্শ করিলেই উহা মলিন হইয়া যায়। প্রেম কি, না—অন্যের প্রতি আকর্ষণ। ভক্তি,—অন্যের গুণে মোহিত হওয়া। দয়া,—অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া। এই কয়েকটি ভাবের উৎকর্ষে আনন্দ উপস্থিত হয়, এবং যে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সুখের তুলনাই হয় না। প্রীতির বস্তু সৃষ্টি হইবামাত্র স্বভাবতঃ আনন্দ হয়, যেমন বিবাহ-রাত্রে বরকন্যার আনন্দ। অন্যের গুণ দেখিলে আনন্দ, যেমন বাজীকরের উত্তম বাজী দেখিলে আনন্দে নয়নে জল আইসে। অন্যের দুঃখে দুঃখবোধে যে আনন্দ হয় তাহাও সকলে জানেন। এই-রূপে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়া হইতে আনন্দ উপস্থিত হয়।

পতি ও পত্নী উভয়ই উভয়ের আনন্দের সামগ্রী। যত দিবস এই আনন্দের সহিত পশুভাব মিশ্রিত থাকে, তত দিবস এই আনন্দ নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয় না। যে দম্পতিপ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, সেই দম্পতি হইতে অখণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। সেই দম্পতিপ্রেমে তখনি অখণ্ড আনন্দ উৎপত্তি করে, যখন উহা হইতে পশুভাব একে-বারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব পতিপ্রাণা বিধবারও একপ্রকার আনন্দ আছে, যাহা সধবা স্ত্রীর নাই। যেহেতু বিধবা স্ত্রীর পতির সহিত স্বার্থ সম্বন্ধ রহিত হইয়া গিয়াছে। কুপ্রবৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া জীবের একটা ভ্রম উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে, সুখ কেবল অসুর ভাবেই আছে। ক্ষমতা পাইব, অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিব, ইন্দ্রিয় সুখ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ করিব, তবেই সুখী হইব। কিন্তু এ সমুদয় যে পাশব, তাহা যিনি পবিত্র হইয়াছেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।'

এখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার ও শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রের কি ভাব অনুভব

করুন। উনিও আছেন, ইনিও আছেন ; তাঁহাদের প্রীতি আছে, সব আছে, কেবল পশুভাব নাই। সেখানে পরস্পরের বিরহে যে দুঃখ সে আর কতটুকু? শুধু প্রীতির বস্তু হইতেই একটি সুখ হয়, প্রাপ্তির প্রয়োজন করে না। যথা, যখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথা হইতেছে, তখনি বরকন্যা সুখ-সাগরে ভাসিতে থাকেন। ইনি ভাবেন আমি আমার ধন পাইলাম, কি পাইতেছি ; উনিও আবার তাহাই ভাবেন। এই ভাব উদয় হইলেই আনন্দ। পুত্র হইয়াছে শুনিলে আনন্দ হয়, যদিও সে পুত্র তখন তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই।

আবার প্রিয়বস্তু যত প্রিয়ত্ব পায়েন, তিনি তত সুখের বস্তু হয়েন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পতি প্রিয় আছেন ; পূর্ব্বে তিনি যেরূপ প্রিয় ছিলেন, এখনও তাহাই আছেন, বরং তাঁহার প্রিয়ত্ব কোটি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীনিমাইপণ্ডিত শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি বলিয়া অতি প্রিয়। এখন উপপতির দুর্ল্লভত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আরো প্রিয় হইয়াছেন। অধিকন্তু তাহার পরে, তাঁহার নাগর, প্রতিকূল নাগরের মাধুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কারণ আপনারা জানিবেন, প্রিয়বস্তু যদি দুর্ল্লভ হয়েন, তবে তিনি প্রিয়তর হয়েন। আবার তিনি যদি প্রতিকূল হয়েন, তবে প্রিয়তম হয়েন।

তাঁহার পতি এখন তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত দর্শন করিবেন না, তাঁহার ছায়া দেখিলে দৌড় মারিবেন, কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল হইলে কখন কখন প্রীতি ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন সে প্রীতি বদ্ধমূল হয় নাই। প্রকৃত প্রীতি হইলে, নাগর প্রতিকূল হইলে, উহা আরো বদ্ধমূল হয় ; ইহা প্রীতির ধর্ম্ম।

বিষ্ণুপ্রিয়ার তাঁহার স্বামীর সহিত পশুভাব গিয়াছে, এইমাত্র। তাঁহার পতি—তাঁহার সুখের যে প্রস্রবণ তাহা এখনও আছেন, বরং

সেই প্রস্রবণ আরও বেগবান্ হইয়াছে। তাঁহার স্বামীর অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া তিনি আবার স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন। ভাবিতেছেন, "কি মানুষ! কি অদ্ভুত দয়া! জীবকে হরিনাম লওয়াইবেন বলিয়া আমাকে পর্য্যন্ত ফেলিয়া গেলেন? ইহা কি কেহ কখন শুনেছে না দেখেছে?" মাঝে মাঝে পতির সন্ন্যাসের রূপ তাঁহার হৃদয়ে আপনি আপনি উদয় হইতেছে, আর "মলেম মলেম" বলিয়া বুকে হাত দিয়া মৃত্তিকায় পড়িতেছেন। তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন, আর বলিতেছেন, "আমার রাগ করা অন্যায় হইতেছে। আমাকে ফেলিয়া ত তিনি সুখী হন নাই।" যথা—

কার উপরে কর অভিমান রে পাগল প্রাণ। ধ্রু।
তোমার অঙ্গে সাটী পরা তার কৌপীন পরিধান॥
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে,
তুমি থাকো গৃহ মাঝে,
নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান॥

আবার তখনি ভাবিতেছেন যে, তিনিও একজন। এই শুভকার্য্য সাধনের তিনিও একটি উপকরণ। তিনি যে একটি উপকরণ শুধু তাহাও নয়, তাঁহার স্বামীর সর্ব্বপ্রধান সহায়। তিনি কান্দিবেন, আর জীবও মুক্ত হইবে। এ সমুদায় ভাবে শ্রীমতীর হৃদয় যখন পূরিয়া যাইতেছে, তখন তিনি জগৎ সুখময় দেখিতেছেন, আপনাকে ধন্যা মনে করিতেছেন। দুঃখে যে নয়নজল ফেলিতেছেন, ইহাতে তখন আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন। আবার দুঃখে যখন নয়নজল ফেলিতেছেন, উহা দ্বারা মনের দেবভাবগুলি আরো পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

এদিকে শান্তিপুরে প্রভুর কার্য্য শ্রবণ করুন। প্রভু যেরূপ নদীয়ায় বাস করিতেন, শান্তিপুরে সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তবে গূঢ়তম

সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন। কি রাধা কি কৃষ্ণ, এ ভাবে আর শান্তিপুরে বিরাজ করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবান্ মাধুর্য্যভাবে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ, এবং বিশেষ কারণে কোন কোন স্থান, ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েন নাই।*

নানান্ প্রকারে প্রভু মায়েরে শান্তায়।
অদ্বৈতঘরণী সীতা শচীরে বুঝায়॥
শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক।
সুদৃষ্টি মেলিয়া প্রভু জুড়াইল শোক॥
শান্তিপুর ভরিয়া উঠিল হরিধ্বনি।
অদ্বৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি॥
প্রেমে টলমল করে স্থির নহে চিত।
নিতাই ধরিয়া কান্দে নিমাইপণ্ডিত॥
অদ্বৈত পশারি বাহু ফিরে পাছে পাছে।
আছাড় খাইয়া গোরা ভূমে পড়ে পাছে॥
চৌদিকে ভকতগণ বলে হরি হরি।
শান্তিপুর হোল যেন নবদ্বীপপুরী॥
প্রভু অঙ্গে কোটিচন্দ্র জিনিয়া আভাষ।
এ ডোর কৌপীন তাহে প্রেমের প্রকাশ॥
হেন রূপ প্রেমাবেশ দেবী শচীমায়।
বাহিরে দুঃখিত কিন্তু আনন্দ হৃদয়॥
বুঝায় শচীর মন অবধৌত রায়।
সংকীর্ত্তন সমাপিয়া প্রভুরে বসায়॥
এইরূপে দশদিন অদ্বৈতের ঘরে।
ভোজন বিলাসে প্রভু আনন্দ অন্তরে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া।
অদ্বৈতের এই আশা না দিব ছাড়িয়া॥

শান্তিপুরে প্রভু সন্ন্যাসের সমুদয় নিয়ম ত্যাগ করিলেন। সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা গৃহস্থ ভক্তগণকে কি জননীকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিধান কেবল কৌপীন ও বহির্ব্বাস, সন্ন্যাসের এই চিহ্ন। আর শ্রীমতী নিকটে নাই। নদীয়া-বিহারের সহিত এইমাত্র বিভিন্নতা। প্রভু সারাদিন কৃষ্ণকথায় যাপন করিয়া সন্ধ্যা হইতে অধিক নিশা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন। শচী রন্ধন করেন, প্রভু ভোজন করেন। শচী কত যে রন্ধন করেন, তাহার সংখ্যাও করা যায় না। প্রভুও বিশ্বম্ভর হইয়া, জননীকে আগে করিয়া, তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়া ভোজন করেন। ভোজনান্তে শ্রীনিতাই একবার ভাত ছড়াছড়ি করেন। প্রভুর ভোজন হইলে সেই পাত্র লইয়া একটা মারামারি হয়, সে আর এক রঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ীতে প্রত্যহ মহোৎসব। প্রত্যহ সহস্র লোকের আয়োজন। সমস্ত দিবস শত শত সম্প্রদায় "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ" প্রভৃতি গীত গাইতেছেন, আর সমুদায় শান্তিপুর ভক্তির তরঙ্গে "ডুবু ডুবু" হইতেছে।

নদীয়াবাসীরা আগমন করিলে, প্রথম দিবসেই বিকালে, প্রভু অতি নিজজন ও অতি বিজ্ঞ ভক্তগণকে নিকটে বসাইলেন, বসাইয়া মধুর-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের ও জননীকে দুঃখ দিয়া, তোমাদের অনুমতি না লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছিলাম, কাজেই যাইতে পারিলাম না। তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমার বিরহে তোমরা বড় দুঃখ পাইয়াছ। জননীর দশা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আমি তাহার কি আর বর্ণনা করিব। আবার আমার দশা তোমরা দেখিতেছ,—লক্ষ লোকের মাঝে মাথা মুড়াইয়া পৈতা ফেলিয়া কৌপীন পরিয়াছি। এখন যদি আবার পট্টবস্ত্র পরিয়া তোমাদের সমাজে প্রবেশ করি, তবে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এবং লোকে উপহাস করিবে। আবার

যদি তোমাদের ফেলিয়া যাই, তোমরাও দুঃখ পাইবে, জননীও দুঃখে প্রাণে মারিবেন। প্রথম যখন জননীকে দর্শন করিলাম, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আপনাকে আর আপন সন্ন্যাসধর্ম্মকে ধিক্কার দিলাম। ভাবিলাম, কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ; তাঁহার নিমিত্ত যখন সন্ন্যাস প্রয়োজন নহে, তখন আমি এ ভীষণ আশ্রম কেন গ্রহণ করিলাম? জননীকে দর্শন মাত্রে এই অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া, আমি জননীর নিকট একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি। সেটি এই যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি কোথায়ও যাইব না। আর তিনি যেখানে যাইতে বলেন, সেইখানেই যাইব। এমন কি, আমি এরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, জননী যদি আমাকে এখন নদীয়ায় যাইতে বলেন, তাহাও আমার যাইতে হইবে। সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিব, ইহাতে আমি কোন বাধা মানিব না। আমি স্বয়ং যাইয়া, আমার প্রতি জননীর কি আদেশ হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু আমি যাইব না, তাহা হইলে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আমি এই পোড়া আশ্রম অবলম্বন করায় তিনি আমাকে এখন ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন। আমার কাছে মনের কথা সরলভাবে বলিতে সাহস পাইবেন না। অতএব আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন, করিয়া তাঁহাকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিউন। তাঁহাকে বলিবেন যে, পূর্ব্বেও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি যে, আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন। তিনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব; এমন কি, যদি সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে বলেন, তাহাও করিব।”

এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ স্তম্ভিত হইলেন। প্রভু কি বলিতেছেন, উহা বুঝিতে তাঁহাদের অনেক সময় লাগিল। প্রভু যখন

জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, তখন তাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভাবিয়াছিলেন যে, প্রভু কেবল জননীকে প্রবোধ দিতেছেন এই মাত্র, মনোগত কিছু বলিতেছেন না। এখন এরূপ স্পষ্টাক্ষরে আপনাকে জননীর আজ্ঞাস্রোতে ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া ভক্তগণের বিস্ময় হইল। ভাবিতেছেন, প্রভুর একি লীলা? প্রভু ত স্বেচ্ছাময়; ত্রিভুবন একদিকে, আর তিনি একদিকে। অদ্য ষষ্ঠ দিবস মাত্র সন্ন্যাস করিয়াছেন। আজ বলিতেছেন, "মা যদি বলেন, গৃহে ফিরিয়া যাইব," এ কথার অর্থ কি? মা আর কি বলিবেন? মা বলিবেন. "বাড়ী চল, লোকে হাসে হাসিবে, ভক্তগণ ত হাসিবে না? আর হাসিবেই বা কেন?" মা ইহা ছাড়া আর কি বলিবেন? আমরা পুরুষ, কঠিন, কিছু জ্ঞানও আছে। আমরাই বা কে, প্রভুই বা কে? আমরা কি বলিব? আমরা সকলেই বলিব, প্রভু বাড়ী চল। সেখানে শচী স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা, এক পুত্রের মাতা, নিমাইয়ের জননী, তিনি আর কি বলিবেন? তবে কি সত্যই প্রভু আবার নদীয়ায় যাইবেন? সত্যই আবার নবদ্বীপচন্দ্র নবদ্বীপ আলো করিবেন? আবার কি আমরা নদিয়ায় সুখের পাথারে সাঁতার দিব, আর রাসলীলায় নৃত্য করিব? এই আনন্দে ডগমগ হইয়া ভক্তগণ শচীকে যাইয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন।

নিতাই আগেই বলিতেছেন, "মা! বড় শুভ সংবাদ, এখন তুমি বলিলেই হয়। প্রভু বলেছেন, তুমি বলিলেই তিনি গৃহে গমন করেন।"

শ্রীঅদ্বৈত তখন নিত্যানন্দকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুরাণী! প্রভু তোমার দুঃখ দেখিয়া বড় সন্তপ্ত হয়েন, হইয়া তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে তুমি যাহা বলিবে তিনি তাহাই করিবেন। সে প্রতিজ্ঞা এখন তিনি পালন করিবেন। এমন কি, এখন যদি তুমি বল, তবে শ্রীনবদ্বীপে যাইয়া পুনরায় সংসার করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন।

সেই নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আপনার কি আদেশ তাহাই শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনি আসিতেন, তবে তাঁহার সম্মুখে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া কথা বলিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।"

যখন শ্রীঅদ্বৈত এই কথা বলিতেছেন, তখন ভক্তগণ অতি আগ্রহ সহকারে শচীর—শ্রীঅদ্বৈতের নয়—মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী সমুদায় কথা শুনিলেন ও বুঝিলেন। বুঝিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখাইলেন না। তবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন, ছাড়িয়া মস্তক অবনত করিলেন।

শচীর এই ভাব দেখিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। ভক্তগণের বিলম্ব সহিতেছে না। তাঁহারা বলিলেন, "মা! ভাবিতেছ কি? বলে ফেল যে নদে চল,—আর কি?"

শচী ভক্তগণের কথার উত্তর করিলেন না। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগণ শুনিতে লাগিলেন। শচী বলিতেছেন, "আমার সাধ কি তাহা আমার কাছে তাঁহার জানিতে পাঠান নিষ্প্রয়োজন। তিনি পথে পথে বেড়াইবেন, বৃক্ষতলে শুইবেন, ইহা আমার সাধ হইতেই পারে না। তাঁহাকে যদি বাড়ী লইয়া যাই তবে আমার, বিষ্ণুপ্রিয়ার ও তোমাদের দুঃখ মোচন হইবে'; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিবে। আমি মা হইয়া এরূপ কার্য্য কিরূপে করিব? আমি মরিব সেও ভাল, তবু নিমাইয়ের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এরূপ আজ্ঞা আমি করিতে পারিব না।"

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যখন নিমাইয়ের দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে সর্ব্বজীবের নাথ! আমার শিশু-

সন্তান সন্ন্যাস করিয়াছে, যেন তাহার ধর্ম্ম নষ্ট না হয়," অর্থাৎ সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া যেন সে বাটী ফিরিয়া না আইসে। আবার এখন শচী নিমাইকে করতলে পাইয়া ভাবিতেছেন, নিমাইকে বাড়ী নিয়া গেলে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।

তাহার পরে শচীদেবী বলিতেছেন, "যখন তিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, তখন আর উপায় নাই। তিনি আমাকে কৃপা করিয়া আমার নিকট অনুমতি চাহিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে আমা হইতে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না। তাই জানিয়াই আমার উপর নির্ভর করিয়াছেন। আমিও আমার যাহা উচিত তাহাই করিব। আমি ভাবিতেছি যে, তিনি নীলাচলে বাস করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, তাহাতে তাঁহার সংবাদ পাইব। আর তিনি যদি গঙ্গাস্নান করিতে আইসেন, তবে তাঁহার দর্শন পাইব।" এই কথা বলিতেছেন, আর শচীর মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ করিতেছে, এবং চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বোধ হইতেছে।

ভক্তগণ যখন এই কথা শুনিলেন, তখন সকলেই চকিত, ও কেহ বা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা শচী ও প্রভুকে অগ্রে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপে যাইবেন, এই আনন্দে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন; এমন সময় শচীর মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া, তাঁহারের মাথায় একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভক্তগণের অবস্থা একবার মনে করুন। তাঁহারা শ্রীনিমাইকে শ্রীভগবান্ বলিয়া জানিয়াছেন। তাঁহাকে প্রকৃতই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রীতির ভজন করিয়া একেবারে বালস্বভাব পাইয়াছেন। তাঁহারা জগতের মধ্যে কেবল এক ঠাকুরাণীকে ভজনা করেন। তিনি কে, না—ভালবাসা। যদি তাঁহারা দেখেন পশু, পক্ষী

তাহার শাবককে আহার দিতেছে, তবে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের উদয় হয়, ও নয়নে জল আইসে। যদি দেখেন, কপোত ও কপোতী মুখে মুখ দিয়া পরস্পরে প্রণয় সুখ অনুভব করিতেছে, তবে তাঁহাদের আনন্দাশ্রু পতিত হয়। তাঁহাদের নিকট নিয়ম বিধি ভাল লাগিবে কেন? তাঁহাদের ইচ্ছা যে, প্রভু সুন্দর নাগর হইয়া বসিয়া থাকুন, আর তাঁহারা কেবল মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিউন। এই তাঁহাদের ভজন সাধন ও চরম প্রত্যাশা।

ভক্তগণ শচীর বাক্য শুনিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরাণী! করেন কি? আর ত প্রভু থাকিবেন না? তুমি বিদায় করিলে, আর তিনি থাকিবেন কেন? তোমার বাক্য তাঁহার নিকট চিরদিন দেববাক্যের ন্যায়। তবে ত তোমার কথায় আমরা প্রভুকে হারাইলাম।"*

ফল কথা, ভক্তগণ প্রভুর সহিত এখানে একটু বিশ্বাস-ঘাতকতা করিলেন। তাঁহাদের শচীদেবীকে কোন পরামর্শ দেওয়ার অধিকার ছিল না। পাছে স্বয়ং গমন করিলে শচীর মন কোন প্রকারে বিচলিত হয়, এই নিমিত্ত তিনি ভক্তগণকে পাঠাইলেন, আপনি গমন করিলেন না। ভক্তগণের উপর এইমাত্র ভার ছিল যে, তাঁহারা শচীর নিকট সমুদায় অবস্থা সরলভাবে বলিবেন, বলিয়া তাঁহার সরল অভিপ্রায় কি

* শচীর বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ।
বিবশ হইয়া রহে করিয়া রোদন॥
হেন বাক্য কেন মাতা কহিলে আপনে।
শ্রুতি বাক্য সম ইহা খণ্ডে কোন জনে॥
নীলাচলে যাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে।
দুর্লঙ্ঘ্য তোমার বাক্য, কেনবা কহিলে॥ —চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

তাহা জানিয়া আসিবেন। তাঁহারা একটু অধিক করিলেন, অর্থাৎ শচীর পরামর্শ যাহাতে তাঁহাদের মনোমত হয় তাহারি চেষ্টা করিলেন।

শচী তখন সেই দুঃখের মাঝে একটু হাস্য করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আমার নিমাই কয়েক দিবস পূর্ব্বে ত্রিলোক সাক্ষী করিয়া সংসার ত্যাগ করিল। তখন যদি আমি সেখানে থাকিতাম, তবে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতাম। এখন আমি বলিব যে, নিমাই, তুমি আমার সুখের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও ধর্ম্ম নষ্ট কর? ইহা আমার দ্বারা হইবে না। নবদ্বীপের নিকট কোন স্থানেও তিনি থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে আমি, বিষ্ণুপ্রিয়া ও তোমরা,—আমরা সকলেই তাঁহাকে বিরক্ত করিব, কুলোকে নানা কথা বলিবে; আমি নিমাইকে লইয়া পরচর্চ্চা করিতে দিব না।"

সকলে বুঝিলেন, শচীর সংকল্প অতি দৃঢ়। ইহাতে অনেকে মনে মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার কার্য্য স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠক, একবার শচীর-স্থানে আপনাকে রাখিয়া তাঁহার এ অদ্ভুত কার্য্যের বিচার করিবেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এরূপ জননী না হইলে, তাঁহার উদরে শ্রীভগবান্ কেন জন্মগ্রহণ করিবেন?

শচী নিমাইকে নীলাচলে থাকিতে, অর্থাৎ সংসারের বাহির হইতে অনুমতি দিয়া, আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, "হা নিমাই" "হা নিমাই" বলিয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন।

একবার রঙ্গ দেখুন। অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়াছেন, এই রাধাভাবে বিভোর হইয়া, যোগিনীবেশে তাঁহাকে মথুরায় তল্লাস করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহের বাহির হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র রাধাভাব গেল। তখন দীন হইতে দীন ভক্তরূপে শ্রীমুকুন্দ-ভজনের

নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে চলিলেন। আবার এখন শ্রীবৃন্দাবন গেল, মথুরা গেল, এখন চলিলেন নীলাচলে!

প্রকৃত কথা, প্রভুর তখন বৃন্দাবনে যাইবার সময় হয় নাই। তখন বৃন্দাবন জঙ্গলময়। মুসলমানের অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারখারে গিয়াছে; সেখানকার অধিবাসী সমুদায় ভদ্রলোক পলায়ন করিয়াছে; কেবল যাহারা দরিদ্র ও মুর্খ তাহারাই সেখানে তখন বাস করিতেছে। তাই, তাঁহার যাইবার আগে, অগ্রহায়ণ মাসে, বৃন্দাবন তাঁহার বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভক্তগণ আসিয়া তখন প্রভুকে শচীর আজ্ঞা নিবেদন করিলেন। প্রভু অমনি ভক্তিতে গদগদ হইয়া, "যে আজ্ঞা" বলিয়া, শেষে বলিতেছেন, "জননীর আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য। আমার মনেও বড় ইচ্ছা ছিল যে আমি নীলাচল-চন্দ্রকে দর্শন করিব। তাহা হইল ভাল, আমার বাসনা পূর্ণ হইল।" বিবেচনা করিতে গেলে, নীলাচল ব্যতীত তখন প্রভুর থাকিবার উপযুক্ত স্থান আর একটিও ছিল না। ভারতবর্ষে তখন এই কয়েকটী প্রধান তীর্থস্থান ছিল,—পাণ্ডুপুর, বারাণসী ও নীলাচল। মুসলমানের উৎপাতে বৃন্দাবন তখন অরণ্যময়। পাণ্ডুপুর অতি দক্ষিণ দেশে, সেখানে সন্ন্যাসী ব্যতীত গৃহস্থের যাওয়ার সম্ভব ছিল না; বিশেষতঃ সে স্থান বাঙ্গালা হইতে তিন মাসের পথ দূরে। আবার কাশী যাওয়ার পথ অরাজকতায় একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথ ও ভূগর্ভ যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তাঁহারা পূর্ণিয়া দিয়া ভারতবর্ষ ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হয়েন। প্রভু অবশ্য বারাণসীতে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে বাঙ্গালার গৃহস্থ ভক্তগণের তাঁহার নিকট যাওয়া প্রায়ই ঘটিত না। কেবল এক নীলাচল তখন সমৃদ্ধিশালী, বাঙ্গালার নিকট, অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্য তখন বাঙ্গালার

মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা পর্য্যন্ত ছিল। সে সীমা অতিক্রম করিয়া মুসলমানগণের যাইবার অধিকার ছিল না। এই নীলাচলে ভারতবর্ষের তাবৎ স্থান হইতে যাত্রিগণ যাইতেন। অতএব সমুদায় বিবেচনা করিতে গেলে, ইহাই প্রভুর বাসোপযোগী স্থান তাহার সন্দেহ নাই। যাত্রিগণ জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন, যাইয়া প্রভুকে পাইতেন, পাইয়া উদ্ধার হইতেন। বাঙ্গালার মধ্যে শ্রীনবদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যাত্রীর কি লোকের এরূপ সমবেত হইবার সম্ভব ছিল না।

অতএব ইহাই সাব্যস্ত হইল, প্রভু নীলাচলে বাস করিবেন। কেবল কবে যাইবেন, তাহাই সাব্যস্ত বাকি রহিল। প্রভু যাইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ অতিশয় কাতর হইলেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়া মনস্থির করিতে লাগিলেন। শচীদেবীর মনের কি ভাব তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। নিশি হইল, অমনি কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অমনি মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ বিমর্ষ, কিন্তু প্রভু প্রফুল্ল বদনে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিলেন। কীর্ত্তন বলি, কিন্তু প্রভুর সে কীর্ত্তন আর এক রূপ। দুই বাহু তুলিয়া, মধুর ভঙ্গি করিয়া, মুখে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি করিয়া, মৃদঙ্গ ও করতালের তালে তালে, পায়ে নূপুর দিয়া নৃত্য। এই ত প্রভুর কীর্ত্তন। গীত গাইয়া, আলাপ করিয়া, কি কিছুকাল পর্য্যন্ত রঙ্গের মৃদঙ্গ বাজাইয়া, আসর জমকাইবার অবকাশ প্রভুর হইত না। তবে প্রভু যখন বসিয়া থাকিতেন, কি অন্তরালে থাকিতেন, তখন কীর্ত্তনে মুকুন্দ, বাসু, শ্রীবাস, রামানন্দ প্রভৃতি গান গাইতেন। প্রভু নৃত্যস্থলে প্রবেশ করিলে, যেমন সূর্য্য উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপে লোকের মনে প্রভুকে সত্বর হারাইবেন বলিয়া যে উদ্বেগ, তাহা দূরীভূত হইত। ক্রমে সকলে একে একে নৃত্যে যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুর

আগে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখপদ্মে আঁখি রাখিয়া, বক্র হইয়া, থুথনীতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া, ভ্রূকুটি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই তাঁহার নৃত্যের ভঙ্গি। দুই পা জুড়িয়া, জোড়ে জোড়ে লম্ফ, নিত্যানন্দের নৃত্য। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ বড় একটা নৃত্য করিতে পারিতেন না। প্রভু পাছে পড়িয়া যান বলিয়া দুই বাহু প্রসারিয়া প্রভুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। তাঁহার এই কার্য্যের সহকারী ছিলেন, গদাধর ও শ্রীখণ্ডের নরহরি।

শচী পিঁড়ায় বসিয়া, কাছে সীতাদেবী প্রভৃতি। শচী যে কীর্ত্তন দর্শন কি শ্রবণ করিতেছেন, তাহা নয়। পিঁড়ায় বসিয়া আছেন, তাহার প্রধান কারণ, নিমাই ঘুমান নাই, তিনি কিরূপে শুইবেন? দ্বিতীয় কারণ, নিমাই সম্মুখে, তাঁহাকে রাখিয়া কোথা যাইবেন? তৃতীয় কারণ, মনের ভাব যে, তিনি কাছে থাকিলে নিমাইয়ের একটু ভালরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইবে। তাই যখন নিমাই নৃত্য করিতে করিতে পড়িবার মত হইতেছেন, অমনি শচী উঠিয়া, "নিতাই" "নিতাই" করিয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, "ধর ধর নিতাই ধর, নিমাই পড়িয়া গেল।" কিন্তু নিতাই প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে সাবধান করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। তবু মায়ের প্রাণ, শচী সর্ব্বদা নিতাইকে সাবধান করিতেছেন, তাই সেখানে বসিয়া আছেন। শচী বসিয়া সেখানে আপনাকে একাকিনী ভাবিতেছেন, কারণ কাছে বিষ্ণুপ্রিয়া নাই। মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হওয়ায় শিহরিয়া উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে নৃত্যে পড় পড় দেখিয়া উহা ভুলিয়া যাইতেছেন।

শচী যে ঠিক একা আছেন, তাহা নয়। কারণ শ্রীল মুরারি পিঁড়ার নীচে, তাঁহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া। মুরারিও শচীর প্রায়

পুত্রের ন্যায় নিজজন। মুরারি নৃত্যে যাইতে পারিতেছেন না, নৃত্যের যে আনন্দ তাহা তাঁহার আসিতেছে না। তিনি নৃত্যে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ শচীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে কীর্ত্তনানন্দের যে উদ্গম তাহা অন্তর্হিত হইল। শচীর কাছে অমনি দাঁড়াইয়া গেলেন, ও জননীর অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে যে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা কীর্ত্তনানন্দে দূরীভূত করিতে পারিতেছেন না। মুরারি দেখিতেছেন, শচীর নয়ন কেবল নিমাইয়ের দিকে, নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিচরণ করিতেছে। নিমাইকে পড় পড় দেখিয়া শচী ব্যস্ত হইয়া কখন অল্প উঠিতেছেন, কখন উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন, কখন "বাপ নরহরি, বাপ নিতাই, ধর নিমাইকে, পলো" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।

ইহার মধ্যে নিতাই কি নরহরি একবার সামলাইতে পারিলেন না। সেই সুদীর্ঘ পুরুষ শচীর নন্দন, অমনি ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। প্রভু যেরূপ করিয়া পড়িলেন তাহাতে সকলেরই বোধ হইল যেন তাঁহার সমুদায় অস্থি ভঙ্গ হইয়া গেল। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন, আর শচীর কি দশা হইল ভাবিয়া দেখুন। তিনি প্রথমে "নিতাই ধর, পলো পলো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যখন দেখিলেন যে, নিতাই ঠেকাইতে পারিলেন না, তখন নিমাইয়ের পতন দেখিবেন না বলিয়া নয়ন মুদিলেন, পতন শব্দ শুনিবেন না বলিয়া দুই কর্ণে দুই অঙ্গুলি দিলেন। এইরূপে চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয় বদ্ধ করিয়া মনে মনে "গোবিন্দ" "গোবিন্দ" স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। নিমাই চৈতন্য পাইলেন কি না দেখিবার নিমিত্ত নয়ন অর্দ্ধ উন্মীলিত করিলেন। যদি দেখিলেন, নিমাই চেতন পান নাই, তবে আবার নয়ন মুদিয়া গোবিন্দের

নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। যখন নিমাই চেতন পাইলেন, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছেন, "বাঁচিলাম ঠাকুর! যখন নিমাই আছাড় খাইয়া পড়ে, তখন তুমি আমাকে অজ্ঞান করিও, যেন আমার তাহা দেখিতে না হয়।"

কিন্তু নিমাই আবার পড়িলেন। শচী একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন। ক্রমে জ্ঞান হারাইতেছেন, শেষে প্রায় সমুদায় হারাইলেন, তখন চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে তোরা কীর্ত্তনে ক্ষমা দে। রাত্রি অধিক হইয়াছে।" কিন্তু সেই আনন্দসূচক "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনির মধ্যে কে তাঁহার কথা শুনে? তখন আবার বলিতেছেন, "তোরা নিমাইকে ছাড়িয়া দে, একটু ঘুমা'ক।" আবার বলিতেছেন, "আহা! বাছার আছাড়ে আছাড়ে হাড় ভাঙ্গিয়া গেল।" শচী আবার বলিতেছেন, "দেখেছ! লোকের রীতি দেখেছ? বাছা আমার সন্ন্যাস করিয়াছে বলিয়া কি উহার শরীরে ব্যথা লাগে না?" কিন্তু তবু কেহ তাঁহার কোন কথা শুনিতে পাইতেছেন না। তখন নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। "নিতাই" "নিতাই" "নিতাই" বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া, তাঁহাকে খোসামোদ করিয়া বলিতেছেন, "নিতাই! নিমাই তোমার ছোট ভাই বলিয়া উহাকে একটু ধর।" নিতাই শুনিতে পাইলেন না। তাহার পরে, "শ্রীবাস" "শ্রীবাস," "নরহরি" "নরহরি" বলিয়া ডাকিলেন, তাঁহারাও শুনিলেন না। তখন যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন. "ওগো একবার অদ্বৈত আচার্য্যকে ডাকিয়া দাও ত?"

মুরারি সমুদায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। শচীর যত ভাব-তরঙ্গ, তাহা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া মনোনিবেশপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন, আর মনে মনে বিচার করিতেছেন। কখন বা প্রভুর উপর রাগ হইতেছে, আর

বলিতেছেন, "প্রভু, একবার মায়ের দশাটি দেখে যাও।" মুরারি, শচীর দশা দেখিয়া; ভাবে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, সে অবস্থাটী বর্ণনা করিয়া, "শ্রীঅদ্বৈত আঙ্গিনায় শচীর উক্তি" এই পদটী বান্ধিলেন—

ধর ধর ধর রে নিতাই, আমার গৌরে ধর। ধ্রু।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া বারেক করুণা কর॥
আচার্য্য গোসাঞি, দেখিহ নিতাই,
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্ত্তনে,
পরাণে হইবে হারা॥
শুনহে শ্রীবাস, করেছে সন্ন্যাস,
ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোণার বরণ ননীর পুতলী,
ব্যথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন,
অধিক হইল নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
দেখ হে মায়ের দশা॥

আচ্ছা ঠাকুরাণী, আজ যেন তোমার নিমাই তোমার কাছে আছেন, তুমি ইহার উহার খোসামোদ করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতেছ। কিন্তু দুই এক দিন পরে তিনি কোথা থাকিবেন? তখন তোমার নিমাই পড়িয়া গেলে কে ধরিবে? কিন্তু শচীর তাহা মনে নাই। এই যে জীবে জীবে গাঢ় আকর্ষণ, ইহার ন্যায় মনুষ্যের শ্রেয়ঃ আর নাই। অতএব এই আকর্ষণ জীবের সেব্য বস্তু। যিনি ইহাকে অবহেলা করেন, তিনি ঈশ্বরদত্ত যে প্রকৃতি তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে

রাক্ষস, অর্থাৎ একটী দৈত্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। এই যে জীবে জীবে আকর্ষণ, ইহা লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে "সম্বন্ধ জীবনাবধি।" কিন্তু সম্বন্ধ যদি জীবনাবধি হইত, তবে জীবনের পরেও প্রিয়বস্তুর জন্য প্রাণ কান্দে কেন? শ্রীভগবানের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে যদি সম্বন্ধ জীবনাবধি হইত, তবে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়বস্তুর স্মৃতিও চলিয়া যাইত। প্রিয়বস্তুর সহিত এরূপ চির সম্বন্ধ যে, তাহাকে ভুলিব এরূপ মনে অনুভব করা যায় না। আপনার "আমিত্ব" বিস্মৃত না হইলে প্রিয়বস্তুকে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

তুমি কে? ইহা একবার ঠাহুরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি পূর্ব্বে একটি কর্দ্দমপিণ্ডের মত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তাহার পরে তুমি এ জগতে যে যে শিক্ষা পাইয়াছ, সেই শিক্ষার ছাঁচে একটি স্বতন্ত্র বস্তু গঠিত হইয়াছ। সেই বস্তু তুমি, তুমি ত্রিজগতের অন্যের সহিত পৃথক। তোমার শিক্ষার মধ্যে, তোমার মা কে, বাবা কে, এই শিক্ষা পাইয়াছ। কে তোমার প্রিয়জন, কে পুত্র, কে ভ্রাতা, তাহাও শিক্ষা পাইয়াছ। এই সমুদায় শিক্ষাই তোমাকে অন্যান্য জীব হইতে পৃথক করিয়াছে। তুমি আপনাকে ধ্বংস না করিলে এ সমুদায় শিক্ষার ফল ভুলিতে পারিবে না। তোমার অবশ্য এক জন প্রিয়বস্তু আছে, আর অবশ্য তুমি বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছ। কিন্তু দেখিবে যে, যদিও তোমার প্রিয়বস্তু আর এ জগতে নাই, তবু সে বস্তুটী ছবির স্বরূপ তোমার হৃদয়-মন্দিরের প্রাচীরে ঝুলিতেছে। যদি তাহাকে ভুলিতে পারিতে, তবে তাহার সহিত পুনর্মিলন না হইলেও হইতে পারিত। যখন সেই অতিশয় স্নেহশীল শ্রীভগবান্ তোমাকে তোমার প্রিয়জনকে ভুলিতে দিতেছেন না, তখন অবশ্য সে বস্তু তিনি তোমার নিমিত্ত রাখিয়াছেন। তুমি যখন চিরদিনেও এ সমুদায় সম্বন্ধ, আপনাকে

ধ্বংস না করিয়া, ভুলিতে পার না, তখন কি তুমি ভাবিতে পার যে, শ্রীভগবান্ চিরদিনের নিমিত্ত তোমাকে এই বিয়োগ-জনিত দুঃখ দিবেন? তুমি কি এরূপ নিষ্ঠুর হইতে পার? যদি তোমার শক্তি থাকিত, তবে কি শোকাকুল জননীর কোল হইতে তাহার পুত্রকে চিরদিন পৃথক রাখিতে পারিতে? তুমি এরূপ নিঠুরালী করিতে পার না, আর শ্রীভগবান্ করিবেন? তোমরা তাঁহাকে ভাব কি? তাঁহাকে এরূপ অপবাদ দিও না। তিনি যত মন্দই হউন, তোমা অপেক্ষা মন্দ নহেন। তুমি যে কার্য্য নিঠুর ভাব, তিনি তাহা করিতে পারিবেন কেন? নিমাই দুই এক দিন পরে কোথা যাইবেন ঠিকানা নাই, শচী তাহা ভুলিয়া পুত্র ধূলায় না পড়েন, ইহার নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন। মৃতপুত্র গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার মস্তকে ছত্র ধরা হইয়াছে, পাছে তাহার মুখে রৌদ্র লাগে! এই যে জীবে জীবে সম্বন্ধ, ইহাই জীবের উপাস্য দেবতা, ইহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী রাধা, আর ইহার সেবা দ্বারাই শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে, অর্থাৎ মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান্‌কে, পাওয়া যায়।

প্রভাতে ভক্তগণ সকলে সাব্যস্ত করিলেন যে, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন "ভিক্ষা" দিবেন। প্রভু এখন সন্ন্যাসী। প্রভুকে আর কেহ "ভোজন" করাইবেন, কি "নিমন্ত্রণ" করিবেন, এ কথা বলিবার যো নাই। প্রভুকে এখন "ভিক্ষা" দেওয়া যায়, আর প্রভুও "ভিক্ষা" ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু শ্রীঅদ্বৈত্যের বাড়ী সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিতেছেন না। অর্থাৎ জননীকে সন্ন্যাসের যে দুঃখ তাহা কিছু দেখিতে দিবেন না, এই তাঁহার সংকল্প। ভক্তগণ প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন এ কথা যখন প্রকাশ হইল, তখন শচী শুনিয়া বড় কাতর হইলেন। তিনি শ্রীবাস প্রভৃতিকে

ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে আমি ইহাতে বাধা দিতে পারি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা নিমাই আর যে কয়েক দিন এখানে থাকেন আমি আমার সাধ পূরিয়া তাঁহাকে খাওয়াই। তোমরা আবার তাঁহার দর্শন পাইতে পারিবে, আমার কিন্তু এই শেষ দেখা। তোমাদের অনুমতি পাইলে জনমের মত আমি নিমাইয়ের একবার সেবা করিয়া লই।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ তখনি সম্মত হইলেন। নিশিযোগে কীর্ত্তন, দিবাভাগে সুরধুনীতে স্নান, শচীর হস্তে অন্ন ভোজন, সমস্ত দিবা কৃষ্ণকথা, এইরূপে পঞ্চ দিবস অতীত হইল। প্রভু কবে কি করিবেন, কেহ কিছু জানেন না। পঞ্চ দিবস পরে প্রভাতে প্রভু প্রাতস্নান করিয়া আসিয়া বলিতেছেন, "আমি নীলাচলে চলিলাম।"

সকলে বলিয়া উঠিলেন,—"সেকি?" প্রভু নীলাচলে চলিলেন, এ কথা মুখে মুখে দাবানলের ন্যায় ব্যাপিয়া পড়িল।

যে যেখানে ছিলেন দৌড়িয়া আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। শচী এলো থেলো বেশে যত দূর পারেন দৌড়িয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নিমাইচন্দ্রের ভাব, যেন তখন সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন, আর সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া না ফেলিলে অমনি অমনিই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু শচী এবং ভক্তগণ যখন তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তখন প্রভুর সে ভাব গেল। তিনি যাইবেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমেই শ্রীহরিদাস অতি কাতরে চরণতলে পড়িলেন; বলিতেছেন, "প্রভু! আমাকে তুমি কার কাছে রাখিয়া যাও। আমিত নীলাচলে যাইতে পারিব না।" হরিদাসের ন্যায় গম্ভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের দশা দেখিয়া উপস্থিত সকলে তাঁহার প্রতি চাহিলেন। হরিদাস স্বভাবতঃ দীনের দীন, তাহার উপর তিনি দৈন্য করিতে থাকিলে দয়াময় প্রভু বড়

ক্লেশ পাইতেন। প্রভু কঠিন হইয়া বিদায় হইতে ছিলেন, কিন্তু হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার নয়নে জল আসিল; বলিতেছেন, "হরিদাস! শান্ত হও। তোমার কাতরোক্তিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তখন হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর সমর চলিতেছে, পরস্পরে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। উড়িষ্যা হিন্দুর রাজ্য, সে রাজ্যে মুসলমানের যাইবার অধিকার নাই। মুসলমান যদি সে রাজ্যে যাইত, তবে তাহাকে বধ করা হইত। সে ব্যক্তি ফকির হইলেও রাজদূত সন্দেহে বধ্য হইত। হরিদাস যদিও এখন পরম ভাগবত হইয়াছেন, তবু তিনি পূর্ব্বে মুসলমানই ছিলেন। অতএব তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার ছিল না। প্রভু বলিতেছেন, "হরিদাস! তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি তোমার জন্য শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করিব, করিয়া তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।"

ভক্তগণ দেখেন যে, প্রভু চলিলেন। প্রভু যখন চলিলেন, তখন তাঁহাকে রাখে কাহার সাধ্য? কি বলিয়াই বা রাখেন? তবু তাঁহারা একটী কথা উঠাইলেন, সে এই যে, উড়িষ্যার হিন্দু-রাজার সহিত গৌড়ের মুসলমান পাতসাহের ঘোরতর সমর চলিতেছে। অতএব উড়িষ্যায় যাইবার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভক্তগণ বলিলেন, "প্রভু! এরূপ যত দিবস থাকে, তত দিবস শ্রীক্ষেত্রে কেহ যাইতে পারিবে না। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন, পথ পরিষ্কার হইলে যাইবেন।" প্রভু উপহাস করিয়া বলিলেন, "নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি, আমাকে কে রোধ করিবে।" সে যাহা হউক, সকলে বুঝিলেন প্রভুকে আর রাখা যায় না।

তখন শ্রীঅদ্বৈত করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! আর কয়টা দিবস

থাকিয়া যাউন, আমাদের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" শ্রীঅদ্বৈতের কথা প্রভু পারতপক্ষে কখন উপেক্ষা করিতেন না। প্রভু একটু থামিয়া বলিলেন, "তাই হবে।" অমনি সকলে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। একজন ব্রাহ্মণ প্রভুকে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। প্রভু সেই গোলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভুর হস্তে দণ্ড, গাত্র কাস্থাদ্বারা আবৃত, তিনি গমনোন্মুখ হইয়া সকলের সহিত কথা কহিতেছেন। এই নূতন ব্রাহ্মণতনয় প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, যেহেতু উহা কান্থা দ্বারা আবৃত। মুখখানি দেখিতেছেন চন্দ্রের ন্যায়। মনে ভাবিতেছেন, মুখখানি এত মিষ্ট, অঙ্গখানি না জানি কেমন! মুখখানি দেখিলাম, অঙ্গটি কি দেখিতে পাব না? প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত ক্রমেই তাহার ব্যাকুলতা বাড়িতেছে, শেষে অধৈর্য্য হইয়া উন্মত্ততাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়া, সেই লোকের মাঝে, যে প্রভুকে স্পর্শ করিতে শ্রীঅদ্বৈতেরও ভয় করে, তাঁহার অঙ্গের কাঁথাখানি হঠাৎ বল করিয়া কাড়িয়া লইলেন। প্রভুর অঙ্গের কান্থা এইরূপে অপহৃত হইলে কিরূপ হইল? মুরারি বলিতেছেন, এইরূপ বোধ হইল যেন মেঘাবৃত চন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তখন প্রভুর শ্রীরূপ দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!" ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে চমকিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যখন তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, আর তাঁহার দশা দেখিলেন, তখন সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন,—প্রভু একটু লজ্জা পাইলেন।

শ্রীভগবান্ জীবকে রূপ আস্বাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন। এই রূপ আস্বাদন-শক্তির নিগূঢ় প্রকৃতি কি, তাহা তিনিই জানেন। তিনি এই নিগূঢ় জানেন বলিয়া রূপ দুইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। যথা,

স্ত্রীলোকের রূপ ও পুরুষের রূপ। পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরুষ মনোহর করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় শক্তির কথা একবার মনে করুন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া পুরুষ মোহিত হইবে। আবার তাহাকে একটী স্ত্রীলোকের সম্মুখে ধর, তাহাতে যে কোন রূপ আছে, সে তাহা বুঝিতেই পারিবে না। সেইরূপ একটি রূপবান্ পুরুষের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের নয়নে জল আসিবে, কিন্তু অন্য পুরুষে তাহার রূপের মাধুর্য্য বুঝিতে পারিবে না। তাহাকে দেখিয়া কোন পুরুষ এমনও ভাবিতে পারে যে, তাহার রূপ ত নাই, প্রত্যুত সে নিতান্ত কুৎসিৎ। তাই, শ্রীভগবান্ স্ত্রীলোকের রূপ আস্বাদন করিবার শক্তি কি প্রকৃতি ভাবিয়া পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষের প্রকৃতি মনে রাখিয়া স্ত্রীলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবার জীবের এই প্রকৃতি জানিয়া তিনি স্বয়ং মনোহর রূপ ধরিয়া থাকেন। তিনিই জানেন কি প্রকার রূপ ধরিলে জীব মোহিত হইবে। শ্রীমতী বলিতেছেন, বন্ধু—

এনা ছাঁদে কেনা বান্ধে চূড়।
চূড়ায় মজালে জাতি কুল॥ ধ্রু
কার না আছে ও দুটি নয়ন।
তোমার অরুণ করুণ আঁখি আন॥"

শ্রীমতী বলিতেছেন, "বন্ধু, চূড়া অনেকেই বাঁধে, তুমি যে ছাঁদে বাঁধিয়াছ, ওরূপ ছাঁদেও সকলেই বাঁধে, তবু তোমার চূড়া আর এক প্রকার কেন হয়? তোমার যেমন দুটি চোক, উহা ত সকলেরই আছে, কিন্তু তোমার চোখে এরূপ প্রাণ কাড়িয়া লয় কেন?" ইহার উত্তর এই, তিনি রূপের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত আছেন।

শ্রীভগবানের রসজ্ঞান আছে, তাই তাঁহার নাম রসিকশেখর। তুমি

ভাবিতে পার যে, যদি শ্রীভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ কি গৌর রূপ ধরিয়া তোমার সম্মুখে আইসেন, হয়ত তুমি কোন সুখ পাইবে না। চাহিয়া থাকিবে, আর সুখ না পাইয়া বড় মনস্তাপ পাইবে, আর আশা ভঙ্গ হইবে। সে ভয় তোমার নাই। যদি তিনি আইসেন তবে তাহার উত্তম আয়োজন করিয়াই আসিবেন। তুমি জান না, কিন্তু তিনি জানেন, কিসে তুমি মোহিত হইবে। তিনি যখন তোমাকে দর্শন দিবেন, তখন তিনি তোমার নিকট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া আসিবেন, আর তখন তুমি এই প্রার্থনা করিবে, যথা, "হে নাথ! হে সুন্দর! হে নয়নানন্দ! হে বঁধু! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। তোমার রূপ আমার এ দুটী আঁখিতে ধরিতেছে না।" বিজয় আখরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের একখানি হস্ত দেখিয়া সাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। শ্রীবাসের মুসলমান দরজীও শ্রীগৌরাঙ্গের গুহ্যরূপ চকিতের মত দেখিয়া, "দেখেছি" "দেখেছি" বলিয়া সাত দিবস পাগল ছিল।

এইরূপ রসাস্বাদনই জীবের চরম গতি। জীব সংসার পাতাইয়া, অর্থাৎ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্বদেশবাসী ইত্যাদি লইয়া যে রস শিক্ষা করে, এই রসদ্বারা সাধনাকে শ্রীভগবানের মধুর ভজন বলে।

শ্রীনিমাই শ্রীঅদ্বৈতের অনুরোধে আর কয়েক দিবস বাস করিলেন। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈত দশ দিবস মহোৎসব করিলেন।* আবার—

সন্ন্যাস করিল প্রভু কারও নাহি মনে।
আনন্দে গোঁয়ায় দিবা রাত্রি সংকীর্ত্তনে॥

শ্রীনিমাই যাইবেন, প্রভাতে এই কথা বলিলেন। এই কথা বলিলে

* শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্র-মুখ।
ভোজন করয়ে পূর্ণ হৈল নিজ সুখ॥—চরিতামৃত।

সকলে আসিয়া প্রভুর চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইলেন, শচীও আইলেন। প্রভু মাঝখানে বসিয়া, শচী অগ্রে, ভক্তগণ চারিপার্শ্বে। প্রভু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমরা আমার বান্ধব, আমাকে অহৈতুকী প্রীতি করিয়া থাক। আমি যে, সে ঋণ শোধ করিব এমন আমার কিছুই নাই। তোমরা গৃহে গমন কর। যাইয়া দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর। আমি নীলাচলে চলিলাম, দেখি যদি নীলাচলচন্দ্র আমাকে দয়া করেন।" ইহা বলিতে অর্থাৎ নীলাচলচন্দ্রের স্মরণ মাত্র, প্রভুর নয়ন জলে ভরিয়া আইল, কিন্তু সময় বুঝিয়া কষ্টে ধৈর্য্য ধরিলেন। প্রভু এই কথা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও "হরিবোল" হরিবোল" বলিয়া চলিলেন। শচী উঠিয়া পুত্রের গলা ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

প্রভু যাইবার অগ্রে কি করিলেন তাহা বাসুঘোষের সংক্ষেপ বর্ণনায় দেখুন—

শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে ভকত প্রবোধ করে,
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দুটি হাত যোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি,
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে॥
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস, পরিনু অরুণ বাস,
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়ে।
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচল বাস,
তোমা সবা অনুমতি লয়ে॥
নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে,
তাহাতে পাইবে তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌরহরি, নমো নারায়ণ করি,
অদ্বৈতে ধরিয়া দিছে কোর॥

শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূলি লয়ে,
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
এরূপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে,
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল॥

তখন শচীর দশা কি হইল? যথা, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায়।
ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায়॥

এদিকে হরিদাস অতি আর্ত্তনাদে চরণে পড়িলেন, পড়িয়া করুণস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দনে সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ও সকলে একস্বরে একেবারে কান্দিয়া উঠিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তুমি যেরূপ করিয়া আমার চরণ ধরিলে, তুমি আমাকে এই কৃপা কর যে আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের চরণ ধরিতে পারি।" নীলাচলচন্দ্রের নাম করিতে আবার প্রভুর নয়ন জলে পূরিয়া আসিল।

ভক্তগণ বুঝিলেন প্রভুকে আর রাখিতে পারিবেন না। তবু যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ, মনুষ্য আশা ছাড়িতে পারে না। আর একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন ভাবিয়া, শ্রীবাস মুখপাত্র হইয়া প্রভুকে বলিতে লাগিলেন—

"প্রভু! আমরা ছার, তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ; আমরা মলিন, তুমি পবিত্র; আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তুমি জ্ঞানময়; আমরা মায়ায় অভিভূত, তুমি তাহার অতীত; আমরা তোমার গতিরোধ কিরূপে করিব? চেষ্টা করাও আমাদের পক্ষে অপরাধ। কিন্তু প্রভু, আমরা মুগ্ধজীব, আমাদের তুমি যেরূপ প্রকৃতি দিয়াছ, তাহার অধীন হইয়া তোমাকে কিছু বলিব, প্রভু ক্ষমা করিবে। তুমি অসাধনে হঠাৎ উপস্থিত

হইয়া তোমার বিনোদলীলা দেখাইলে, আবার এখন ভুবন অন্ধকার করিয়া তোমার এই অসহনীয় লীলা দেখাইতে চলিলে। কেন? আমাদের অপরাধ? আমরা কি অপরাধে এ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হই? তুমি যাইতেছ তাহা নহে, আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এমন কি পঞ্চেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত, লইয়া যাইতেছ। আমরা থাকিব কিরূপে? প্রভু! তুমি বলিতে পার যে, আমরা যাহা অসাধনে পাইয়াছি সেই বিস্তর। আমরা ছার, কিন্তু তুমি যাঁহার উদরে জন্ম লইয়াছ, আর যাঁহাকে পদসেবার অধিকারী করিয়াছ, সেই শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অবস্থা একবার মনে কর দেখি? মা জননী তোমার সম্মুখে, তাঁহার দশা একবার চেয়ে দেখ। বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়ায় বসিয়া কান্দিতেছেন, তাঁহার ক্রন্দনে পৃথিবী বিদরিয়া গেল, পশু-পক্ষী, পাতা-লতা, পাষাণ পর্য্যন্ত ঝুরিতেছে। * প্রভু! জীবকে করুণা করিতে যাইতেছ, নিজজনকে কি অপরাধে দুঃখ দিতেছ? ন'দের ধন ন'দে চল। আমাদের ন'দের চাঁদ এখন নীলাচলে উদয় হইতে চলিলেন, ইহা কি আমাদের প্রাণে সহে? প্রভু, বিনোদলীলা করিলে, করিয়া জীবগণকে বৃন্দাবনের সম্পত্তি দেখাইল। কীর্ত্তনসমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা উঠাইলে, উঠাইয়া সমস্ত জগৎ উন্মত্ত করিলে, এখন কেন বিষ উঠাইতে যাইতেছ? ন'দে চল, সংকীর্ত্তন কর, তোমার জীবগণের আর কি সম্পত্তির প্রয়োজন? নাগরবেশ ধরিয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া, এখন কাঙ্গাল হইয়া সম্মুখে উদয় হইলে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে।

হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
কান্দনাতে যায় উহার দিবস রজনী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লতা পাতা এ পাষাণ ঝরে॥—চৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত চরণ দুখানিতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া ব্রণ হইবে। * বৃক্ষতলে শয়ন করিবে, ভিক্ষা না পাইয়া উপবাস করিবে, ইহা অপেক্ষা আমাদের কোটি বার মরণ ভাল। প্রভু! আমাদের বুকে নিজ হাতে শেল মারিও না।" শ্রীবাস এইরূপ বলিতেছেন, আর সকলে, কেহ প্রভুর পায় ধরিলেন, কেহ মৃত্তিকায় পড়িলেন, কেহ বা করযোড়ে প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া চীৎকার করিয়া, কান্দিতে লাগিলেন।

তাহার পর শ্রীবাস আবার বলিতে লাগিলেন, "প্রভু! শচীমায়ের নিকট কি বলে বিদায় হইবে? বিষ্ণুপ্রিয়া এ কথা শুনিবামাত্র মরিবেন। আমরা আর কি তোমার চন্দ্রমুখ দেখিব না? আর কি তোমার নৃত্য দেখিব না? আর কি আমাদিগকে নাচিতে নাচিতে কোলে করিবে না? আর কে আমাদিগকে মধুর দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে ভাসাইবে? হা কষ্ট! হা কষ্ট! এই জন্যই কি, আমাদের পাষাণ হৃদয় কোমল করিয়াছিলে, যে ভাল করিয়া দুঃখ দিবে?"

তিনটী বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্টক। প্রিয়া, জননী ও ভক্তগণ। একটী আপদের হাত এড়াইয়াছেন, যেহেতু বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীনবদ্বীপে। ভক্তগণ ও জননী প্রভুকে ফিরাইয়া আনিবেন, এই ভরসা অবলম্বনে, আশা-পথ চাহিয়া তিনি নদীয়ায় রহিয়াছেন। কিন্তু তবু দুইটী কণ্টক সম্মুখে, জননী ও ভক্তগণ। জননী, পুত্রকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি

* একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাইবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন মাগিবে কাহাকে?
শচীর দুলাল তুমি দুর্ল্লভ চরিত।
দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥
ভক্তগণ অমিয় নয়ন দিঠি পাতে।
এ দেহ প্রেমার তনু বাড়ে হাতে হাতে॥—চৈতন্যমঙ্গল।

দিয়াছেন। সুতরাং প্রভুর জননী, দার্ঢ্য অবলম্বন করিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কেবল নিমিষহারা হইয়া পুত্রের মুখ দেখিতেছেন। সুতরাং এ আপদটী বড় বাধা দিতেছেন না। এখন ভক্তগণকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। প্রভু জননীর দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করিলেন। হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারুণ্যরসে পূর্ণ রহিয়াছে, নয়নদ্বয় তাহার সাক্ষ্য দিতে চাহিতেছে, আর প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। প্রভু একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা শান্ত হও। মা! আমার মনের কথা শ্রবণ কর। আমি নীলাচলে বরাবর বাস করিব। আমি আসিব, তোমরা যাইবে, সুতরাং সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইবে।"

এই কথা বলিলে কোন ভক্ত বলিলেন, "প্রভু! এই কি ঠিক? তোমাকে আমাদের আর বিশ্বাস নাই। তুমি সত্য করিয়া বল যে নীলাচলে তোমার বরাবর বাস হইবে?" ইহাতে প্রভু বলিলেন, "আমি সত্য করিলাম, নীলাচলে আমি বরাবর বাস করিব।"*

এই কথা শুনিয়া সকলে একটু আশ্বস্ত হইলেন। সকলে ভাবিলেন, প্রভু যদি নীলাচলে বাস করেন, তবে সে বিংশতি দিবসের দূরের পথ বই নয়। সেখানে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেই হইবে।

শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "নিমাই! তোমার মুখ কি আমি আর দেখিতে পাইব?" প্রভুর নয়ন আর কথা শুনে না, কিন্তু নিজে শক্তি-ধর, নয়নকে বাধ্য করিলেন, উহা হইতে বারি পড়িতে দিলেন না। প্রভু বলিলেন, "মা! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি আসিয়া তোমার চরণ দর্শন করিব।"

* সত্য সত্য করি প্রভু বলে বার বার।
নীলাচলে বাস সত্য হইবে আমার॥—চৈতন্যমঙ্গল।

এখানে একটী কাহিনী বলিতে হইবে। প্রভুর পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহের নাম উপেন্দ্র। বাড়ী শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রাম। প্রভুর খুল্লতাত-তনয় প্রদ্যুম্ন মিশ্র। তিনি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদয়াবলী" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সে খানি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে লেখা আছে যে, প্রভু যখন শান্তিপুর পরিত্যাগ করেন তখন শচী তাঁহাকে একটী কথা বলিয়াছিলেন। সে গ্রন্থে দেখিতে পাই যে প্রভুর পিতামহীর নাম শোভাদেবী। নিমাই জন্মিবার পূর্ব্বে যখন শচী ও জগন্নাথ ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে গমন করেন, তখন শোভাদেবী স্বপ্নে দেখিতে পান তাহার পুত্রবধূর অর্থাৎ শচীর গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান্ প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন, "তুমি তোমার বধূকে সত্বর শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দাও, আমি শ্রীনবদ্বীপ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ভুমিষ্ট হইব না।" এই আজ্ঞা শুনিয়া প্রাতে শোভাদেবী শচীকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া বলিলেন যে, "তুমি শ্রীনবদ্বীপে গমন কর, তোমার উদরে শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন। কিন্তু মা, তুমি আমার নিকট একটী কথা অঙ্গীকার করিবে। শ্রীভগবান্ তোমার পুত্র হইবেন, তুমি অবশ্য একবার আমাকে তাঁহাকে দেখাইবে।" শচী স্বীকার করিলেন। আর এখন শান্তিপুর হইতে পুত্র চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সেই কথা মনে হওয়ায়, তাঁহাকে আপনার শ্বাশুড়ীর নিকট প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন। নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে এক দেহ শান্তিপুরে রাখিয়া অন্য দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহট্ট গমন করিয়া পিতামহীকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই কাহিনী উপরি উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এখন শান্তিপুরের কথা শ্রবণ করুন।

• জননীকে দর্শন দিবেন এই কথা বলিয়া প্রভু আবার বলিলেন, "হরিবোল"। হরিবোল শব্দটী চিরকাল বড় মধুর, সে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় আরো মধুর হইয়াছিল। আবার এই চারিটি অক্ষর শ্রীগৌরাঙ্গের

নিজ মুখে কি মধুর লাগিত, তাহা অক্ষরের দ্বারা বর্ণনা করা অসাধ্য। কিন্তু তখন শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে "হরিবোল" শব্দটী বজ্রের ন্যায় শ্রুতি-দুঃখকর বোধ হইল।

রসলোলুপ পাঠক একবার "অক্রুর-সংবাদ" গীত শ্রবণ করিবেন। গীত শ্রবণ সময় শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিবেন, শচীকে যশোদা ভাবিবেন, ভক্তগণকে গোপী ভাবিলেন, আর শ্রীমতী রাধা যে কুঞ্জের আড়ালে দাঁড়াইয়া গমন দর্শন করিতেছিলেন, তাহা শ্রীনবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভাবিবেন; তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের শান্তিপুর-ত্যাগ-লীলা কিছু অনুভব করিতে পারিবেন।

এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরিবোল।
সত্বর চলিল, উঠে ক্রন্দনের রোল ॥—চৈতন্য মঙ্গল।

আর সকলে দাঁড়াইয়া, কেবল শচী বসিয়া।

তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥—চৈতন্য চরিতামৃত।

কবি কর্ণপুর, প্রভুর বিদায়, এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

মায়ের চরণে প্রভু কৈল নমস্কার।
শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছিন্ন ধার ॥
প্রভু বলে "মাতা দুঃখ না ভাবহ মনে।
সর্ব্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে ॥
যদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবাকার।
কৃষ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার ॥"

প্রভু যদি চলিলেন, শান্তিপুর তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কেবল শচী ছাঁড়া। শচী পুত্রকে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া চলিবেন। তিনি বসিয়া দীপ্তিহীন লোচনে, পুত্রের গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥

যখন সমস্ত শান্তিপুর প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, তখন প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "হে আমার প্রাণপ্রতিম বন্ধুগণ! তোমরা গৃহে গমন কর। গৃহে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কর। তোমরা ভাবিতেছ, আমার বিহনে তোমরা দুঃখ পাইবে। তাহা, কেবল তোমরা কেন, আমার জননীও পাইবেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ডুবিলে জীবের দুঃখ থাকে না। তোমাদের সেই বহুমূল্য সম্পত্তি রহিল। তবে আমার নিমিত্ত বিরহকষ্ট,—তাহার ঔষধ আমি আবার বলিতেছি। যিনি অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবেন, তিনি আপনার ক্রোড়ে আমায় দেখিতে পাইবেন। প্রভু বলিতেছেন—

কাহারো হৃদয়ে নাহিবেক দুঃখ শোক।
সংকীর্ত্তন-সমুদ্রে ডুবিবে সর্ব্বলোক ॥
কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥—চৈতন্য মঙ্গল।

ইহা বলিয়া প্রভু সজল নয়নে, করযোড়ে ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সেই কারুণ্যপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ভক্তগণ দাঁড়াইলেন, আর অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন না।

এই সংসার দুঃখের স্থান। রোগ, শোক, নৈরাশ্য, দারিদ্র্য, প্রভৃতি ব্যাঘ্র, সর্প, ভল্লুক এই সংসার-অরণ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। জীব ভবসাগর পার হইতে পারিবে সেই নিমিত্ত করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের ঘরে ঘরে হরিনাম বিলাইলেন, কিন্তু জীব যে সংসারে দুঃখ পায় তাহার

কি কিছু তিনি করেন নাই? স্বদেশ ও নিজ পরিবার ত্যাগের সময় শ্রীপ্রভু আজ্ঞা করিয়া যান যে, "হে জীবগণ! দুঃখের একমাত্র ঔষধ ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তন; সেই কীর্ত্তন কর, সুধাসমুদ্র উঠিবে, তাহাতে অবগাহন কর, করিলে দুঃখ আর থাকিবে না।" অতএব হে পুত্রশোকিন! যদি পুত্র-বিয়োগরূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া থাক, তবে তুমি একদল কীর্ত্তনীয়া আনিয়া শ্রীভগবানের জয় দিয়া এইরূপ একটী গান শ্রবণ করিবে ঃ—

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি ত আমার বঁধু সকলি তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিব কি দায় আমার॥
সকলি তোমারি দেওয়া আমার কিবা আছে।
বাছিয়া লও হে বন্ধু যাহা তোমার ইচ্ছে॥
নরোত্তম দাসে কহে শুন গুণমণি।
তোমার অনেক আছে, আমার কেবল তুমি॥

কোন অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সূক্ষ্মদর্শী পাঠক এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ-ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তনে, সংসারে রোগশোকাদিরূপ দুঃখ কিরূপে নাশ হইবে? জড় পদার্থের সহিত অজড় পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে?" এ প্রভুর কথা, অতএব তাঁহারই ইহার উত্তর দেওয়া উচিত, আমি কিরূপে দিব? তবে যাহা চক্ষে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি। শ্রীভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তনে চিত্ত-দর্পণ নির্ম্মল হয়, ও অনেক দুঃখ যে কেবল ভ্রম মাত্র, তাহা তাহাতে দেখা যায়। আর অনেক আনন্দ, যাহা এখন লুক্কায়িত আছে, তাহা নয়নগোচর হয়; দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে শিয়রে জাগরিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন, কীর্ত্তনে এ জ্ঞানটি প্রস্ফুটিত হয়। এ জ্ঞান যে পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে দুঃখের শক্তি

হ্রাস হয়। তুমি যদি পুত্রশোক পাইয়া, ভক্তি করিয়া, উল্লিখিত নরোত্তমের পদটী গাইতে পার, তবে শ্রীভগবান্ অতিশয় লজ্জা পাইবেন, পাইয়া আপনি শ্রীহস্তে তোমার নয়নজল মুছাইবেন, আর আপনি তোমার পুত্র হইতে স্বীকার করিবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাতর হইয়া ভক্তগণকে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে নিষেধ করিতে ল. ‍িলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে পারিলেন না, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রভু আবার "হরিবোল" বলিয়া দ্রুত গমনে চলিলেন।

এবার তাঁহার সঙ্গিগণ ছাড়া ভক্তেরা আর কেহ গেলেন না। তবে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কিরূপ চলিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু দ্রুত গমনে চলিতেছেন। আচার্য্য পশ্চাতে তাঁহার সহিত কষ্টে শ্রষ্টে যাইতেছেন। যাইতেছেন কাঁকালি অবলম্বন করিয়া; বদন বিরস, তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পড়িতেছে, নয়নে জল মাত্র নাই।* প্রভু দেখিলেন যে শ্রীআচার্য্য ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার পশ্চাতে আসিতে নিরস্ত হইয়াছেন। প্রথমে প্রভু আচার্য্যকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন তিনি পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, আর অতি কষ্টে আসিতেছেন, তখন প্রভু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমি কেবল আপনার ভরসায় সন্ন্যাসরূপ দুরূহ কার্য্যে সাহসী হইয়াছি। আমি গৃহত্যাগ করিলে সকলে ব্যাকুলিত হইবেন, আর আপনি তাঁহাদিকে সান্ত্বনা করিবেন। আপনি যদি অধীর হয়েন, তবে আর আমার যাওয়া হয় না। আমরা সকলে আপনার আশ্রিত। মাতৃ-আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতে চলিলাম। আপনি আমার

* উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকালি অবলম্বে।
বয়ান বিরস ঘর্ম্ম বিন্দু বহে তাহে॥—চৈতন্য মঙ্গল॥

মাতাকে প্রতিপালন ও সান্ত্বনা করিবেন, ভক্তগণকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন। কিন্তু আপনি যদি এরূপ অধীর হন, তবে ত কেহ প্রাণে বাঁচিবে না।

শ্রীঅদ্বৈত সমুদায় কথা শুনিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কথা ক্ষান্ত দিতে না দিতেই তিনি বলিলেন, "প্রভু! আগে আমার কথা শ্রবণ কর, পরে তিরস্কার করিও। তুমি আমাদের সকলের প্রাণ। তুমি এই নবীন বয়সে সমুদায় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছ, ইহাতে স্থাবর জঙ্গমও রোদন করিতেছে, তোমার ভক্তগণের ত কথাই নাই। ঐ দেখ, সকলে ঘোর বিয়োগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। তোমার বিরহরূপ দুঃখ কেবল এক জনের হৃদয় স্পর্শ করে নাই। সে এই পাষণ্ড—আমি। তুমি যাইতেছ, ইহাতে যে আমার অন্তর পুড়িতেছে না, তাহা বলিতে পারি না; হৃদয় দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু দেখ আমার নয়নে এক ফোঁটাও জল নাই। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে ত্রিজগতে আমা অপেক্ষা কঠিন হৃদয় আর নাই। কেবল এই কথাটী বলিতে তোমার পশ্চাতে আসিতেছি।"*

প্রভু এই কথা শুনিয়া একটু হাস্য করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আচার্য্য! তোমার কোন দোষ নাই, সমুদায় অপরাধ আমারই। আমি দেখিলাম যে, আমার যাইবার কালে সকলে অধীর হইবেন,

---

* ১। তোর নিজ জন তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হয়ে চরণারবিন্দে॥
আমার পাপিষ্ঠ প্রাণ নাহি দ্রবে কেনে।
এ কাষ্ঠ কঠিন অশ্রু নাহিক নয়নে॥

২। আমার অধিক আর দুরাচার নাই।
তোমার বিচ্ছেদে মোর হিয়ায় প্রেম নাই॥
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে।—চৈতন্য মঙ্গল।

অতএব তাঁহাদের সান্ত্বনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একজন অসীম তেজস্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। সে তুমি ছাড়া আর কে? আমার গৃহত্যাগে অন্যে অধীর হইবেন সত্য, কিন্তু তোমা অপেক্ষা অধিক অধীর আর কেহ হইবেন না। এই নিমিত্ত আমি আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত, তোমার আমাতে যে প্রেম, তাহা এই বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম; ভাবিয়াছিলাম সকলে শান্ত হইলে উহা খুলিয়া দিব। সেই নিমিত্ত তোমার নয়ন-জল আসিতে পারে নাই। তুমি দুরাচারও নও, আমার প্রতি কঠিনও নও। তোমার অপেক্ষা ত্রিজগতে আমাকে আর কে অধিক ভালবাসে? তবে তোমার বড় দুঃখ হইয়াছে, কান্দিতে পারিতেছ না; ভাল তাই হউক। যত পার ক্রন্দন কর, কিন্তু সকলকে সমাধান করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু বহির্ব্বাসের একটী গ্রন্থি দেখাইলেন। দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাতে তোমার প্রেম আবদ্ধ আছে, এখনই আমি খুলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু সেই গ্রন্থিটী খুলিয়া দিলেন।

যে মাত্র প্রভু নিজ বহির্ব্বাসের গ্রন্থি খুলিলেন, অমনি শ্রীঅদ্বৈত "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া চীৎকার করিয়া ধূলায় পড়িলেন, পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। নয়ন দিয়া অমনি পাঁচ সাত ধারা পড়িয়া পৃথিবী ভিজিয়া যাইতে লাগিল।* শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে অমনি অতি আদরে কোলে করিলেন, করিয়া বলিলেন, "এখন তোমার মনস্কামনা সিদ্ধি হইল ত? এখন অশ্রু সম্বরণ কর। তুমি যদি প্রেমায় বিহ্বল হও, তবে চলিতে পারিব না। ধৈর্য্য ধর, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদিগকে গিয়া সান্ত্বনা কর। তুমি ত জান, এ সব কার্য্য কি জন্য হইতেছে।"

---

* ইহা বলি এলাইল বসনের গ্রন্থি।
প্রেমায় বিহ্বল সে আচার্য্য মনে চিন্তি॥—চৈতন্য মঙ্গল।

এখন বসনের গ্রন্থিতে প্রেম বন্ধন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। এই লীলাটী শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আমার ইহা উল্লেখ করিবার বিশেষ কারণ আছে। এখনকার লোকে এ সমুদায় কথা বিশ্বাস করেন না। তাহার পরে, প্রেম আবার বন্ধন কি শোষণ করে কিরূপে? কিন্তু আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিতেছি "প্রেমদান" করা হইতেছে, "প্রেম শোষণ" করা হইতেছে, "প্রেম কলসে কলসে বিলান" হইতেছে। এ সমস্তই কি রূপক বর্ণনা, না ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে? প্রথমতঃ দূরে দাঁড়াইয়া একজন যে অন্য জনকে শক্তি-সঞ্চার করিতে পারেন, তাহা সকলেই জানেন। এক জন বক্তা বক্তৃতা দ্বারা সহস্র লোককে মুগ্ধ করিলেন; কিন্তু সে কথাগুলি মুদ্রিত হইলে তাহাতে আর সে শক্তি দেখা যায় না। কারণ বক্তৃতাকালে বক্তা তাহার এক একটী বাক্য অলক্ষিত শক্তি দ্বারা জীবন্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলায় আছে, "হানিল নয়ন-বাণ, গেল অবলার প্রাণ।" দূর হইতে নয়ন-বাণ হানিল, তাহাতে অবলা প্রাণে মরে কেন? কারণ অলক্ষিত ভাবে নয়ন হইতে একটী শক্তি আসিয়া অবলাকে বিদ্ধ করিয়া থাকে। প্রেম দান করিবার শক্তি যে মনুষ্যের আছে, তাহার সাক্ষী এখনও আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। অর্থাৎ কোন সাধুর নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে দ্রব করিবেন। তোমার দ্রব হইবার ইচ্ছা নাই, তুমি দ্রবিবে না চেষ্টা করিতেছ, তুমি যে সাধুর সঙ্গ করিতেছ, হয়ত তুমি তাহা জান না, হয়ত সে সাধুতে তোমার ভক্তি নাই, কিন্তু তুমি তাঁহার কথায়, স্বরের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিতে দ্রবীভূত হইতেছ। মনুষ্য এই রূপে যে বিষয়ের সাধনা করে, সেই বিষয়ে শক্তি পাইয়া থাকে। যিনি অতি বীর,—যেমন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট,—তিনি কেবল তাঁহার কথা দ্বারা, কি দৃষ্টি দ্বারা, সহস্র

লোককে মৃত্যুমুখে পাঠাইতে পারেন। যাঁহার সাধনা প্রেমভক্তি, তিনিও ঐরূপে সেই শক্তি চালনা করিতে পারেন। এখনও লোকে একটু একটু পারেন। কিন্তু তখন তাঁহারা "ব্রজের ভাণ্ডার" ভাঙ্গিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহারা যে তখন কলসে কলসে প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচিত্র কি?

কৃপালু পাঠক মহাশয়! তুমি যদি নাস্তিক ও সন্দিগ্ধচিত্ত হও, তবে এই শক্তিটীর কথা একবার বিচার করিয়া দেখ, সম্ভবতঃ বড় উপকার পাইবে। এরূপ যে একটী শক্তি অলক্ষিতরূপে জীবকে বিচলিত করিয়া থাকে, তাহা পদে পদে দেখিতে পাইবে। ইউরোপে এ শক্তি এখন স্বীকৃত হইয়াছে। এই শক্তি দ্বারা ইহা বুঝিবে যে, এমন কোন মহা শক্তিধর বস্তু আছে, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত। এই শক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিবে যে, মনুষ্যের জড় দেহ ব্যতীত আরও সূক্ষ্ম কিছু আছে। তাহা হইলে পরকালে বিশ্বাস হইবে।

পরকালে যদি বিশ্বাস হইল, তাহা হইলে স্বভাবতঃ শ্রীভগবানে বিশ্বাস হইবে। শুধু তাহা নয়, ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীভগবান বড় উপকারী বন্ধু। শুধু জন্মিবার আগে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দেন তাহা নয়, মরিয়া গেলেও কোথা থাকিব, তাহার নিমিত্ত আমাদের একটী বৃন্দাবন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভগবান বড় উপকারী বন্ধু, ইহা বুঝিলে প্রেমভক্তি আপনি আসিবে। যদি প্রেমভক্তি হইল, তবেই শ্রীগৌরাঙ্গের ফাঁদে পড়িয়া যাইবে। ফাঁদে পড়িবে বলিয়া দুঃখ করিও না। আমি কায়মনবাক্যে ইচ্ছা করি যে, তুমি এইরূপ ফাঁদে পড়।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া দ্রুতগতিতে চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ। ইহাঁরা সকলেই উদাসীন। প্রভু দ্রুতগতিতে চলিলেন,

সঙ্গে পঞ্চ ভক্ত চলিলেন, সকলেরই পরিধান বহির্ব্বাস ও কৌপীন, হাতে করোয়া। জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহিতেছেন, আর দামোদর তাঁহার করোয়া লইয়াছেন। নবদ্বীপের ভক্তগণ দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। অগ্রবর্ত্তী হইতে প্রভুর আজ্ঞা নাই, কাজেই এগুতে পারিতেছেন না, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইতেছেন! দেখিতে দেখিতে প্রভু নয়নের বাহিরে গমন করিলেন। তখন, "তবে নিমাই গেল" বলিয়া শচীদেবী মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গেলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কে যায় রে নবীন সন্ন্যাসী। ধ্রু।
কোন বিধি নিরমিল দিয়া সুধা রাশি॥
হেন রূপ হেন বেশ ভাল নাহি বাসি।
অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশশী॥
সঙ্গের ভক্তগণ সমান বয়সী।
হরি হরি বলি কান্দে পরম উদাসী॥
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে পড়ে ক্ষেণে মুখে হাসি।
করঙ্গ কৌপীন দণ্ড ভাবে পড়ে খসী॥
নন্দরাম দাসে কয় মনে অভিলাষী।
কান্দায়ে কান্দালো গোরা ত্রিভুবনবাসী॥

নানা কথা উত্থাপন করিয়া এতদিন প্রভুকে শান্তিপুরে রাখিয়াছিলাম, আর রাখিতে পারিলাম না। প্রভু নদে ও শান্তিপুর শূন্য করিয়া চলিলেন। ভক্তগণ জগজ্জননী শচীকে ধরিয়া দোলায় উঠাইলেন, উঠাইয়া নবদ্বীপে চলিলেন। শচী কোথা যাইতেছেন বড় জ্ঞান নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, মা তাঁহার প্রভুকে ধরিয়া আনিবেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দূরে ক্রন্দনের রোল শুনিলেন। তখন বুঝিলেন যে নদেবাসী প্রভুকে হারাইয়া কান্দিতে কান্দিতে আসিতেছেন। ইঁহাদের অবস্থা, যদি পারি পরে বলিব।

প্রভু যখন ন'দেবাসীর নয়নের বাহির হইলেন, তখন দাঁড়াইলেন। প্রভুর তখন সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ! আপনারা সঙ্গে পথের সম্বল কি

আনিয়াছেন বলুন। আর কেইবা আপনাদিগকে কি দিলেন? ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "সম্বল কপর্দ্দক মাত্র নাই, সম্বলের মধ্যে দণ্ড ও করোয়া, আর কৌপীন, বহির্ব্বাস ও ছেঁড়া কাঁথা।" নিতাই আরো বলিলেন, "তোমার আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল আনিতে সাহস হইবে কেন?"

প্রভু ইহাতে অতি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "সাধু! সাধু! শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ পালন করিয়া থাকেন, আমাদেরও দুটী অন্ন দিবেন। আমরা কেন আহারের নিমিত্ত ভাবিতে যাইব? প্রভু গার্হস্থ্য কথা বলিতে আর অবকাশ পাইলেন না, এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীনীলাচলচন্দ্রে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট হইল। ক্রমে বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ লোপ পাইতে লাগিল, পথাপথ জ্ঞান যাইতে লাগিল। কখন দ্রুত-গমন, কখন ধীর-গমন, কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন উর্দ্ধমুখে দৃষ্টি, কখন ঘোর মূর্চ্ছা। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "নীলাচলচন্দ্র! আমাকে দেখা দাও।" কখন "হা নীলাচলচন্দ্র" বলিয়া ভূমিতে অচেতন হইয়া পড়িতেছেন। কখন বা ভক্তগণের সহিত দুই একটী কথা বলিতেছেন, সে কথা—"জগন্নাথ আর কত দূরে?"

প্রভু এই রঙ্গ করিতে করিতে চলিয়াছেন। চারিপার্শ্বে ভিন্ন লোক, কেহ তাঁহাকে চিনে না। কেহ বা নদীয়া অবতারের কথা শুনিয়াছে, কেহবা তাহা শুনেও নাই। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী ত্রিভুবন আলো করিয়া চলিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে চিনে না বলিয়া যে তিনি গুপ্ত হইয়া চলিতেছেন, তাহা নয়। প্রভুর সেই সুন্দর মুর্ত্তি, কচি বয়স, অরুণ আয়ত লোচন, সেই অবিশ্রান্ত প্রেমধারা, শ্রীমুখে হরেকৃষ্ণ ধ্বনি, সেই প্রেমে টলটল মরাল গতি, যে দেখিতেছে সেই ভাবিতেছে যে—এ বস্তুটী এ জগতের নয়, গোলোক হইতে জীবের ভাগ্যে জগতে উদয় হইয়াছেন। আবার তাহারা যখন দেখিতেছে যে, নবীন পুরুষের

সোণার অঙ্গ ধূলায় ধুসরিত, পরিধান কৌপীন ও অঙ্গে ছেঁড়া কাঁথা, তখন তাহারা করুণ রসে উন্মাদ হইয়া "প্রাণ গেল রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছে। উপরে পদকর্ত্তা শ্রীনন্দরাম দাসের সে বর্ণনাটি দিয়াছি, পাঠক মহাশয় উহা পাঠ করিয়া প্রভুর সেই সময়ের অপরূপ শোভার কতক আভাস পাইতে পারিবেন।

সঙ্গে ভৃত্য গোবিন্দ ব্যতীত সকলেই সমান বয়সী। সকলের বড় নিতাই, তিনি উর্দ্ধসংখ্যা ৩০।৩২ বৎসর বয়স্ক। সকলেই উদাসীন, ঘোর বৈরাগী। সকলেই তেজস্কর ও প্রেমভক্তিতে অলঙ্কৃত, সকলেই নবীন বয়সী ও মনোহর। প্রভু এই সমুদয় "সাঙ্গোপাঙ্গ" লইয়া জীব উদ্ধার করিতে চলিলেন।

"ঢলিয়া ঢলিয়া চলে হরি বলে গোরারায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে, মাঝখানে গৌরাঙ্গরায়॥"

শান্তিপুরে প্রভু ভক্তগণ ও জননীকে দুঃখ দিবেন না বলিয়া সন্ন্যাসের নিয়ম ছাড়িয়াছিলেন, এখন পথে আসিয়া একেবারে সমুদায় ধরিলেন। এমন কি, ঘোর কঠোর আরম্ভ করিলেন। এরূপ কঠোরতা জগতে কেহ কখন করিতে পারেন নাই। প্রভুর মৃত্তিকায় শয়ন, উপাধান বাম হস্ত, বৃক্ষতলে বাস, আহার নাম মাত্র, তাহাও বিনা উপকরণে। উপকরণের প্রয়োজনই বা কি? প্রভু নাসিকা দ্বারা ভোজন আরম্ভ করিলেন। নাসিকা দ্বারা ভোজনে আর কয়টী অন্ন উদরে যায়? এরূপ ভোজন করার তাৎপর্য্য এই যে, জিহ্বায় অন্ন স্পর্শ করিলে কোন একটী ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব হইবে। তিনি সন্ন্যাসী, তাহাও করিবেন না। ভক্তগণ মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন? তাঁহারা সেখানে আছেন না আছেন প্রভু সে জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি শুনিবেন? প্রভু কেবল একভাবে

বিভোর। তিনি মুহুর্মুহুঃ কেবল ইহাই বলিতেছেন, "হে নীলাচলচন্দ্র! দর্শন দাও। শ্রীজগন্নাথ! চরণে স্থান দাও।" দাস্য ভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু সমুদায় ভুলিয়াছেন,—নদে, নদেবাসী, মা, প্রিয়া, ও সঙ্গীগণ।

এইরূপে এই নবীন বৈরাগিগণ মধ্যস্থানে তাঁহাদের প্রাণেশ্বরকে লইয়া আঠিসারা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত, প্রভুকে দর্শনমাত্র, আত্ম সমর্পণ করিলেন, আর প্রেমভক্তি পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সারা নিশি সেখানে বসিয়া সকলে কীর্ত্তনান্দ ভোগ করিলেন। সঙ্গে মুকুন্দ আছেন, তিনি কৃষ্ণের গায়ন, অতএব কীর্ত্তনের অপ্রতুলতা নাই। এইরূপে গঙ্গার তীরে তীরে সকলে ছত্রভোগে উপস্থিত হইলেন।

এই ছত্রভোগ শ্রীগঙ্গার দক্ষিণ সীমা। শ্রীগঙ্গা এই পর্য্যন্ত আসিয়া শতমুখী হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই ছত্রভোগতীর্থ এখন ডায়মণ্ড-হারবার সব-ডিবিসনে,—মথুরাপুর থানা, খাড়ি গ্রামে অবস্থিত। এই স্থান জয়নগর মজিলপুর হইতে আন্দাজ তিন ক্রোশ ব্যবধান, তখন গঙ্গা ঐ পথে ছিলেন।

এই ছত্রভোগ শ্রীগঙ্গার তখনকার শেষ সীমা বলিয়া, একটী লক্ষ্মীসম্পন্ন নগর ছিল। ইহা এক পীঠস্থান বলিয়া তান্ত্রিকগণের মান্য স্থান। এখানে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি ছিলেন, এখন তিনি জয়নগরে দুই হস্ত হইয়া আছেন। এখানে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে, জলমগ্ন শিব আছেন। সুতরাং এই ছত্রভোগ বৈষ্ণব ও শাক্তগণের তীর্থস্থান। প্রভু গঙ্গার কূলে কূলে আসিতেছেন। সুতরাং অনেক পবিত্রস্থান দর্শন করিয়াছেন। প্রভুর কৌপীন পঁরিয়া প্রথম এই একটী প্রকৃতপক্ষে তীর্থ দর্শন হইল। প্রথম এই তীর্থ দেখিয়া প্রভু আহ্লাদে বিহ্বল হইলেন। তখন হুহুঙ্কার করিয়া সেই

অম্বুলিঙ্গ ঘাটে ঝম্প দিলেন, তাঁহার সহিত ভক্তগণও ঝম্প দিলেন। প্রভু মহানন্দে সেই ঘাটে নানাবিধ জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। জল-ক্রীড়া করিয়া তীরে উঠিলেন, গোবিন্দ প্রভুকে শুষ্ক বহির্ব্বাস পরিতে দিলেন, প্রভু পরিধান করিলেন। কিন্তু তাঁহার নয়ন দিয়া শতমুখে আনন্দধারা পড়িতেছে, কাজেই কৌপীন বহির্ব্বাস একেবারে ভিজিয়া গেল। গোবিন্দ ইহাতে অন্য কৌপীন বহির্ব্বাস দিলেন। তাহারও সেই দশা হইল। বৃন্দাবন দাস বলেন যে প্রভু শ্রীগঙ্গাদেবীর সহিত পাল্লা পাল্লি দিতেছিলেন। অর্থাৎ গঙ্গা সেখানে শতমুখী হইয়া গিয়াছেন, প্রভুর নয়ন দিয়াও শতমুখী হইয়া ধারা চলিল। যথা—

পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥

সহস্র লোকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও এই অদ্ভুত প্রেমধারা ও নানাবিধ ভাব দর্শন করিতেছে ও গগন কম্পিত করিয়া মহা হরিধ্বনি করিতেছে। এই কলরব শুনিয়া সেখানে রামচন্দ্র খান আইলেন। ছত্রভোগ গৌড়-রাজ্যের শেষ সীমা। এই গৌড়রাজ্য মুসলমান রাজা হোসেন সাহার অধীনে। গৌড়ের এই দক্ষিণ-ভাগের অধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান। ছত্রভোগের ওপার উড়িষ্যা-রাজার অধীনে, তাঁহার নাম প্রতাপরুদ্র। তিনি ক্ষত্রিয়, মহাযোদ্ধা; মুসলমানগণ তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিত না। তখন দুই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে। সুতরাং ছত্রভোগ পার হইয়া কোন গৌড়িয়ার উড়িষ্যা যাইবার অধিকার ছিল না। রামচন্দ্র খান হোসেন সাহার অধীন অধিকারী, হোসেন সাহার নামে গৌড়ের দক্ষিণদেশ শাসন করেন।

রামচন্দ্র খান কলরব শুনিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিতে আইলেন। মনে অত্যন্ত অভিমান, তিনি রাজা। সেই অভিমানে দোলায় চড়িয়া আসিতে-

ছেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। অমনি তখন ভয়ে দোলা হইতে নামিলেন। নামিয়া একেবারে যাইয়া প্রভুর পদতলে পড়িলেন।. তিনি রাজা রামচন্দ্র খান, প্রভুর পদতলে পড়িলেন। অবশ্য ইহাতে প্রভুর তাঁহাকে খুব আদর করা উচিত ছিল। কিন্তু—

প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ-জলে।
হাহা জগন্নাথ প্রভু বলে ঘন ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥—ভাগবত।

প্রভুর তেজ দেখিয়া রামচন্দ্র খানের প্রথম ভয় হয়, আর ভয়ে হৃদয়ের দম্ভ অন্তর্হিত হয়। এখন প্রভুর চরণস্পর্শে কারুণ্যরসের উদয় হইল। প্রভুর নয়নে জল আর আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ॥
কোন মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।
কান্দে আর এই মত চিন্তে মনে মন॥

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছেন যে, নবীন গোঁসাইর এ আর্ত্তি আমি কিরূপে নিবারণ করিব? রামচন্দ্র খান ইহা ভাবিতেছেন; আবার ভক্তগণ ভাবিতেছেন যে রামচন্দ্র খানের এখানে এখন আগমন, ইহাও প্রভুর লীলাখেলা। তখন নিত্যানন্দ, শ্রীপ্রভুকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু! একবার কৃপা করিয়া আমাদের নিবেদন শুনুন। আপনার পদতলস্থ এই ভদ্রলোকটির প্রতি একবার শুভ দৃষ্টি করুন।" প্রভু এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্য পাইলেন। তখন রাজাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "বাপু! কে তুমি?" রামচন্দ্র বলিলেন, "আমি ছার, আপনার দাসের দাস হইব এই বাসনা করি।" তখন উপস্থিত যাঁহারা

ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "প্রভু! ইনি এদেশের অধিকারী।" প্রভু বলিলেন, "তুমি অধিকারী? বড় ভাল। আমি কাল সকালে "নীলাচল-চন্দ্র দর্শন করিতে যাইব। তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে? "নীলাচলচন্দ্র" বলিতে প্রভু আনন্দে মৃত্তিকায় ঢলিয়া পড়িলেন।

রামচন্দ্র খান ভাবিতেছিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুর আর্ত্তি নিবারণ করিবেন। এখন তাহার সুযোগ পাইলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছিলেন যে, রামচন্দ্র খানের সেই সময় ছত্রভোগে আগমন প্রভুর একটা লীলাখেলা। আর রামচন্দ্র যে ভাবিতেছিলেন তিনি কিরূপে প্রভুর আর্ত্তি নিবারণ করিবেন, সেও সেইরূপ লীলাখেলা। এ সমুদয় প্রভুর লীলাখেলা কেন, তাহা পাঠক এখন শ্রবণ করুন। প্রভু সুস্থির হইলে রামচন্দ্র বলিতেছেন, "প্রভু! দুই রাজায় বিষম বিবাদ চলিয়াছে, উভয় উভয়ের সীমানায় ত্রিশূল পুতিয়াছেন। এই সীমা যদি কেহ অতিক্রম করে, তাহাকে গোয়েন্দা বলিয়া প্রাণে মারিতেছে।* আমি এ দেশের অধিকারী, আমার এখন এ পথে কাহাকে যাইতে দিতে অনুমতি নাই। দিলে অগ্রে আমার প্রাণ যাইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিব, প্রভুর ইচ্ছা শিরোধার্য্য। আমি মরি, কি আমার জাতি যায়, কি আমার সর্ব্বনাশ হয়, কি আমার যে কোন বিপদ ঘটে ঘটুক, আমি প্রভুকে কল্য উড়িষ্যা রাজ্যে পাঠাইব।"

এখন মনে ভাবুন, রামচন্দ্রের আগমনকে ভক্তগণ কেন প্রভুর লীলা-খেলা ভাবিতেছিলেন। রামচন্দ্র খানের সেই সময় সেইস্থানে আগমন না হইলে প্রভুর লৌকিক লীলায় উড়িষ্যায় যাওয়া হইত না; নৌকা পাইতেন না, এবং আর কোন উপায়ে ও ছত্রভোগ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। আবার শুধু যে রামচন্দ্র খানের

* রাজার ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে। —ভাগবত।

সে স্থানে সে সময় আগমন হইল, তাহা নহে। রামচন্দ্রের মনের ভাব এই যে, "আমি প্রভুর এই আর্ত্তি কিসে নিবারণ করিব", ইহাও প্রভুর উড়িষ্যা গমনের সহায় হইল।

প্রভু এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র খানের প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কারও দিলেন। সেটী কি, তাহা চৈতন্য-ভাগবত বলিতেছেন—

হাঁসি তারে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত।

যদি বল, প্রভু একবার প্রসন্ন মুখে চাহিলেন, তাহাতে থাঁর কি হইল? রামচন্দ্র খান প্রভুর নিমিত্ত জাতি ও প্রাণ দিতে এবং সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। প্রভু কেবল একটু চাহিলেন বৈ ত নয়? এ প্রভুর কিরূপ উপকার শোধ? কিন্তু, (চৈতন্য ভাগবতে)—

দৃষ্টিপাতে তার সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥

রামচন্দ্র খান প্রভুর নিমিত্ত সর্ব্বনাশ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র, কিছু বিপদ ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি বিপদ স্বীকার করিলেন মাত্র, আর প্রভু তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে শ্রীভগবানের চরণ-পদ্ম-মধু পান করিবার অধিকার দিলেন। তবে প্রভু রামচন্দ্রের নিকট ঋণী রহিলেন, এ কথা কিরূপে বলিব?

রামচন্দ্র ঘোর তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন, এখন পরম গৌরভক্ত হইলেন। প্রভুকে তখন রাজা রামচন্দ্র গোষ্ঠী অর্থাৎ পঞ্চসঙ্গী সমেত ভিক্ষায় নিমন্ত্রণ করিলেন। একজন ব্রাহ্মণের বাড়ী তাঁহাদিগকে বাসা দিলেন, এবং তথায় বহুতর লোক উপস্থিত হইল। কীর্ত্তনমঙ্গল আরম্ভ হইল, তখন প্রভু নৃত্য করিতে উঠিলেন, আর সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিয়া বহুতর লোকের ভববন্ধন ছিন্ন হইল। এইরূপে সারানিশি কীর্ত্তনানন্দ

চলিতেছে, এমন সময় প্রহর খানেক রাত্রি থাকিতে, রামচন্দ্র খান স্বয়ং আগমন করিলেন। তিনি আর কীর্ত্তনে বড় আনন্দভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ প্রভুকে প্রভাতে উড়িষ্যা-রাজ্যে পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হইয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা পালন নিমিত্ত তিনি বড় ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। যেহেতু নাবিকগণের সহজে প্রাণে মরিতে উড়িষ্যায় যাইতে সম্মত হইবার কথা নহে। যাহা হউক, রামচন্দ্র প্রভুর ইচ্ছায় নৌকা পাইলেন। তখন প্রভুর নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে রাজা নিবেদন করিলেন, "প্রভু! নৌকা প্রস্তুত, উঠিতে আজ্ঞা হউক।" প্রভু পঞ্চসঙ্গী সহিত নৌকায় উঠিলেন। আর সকলে গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিলেন।

নৌকায় উঠিয়া প্রভুর বড় আনন্দ হইল। যেন জগন্নাথে আসিয়াছেন! নৌকায় উঠিয়াই নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাবিকগণের ইচ্ছা চুপে চুপে যায়, যাইয়া প্রভুকে উড়িষ্যা রাজ্যে নামাইয়া দেশে পলায়ন করে। কিন্তু প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। আবার মুকুন্দ থাকিতে পারিলেন না, তিনিও "হরি হরয়ে নমঃ" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। নাবিকগণ দেখিল বড় বিপদ, পাগল ঠাকুরের হাতে প্রাণ যায়। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "গোসাঞি! করেন কি? নৌকা যে ডুবিয়া গেল। ডুবিয়া গেলে কোথা যাইবেন? এদেশে জলে কুমীর ডেঙ্গায় বাঘ, তাহার পরে জল-ডাকাইতগণ এখানে সর্ব্বদা ফিরিতেছে, শব্দ শুনিলে এখনি আসিয়া ধরিবে। নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া আপনারা নিদ্রা যাউন।" কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের আহারও নাই, নিদ্রাও নাই।

•প্রভু শান্তিপুর হইতে গৌড়দেশের তখনকার সীমা পর্য্যন্ত কিরূপ মনের ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

বিশেষ চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নাকে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল কিবা পারাপার॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে।

ভক্তগণ যদিও প্রভুকে স্বয়ং তিনি বলিয়া জানেন, কিন্তু জীবধর্ম্ম বশতঃ সে কথা তাঁহারা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারেন না। জীবধর্ম্ম বশতঃ তাঁহাদের সে কথা সর্ব্বদা ভুলিতে হইত। কাজেই নাবিকগণের এই কথায় তাঁহারা কেহ কেহ ভয় পাইলেন। মুকুন্দ চুপ করিলেন, আর প্রভু যাহাতে স্থির হইয়া বসেন, তাহার যোগাড় করিতে লাগিলেন। প্রভু শুনিলেন যে, সকলের ইচ্ছা তিনি নৃত্য হইতে ক্ষান্ত দেন। তখন বলিতেছেন, "তোমরা ভয় পাইয়াছ? ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের চক্র মস্তকে ঘুরিতেছে, ঘুরিয়া ভক্তগণকে রক্ষা করিতেছে।" এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের আবার মনে হইল যে প্রভু বস্তু কি! তখন তাঁহারাও প্রভুকে না থামাইয়া, আপনারা কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। এইরূপে নৌকা টলিতে টলিতে কীর্ত্তনের সহিত উৎকলদেশে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইল। প্রভু প্রয়াগ ঘাটে উঠিলেন, উঠিয়া জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়া উৎকল-দেশকে প্রণাম করিলেন।

প্রভু উৎকলদেশে প্রবেশ করিয়াই ভাব সম্বরণ করিলেন। তখন গৌড়দেশরূপ কণ্টক উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ও নিজজন সকলকেই পাছে ফেলিয়া আসিয়াছেন। মাঝে অপার গঙ্গা ও বন। প্রভু এখন বড়ই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, এখন নির্ব্বিরোধে মনের সাধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন। পূর্ব্বে শচী প্রভৃতির উৎপাতে তাহা পারিতেন না। সঙ্গে যে পঞ্চজন তাঁহাকে দিবানিশি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এখন

তাঁহাদের হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইতে পারিলে বাঁচেন, প্রভুর মনের এই ভাব।

সেই প্রয়াগ ঘাটে যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ আছেন। তাহার নীচে যে গঙ্গা-ঘাট আছে সেখানে প্রভু গণসহ স্নান করিলেন। প্রভু তখন সচেতন, সুতরাং সহজ কথা কহিতেছেন। বলিলেন, "আমি যাই, অন্ন ভিক্ষা মাঙ্গিয়া আনি।" এখন ভিক্ষা মাঙ্গা গোবিন্দ কি জগদানন্দের কাজ। কি আর যাহারই হউক, প্রভুর কাজ কখনই নহে। প্রভুর হাতে কেবল জপের মালা, তাঁহার দণ্ড জগদানন্দের এবং বহির্ব্বাস, কৌপীন, করোয়া গোবিন্দের হাতে। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর! কোন ক্রমে তাঁহার উদরে দুটো অন্ন প্রবেশ করাইয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন। এখন প্রভু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, এখন আপনি ছয় জনের জন্য ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিষেধ করে কাহার সাধ্য, আর নিষেধ করিলে শুনিবেনইবা কেন? এই যে পঞ্চভক্ত প্রভুকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন। তাঁহারা প্রভুর নিকট একটু মাত্রও বাধ্য নহেন। বরং প্রভু যখন চৈতন্য পাইতেছেন, তখনই ভক্তগণ তাঁহাকে যত্ন করিতেছেন। সেই প্রভু ভিক্ষা করিতে চলিলেন। নিমাই ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন, তোমার আমার মনে করিলে সহে না, তাঁহারা কিরূপে চোখের উপর দেখিবেন? কিন্তু হাত কি? নিষেধ করিতেও তাঁহারা সাহস করিতেছেন না। প্রভু এইরূপে তাঁহাদের চিত্ত বিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

প্রভু বহির্ব্বাস দ্বারা একটি ঝুলির মত করিয়া, ভক্তগণকে মন্দিরে রাখিয়া, আপনি ভিক্ষার নিমিত্ত বাহির হইলেন। প্রভুর এ হরিনাম

ভিক্ষা নয়, চাউল ভিক্ষা। প্রভু গৃহস্থের দ্বারে গিয়া "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রভু যদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, তবে গ্রাম টলমল করিয়া উঠিল। "ওরে নবীন সন্ন্যাসী দেখে যা" বলিয়া, আবাল বৃদ্ধ বনিতা অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দৌড়িল। প্রভু এক দ্বারে "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, হস্তে আঁচল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলেন। ভিক্ষা দাও কি অন্য কোন কথা বলিলেন না। প্রভু মস্তক অবনত করিলেন, যেহেতু গৃহস্থের বাড়ী স্ত্রীলোক দর্শন সম্ভব। যাহার বাড়ী প্রভু গমন করিলেন, সে ভাবিতেছে তাহার বাড়ীর যথাসর্ব্বস্ব অদ্য প্রভুকে দান করিবে। কিন্তু অন্যে তাহা করিতে দিবে কেন? অন্যান্য সকলেও প্রভুকে দ্রব্যাদি দিতে দৌড়িল। যাহার যে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য, তাহা দিবার নিমিত্ত সে ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল। প্রভু দুই এক বাড়ীর অধিক যাইতে পারিলেন না। দুই এক বাড়ীতে আঁচল পূরিয়া গেল, আর লইবেন না বলিয়া, ও লইতে পারিবেন না বলিয়া, বহুতর দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে লোকে মহাক্লেশ পাইল, প্রভুও তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ পাইলেন। যাহা হউক, ইহাতে প্রভুর একটি শিক্ষা হইল। তিনি স্বয়ং বরাবর ভিক্ষা করিবার যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

প্রভু মহা হর্ষিত হইয়া ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভক্তগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষার দ্রব্য দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন; বলিতেছেন, "প্রভু, আমাদিগকে পোষিতে পারিবে বুঝিলাম।" তখন জগদানন্দ রন্ধন করিতে বসিলেন, ও সকলে ভোজন করিয়া কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। এই যে ভিক্ষার কথা উল্লেখ করিলাম, বস্তুতঃ তাঁহাদের ভিক্ষা করিবার বড় প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু সর্ব্বস্থানেই দেবালয় আছে, সর্ব্বস্থানে

দেবসেবা ও অতিথিসেবা হয়। ভারতবর্ষের সে আকৃতি ও প্রকৃতি আর এখন নাই। এখন যেরূপ ইউরোপীয় জাতিরা সৈন্য পোষিয়া থাকেন, তখন সেইরূপ ভারতবর্ষীয়গণ সাধু পোষিতেন। এদেশে এত উদাসীন ছিলেন যে, "গৃহস্থ" কথাটীর সৃষ্টি হইল। এ কথাটি অন্যান্য দেশে সৃষ্টি হইতে পারে না, যেহেতু সেখানে উদাসীনের দল এত অল্প যে, তাহারা এক সতন্ত্র দল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেবস্থলী, অতিথিশালা, অতিথি নিবাস, পুষ্করিণী, কূপ দ্বারা পরিপূরিত ছিল। সুতরাং সন্ন্যাসী বৈরাগিগণ যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে কি থাকিতে পারিতেন।

উড়িষ্যা গমনে অন্নের অভাবের সম্ভাবনা ছিল না, তবে সে দেশে একটি বড় উৎপাত ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন কিছু কিছু আছে। সে উৎপাত পাটনীর। ঘাটপালগণ যাত্রীগণের উপর বড় অত্যাচার করিত। প্রভু গঙ্গাসাগর, সুন্দর বন, ও দুই রাজার ত্রিশূল উত্তীর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু পাটনীর হাতে ধরা পড়িলেন। ঐ ঘাটপালগণের সঙ্গে প্রভুর অনেক কাণ্ডের কথা উল্লেখ আছে, কতকগুলিতে বেশ আমোদও আছে। কথা কি, পাটনী ঘাটের রাজা। পার করেন কাহাদের, না যাত্রীদের। তাহারা বিদেশী, সুতরাং সহায় ও শক্তিশূন্য। পাটনী লোকজন লইয়া ঘাটে থাকে, অনায়াসে যাত্রিগণকে প্রহার, বন্ধন, লুণ্ঠন প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারে। নিজে ছোট লোক, অথচ অপার ক্ষমতা-সম্পন্ন। পাঠক! এখন পাটনীর অত্যাচারের কারণ বুঝিয়া লউন। প্রভু উড়িষ্যার অন্যকে কি ভবসাগর পার করিবেন, প্রথম যাইয়াই তাঁহার "দানীর" সহিত দ্বন্দ্ব বাধিল!

তাঁহারা ছয় জন পার হইবেন, তাহার দান চাই। কিন্তু কাহারও নিকট কপর্দ্দক মাত্র নাই। খেওয়ারিই বা বিনা কড়িতে কেন পার

করিবে? সঙ্গে কিছু দ্রব্যাদি থাকিলে কাড়িয়া লইত, কিন্তু তাহাও বড় বেশী ছিল না; মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে মুকুন্দের গায়ে একখানি পুরাতন কম্বল, অন্য সকলের ও প্রভুর গায়ে ছেঁড়া কাঁথা। প্রভু সমেত তাঁহারা ছয় জন প্রথম ঘাটে যাইয়া দাঁড়াইলে, দানী দান চাহিল। মহাজনের পদে আছে, "আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়া বয়।" কিন্তু উড়িষ্যার পথে দান ব্যতীত পার হওয়া যায় না। দান চাহিলে তাঁহারা বলিলেন, "কপর্দ্দক মাত্র নাই। দানী পার কর, তোমার পুণ্য হইবে।" এখন সাধু মাত্রে দানীকে এইরূপ পুণ্যের লোভ দেখাইয়া থাকেন। সে লোভে আর দানী ভূলে না। সাধু হইলেও দানী ছাড়ে না; আগে তাহাকে দুঃখ দেয়; দুঃখ পাইয়া যদি কিছু থাকে, তখন সাধু তাহা দানীকে দেন। যদি কিছু না থাকে সাধুর দুঃখ দেখিয়া অন্যান্য যাত্রিগণও পারের মূল্য দেয়। এইরূপে খেওয়ারির প্রায়ই বিনা মূল্যে পার করিতে হয় না। দানীকে কেহ ফাঁকি দিবেন তাহার যো ছিল না। আগে দান পরে পার, তাহাদের নিয়ম। কারণ সাধুগণকে পার করিয়া, শেষে তাহাদের নিকট মারিয়া ধরিয়া, কপর্দ্দক মাত্র না পাইয়া, এখন আর অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকেও পার করে না। যাহা হউক আপনারা জানিবেন যে উড়িষ্যায় যাত্রিগণ, খেওয়ারির নামে কম্পিত কলেবর।

প্রভুর গণেরা যখন বলিলেন, "কপর্দ্দক মাত্র নাই," তখন দানী বলিল, "তবে ওদিকে যাও, এদিকে আসিও না"। একটী পরিখা আছে তাহার এ পারে থাকিয়া মূল্যের বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাঁহারা মূল্য দেন তাঁহাদের পরিখার পারে যাইতে দেয়, তাঁহারা সেখানে বসিয়া থাকেন। এক নৌকা মানুষ হইলে তখন সকলকে পার করে। দানী, প্রভু ও তাঁহার গণকে বলিল, "ওদিকে যাও, এ দিকে আসিও না," ইহা

বলিয়াই প্রভুর পানে চাহিল। তখন তাঁহার তেজ দেখিয়া ভয় হইল! ভাবিতেছে, এঁর কাছেত দান লইব না, ইহাঁর সঙ্গে যাঁহারা আছে, তাঁহাদের কাছেও লইব না। ইহা ভাবিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তুমি আইস, তোমার দান লাগিবে না। আর তোমার সঙ্গী যে কয়জন আছেন তাহাদিগকেও লইয়া আইস।" প্রভু বলিলেই বলিতে পারিতেন যে, তাঁহার সহিত এই পঞ্চজন, আর ইহা বলিলেই সকলে পার হইতে পারিতেন। কিন্তু প্রভু রসিকশেখর, তাহা বলিলেন না। প্রভু বলিতেছেন কি, তাহা শ্রবণ কর। প্রভু বলিতেছেন, "দানী, আমি একা, ত্রিজগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি।" এই কথা বলিলে, দানী প্রভুকে পরিখার মধ্যে আসিতে দিল, কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে আসিতে দিল না। প্রভু অনায়াসে পরিখার মধ্যে আইলেন, আসিয়া ঘাটের ধারে বসিলেন। বসিয়া দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও বলিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন!

প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ একেবারে হাসিয়া উঠিলেন। তুমি যে ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর, ইহাদের দোষ কি, তোমারই বা ভাব কি? ইহাদের পরিত্যাগ করিয়া তুমিই বা কি করিয়া যাইবে? তুমি একবার মুখে বলিলেইত হইত যে, ইহারা তোমার লোক, আর তাহা হইলেই তাঁহারা পরিখার মধ্যে আসিতে পারিতেন। তাহা কেন বলিলেন না? ভক্তগণ প্রভুর ভাব দেখিয়া, প্রথমে হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। প্রভু মুখে একটী কথা বলিলেই দানী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিত। তাহা কেন বলিলেন না? তবে কি প্রভু সত্যই তাঁহাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন? এখন ওপারে গেলেই প্রভু হাত ছাড়া হইবেন, আর তাহা হইলে

কোন্ দেশে কোন্ ছন্দে চলিয়া যাইবেন তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু প্রভু ফেলিয়া যাইবেন কেন? তাঁহারা ভাবিতেছেন তাহারও কারণ আছে। তাঁহারা দিবানিশি প্রভুকে ঘিরিয়া থাকেন। প্রভুকে তাঁহার মনোমত কাজ করিতে দেন না। শুইতে বলেন, ভোজন করিতে বলেন, বিশ্রাম করিতে বলেন। তাহার পরে প্রভুর বিচিত্র গতি। তাঁহার মন তিনিই জানেন। কি জানি, সত্যই যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। এই সব ভাবিয়া, যদিও প্রভু অতি অল্প দূরে তাঁহাদের নয়নের আয়ত্তের মধ্যে বসিয়া, তত্রাচ তাঁহারা চিন্তায় ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

দানী তাঁহাদিগকে বলিল, "তোমরা ত গোসাঞির লোক নও, অতএব কড়ি দাও, দিলে তোমাদের পার করিয়া দিব।" এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে পরিখার বাহিরে রাখিয়া প্রভুকে পার করিতে চলিল। দেখে, প্রভু "জগন্নাথ আমাকে দেখা দাও" বলিয়া, স্ত্রীলোকে যেমন বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে, সেইরূপ করুণ স্বরে জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া, রোদন করিতেছেন। সে স্বর শুনিয়া নিঠুর দানীর হৃদয় দ্রব হইল। তখন দানী ইনি কে ও ব্যাপার কি, জানিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ উৎসুক হইল, আর সেই নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট আবার আসিল। বলিতেছে, "গোসাঞি! ইনি কে? এত কান্দেন কেন? মানুষের এত নয়ন জল ত কখন দেখি নাই? এমন ক্রন্দনও ত কখন শুনি নাই? তোমরা কি সত্য ঐ ঠাকুরের লোক?"

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "শুন নাই কি, উনি নবদ্বীপের অবতার, স্বয়ং ভগবান, এখন সন্ন্যাসী হইয়া জীব উদ্ধার জন্য নীলাচলে চলিয়াছেন। আমরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছি,"

বলিয়াই সকলে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন দানীও সেই সঙ্গে রোদন করিতে লাগিল, ও শ্রীপাদ ও অন্যান্য ভক্তগণকে যত্ন করিয়া পরিখার মধ্যে লইয়া গেল। দানী প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিল, "কোটী জন্মের পুণ্য ফলে অত্ত তোমার চরণ দেখিলাম।" তখনই দানীর সমুদায় বন্ধন মোচন হইল, আর সকলে প্রভুকে ঘিরিয়া হরি হরি বলিয়া নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন।

উড়িষ্যার পথে দুই ভয়, ডাকাতির ও ঘাটপালের। দুই রাজায় যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া দুই সীমানার মধ্যস্থানে কোন রাজারই শাসন নাই, লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। তাহার পর সমস্ত পথ জঙ্গলময়, ডাকাতি করিলে ধরে কে? কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার গণ সমুদায় দায় হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। উপরে এক দানীর কাহিনী বলিলাম, আবার কবিকর্ণপুর এই উপলক্ষে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন—

আর শুন এক অদ্ভুত কহি চমৎকার।
গ্রামে গ্রামে বড়ই কপট ঘট্টপাল॥
মহারণ্য পর্ব্বতে যতেক বাটপাড়।
পথিক লোকের তারা বড় শঙ্কাকর॥
সে সকল দস্যু দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
কান্দিয়া ঢলিয়া পড়ে পৃথিবী উপর॥
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলে নেত্রে বহে প্রেমধার।
গড়াগড়ি যায় দেহে প্রেমের সঞ্চার॥

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ্যে সকল সময়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেন না। শ্রীনবদ্বীপে, তাঁহার সকল কার্য্যই প্রায় গোপনে সাধন করিতেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে ধরা

দিতেন না। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন মহাপ্রভু নীলাচলের পথে চলিলেন, তখন তিনি অসীম শক্তির সহায়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন; কারণ, তখন তীব্র গতিতে কাজ না করিলে চলে না। পথে চলিয়াছেন, ইতিমধ্যে একজনকে উদ্ধার করিতে হইবে। পথে বিলম্ব করিতে পারেন না, সেখানে দৃষ্টিমাত্র কার্য্য সম্পন্ন না করিলে চলিবে কেন? তাহা হইলে সেখানে থাকিতে হয়, কিন্তু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই স্থানে এই সম্বন্ধে এই সময়কার একটী কাহিনী বলিব। প্রভু বিভোর হইয়া চলিয়াছেন, কোন দিকে দৃষ্টি নাই; সঙ্গে ভক্তগণ। সেই পথে একজন রজক কাপড় কাচিতেছিল। সেইস্থানে আসিয়া প্রভু যেন হঠাৎ চৈতন্য পাইলেন, পাইয়া সেই রজকের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কাজেই ভক্তগণ সেই সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের আগমন রজক আড়চোখে দেখিল, দেখিয়া কিছু না বলিয়া, আপন মনে কাপড় কাচিতে লাগিল। প্রভু একেবারে রজকের নিকট গমন করিলেন। ভক্তগণ, শ্রীগৌরাঙ্গের মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। রজকও অবশ্য ব্যাপার কি, ভাবিতেছে। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ রজকের নিকট যাইয়া বলিতেছেন, "ওহে রজক! একবার হরি বল।" রজক ভাবিল সাধুগণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন। এই ভাবিয়া "হরি বল," এ আজ্ঞা লক্ষ্য না করিয়া, সরলতার সহিত বলিল, "ঠাকুর! আমি অতি গরীব মানুষ, আমি তোমাকে কিছু ভিক্ষা দিতে পারিব না।"

প্রভু বলিলেন, "রজক! তোমার কিছু ভিক্ষা দিতে হইবে না, তুমি কেবল হরি বল।" রজক মনে ভাবিতেছেন, "ঠাকুরদের মনে নিশ্চিত কিছু অভিসন্ধি আছে। অভিসন্ধি না থাকিলে আমাকে হরি বলিতে কেন বলিবেন, অতএব হরি না বলাই ভাল। এই ভাবিয়া মুখ না

উঠাইয়া, কাপড় কাচিতে কাচিতে রজক বলিল, "ঠাকুর! আমার কাচ্চা বাচ্ছা আছে। আমি পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান করি। আমি এখন হরিবোলা হইলে, আমার সন্তানগণ উপোষ করিয়া মরিবে।"

প্রভু বলিতেছেন, "রজক! তোমার আমাদিগকে কিছু দিতে হইবে না, শুধু মুখে একবার হরি বল, হরিনাম বলিতে ব্যয়ও হয় না, কোন কাজের ব্যাঘাতও হয় না। তবে কেন হরি বলিবে না? অতএব একবার হরি বল।"

রজক ভাবিতেছে, "এ ত দায় মন্দ নয়! এ সন্ন্যাসী চান কি? কি জানি কি হইতে কি হইবে, আমার পক্ষে হরিনাম না লওয়াই ভাল।" ইহাই সাব্যস্ত করিয়া রজক বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমাদের কাজ নাই কর্ম্ম নাই, তোমরা সব পার। আমরা পরিশ্রম করিয়া পরিবার পালন করি। আমি কাপড় কাচিব, না হরিনাম লইব?"

প্রভু বলিতেছেন, "রজক! যদি তুমি দুই কাজ একেবারে না করিতে পার, তবে তোমার কাপড় আমাকে দাও, আমি কাচিতেছি, তুমি হরি বল।"

এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ ও রজক বিস্মিত হইলেন।

তখন রজক ভাবিতেছে, গোঁসাইয়ের হাত ছাড়ান মহা দায় হইয়া পড়িল, তা এখন করি কি? যাহা থাকে কপালে তাহাই হবে। ইহাই ভাবিয়া প্রভুর পানে চাহিয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! তোমায় কাপড় কাচিতে হবে না, তুমি শিঘ্র বল আমায় কি বলিতে হইবে, আমি তাই বলিতেছি।" এ পর্য্যন্ত রজক মুখ উঠায় নাই। কাপড় কাচা রাখিয়া এখন সে মুখ উঠাইয়া প্রভুর পানে চাহিয়া উপরের কথা গুলি বলিল। আর দেখিল কি যে, সন্ন্যাসী সকরুণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া

আছেন। আর তাঁহার নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে। ইহাতে রজক একটু মুগ্ধ হইয়া বলিতেছে, "ঠাকুর! কি বলিব, বল।" প্রভু বলিলেন, "রজক! বল হরিবোল।"

রজক বলিল। প্রভু বলিলেন, "রজক! আবার বল হরিবোল।" রজক আবার বলিল, হরিবোল। রজক এই দুইবার প্রভুর অনুরোধ-ক্রমে হরিবোল বলিয়া একেবারে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইল, এবং বিহ্বল হইয়া গেল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও, যেন গ্রহগ্রস্ত হইয়া, আপনিই "হরিবোল" বলিতে লাগিল। এইরূপে হরিবোল বলিতেছে, আর ক্রমে বিহ্বল হইতেছে। শেষে বলিতে বলিতে, একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইল, তাহার নয়ন দিয়া শত সহস্র ধারা বহিতে লাগিল, ও একটু পরেই রজক দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া, "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

ভক্তগণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রভু আর বিলম্ব করিলেন না। প্রভুর তখন কার্য্য সমাধা হইয়াছে, কাজেই দ্রুতবেগে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে চলিলেন। অল্প দূরে গমন করিয়া প্রভু বসিলেন, আর ভক্তগণ রজকের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, প্রভু যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। কারণ তাহার বাহ্য দৃষ্টি নাই। তখন সেই ভাগ্যবান আপনার হৃদয়ে গৌর রূপ দেখিতেছেন!

ভক্তগণের বোধ হইল, রজক যেন একটী যন্ত্র। প্রভু কি কল টিপিয়া দিয়া আড়ালে আসিলেন, আর সেই কলে হরিবোল বলিতে ও নাচিতে লাগিল।

ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন। একটু পরে সেই রজকের স্ত্রী হস্তে আহারীয় দ্রব্য লইয়া স্বামীর নিকটে আইল। আসিয়া স্বামীর

ভাব দেখিয়া অল্পক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, পরে কিছু না বুঝিতে পারিয়া, হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবে ইচ্ছা করিয়া, বলিতেছে, "ও আবার কি? তুমি আবার নাচিতে শিখিলে কবে?" কিন্তু রজক উত্তর দিল না, পূর্ব্বকার মত দুই হাত তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া "হরিবোল" "হরিবোল" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। রজকিনী বুঝিল যে স্বামীর বাহ্যজ্ঞান নাই, আর তাহার কি একটা হইয়াছে। তখন ভয় পাইল। পাইয়া চীৎকার করিয়া গ্রামের দিকে ধাবিত হইয়া পাড়ার লোক ডাকিতে লাগিল। রজকিনীর রোদন ধ্বনি ও আহ্বানে গ্রামের লোক ভাঙ্গিল। তাহারা আসিলে রজকিনী অতি ভীতভাবে বলিল যে তাহার স্বামীকে ভূতে পাইয়াছে। দিনের বেলায় ভূতের ভয় নাই, সকলে রজকের কাছে গেল। দেখে যে, সে অচৈতন্য হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে ভয়ে কেহ নিকটে যাইতে সাহসী হইল না। পরে সাহস করিয়া কোন একজন ভাগ্যবান লোক তাহাকে ধরিল। ইহাতে রজকের অর্দ্ধ-বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন রজক আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এই ব্যক্তি আলিঙ্গন পাইয়া হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিল! তখন এই দুইজনে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সেই মহাবায়ু জনে জনে ধরিল, এমন কি রজকিনীও সেই মদে উন্মত্ত হইলেন।

দৃষ্টি মাত্র শক্তি-সঞ্চার, ইহার বিস্তার বর্ণন পরে করিব। যখন প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিতে গমন করেন, তখন প্রায় এইরূপে দুই বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। তখনও ঐরূপ করিতেন। যাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, শুদ্ধ সে যে শক্তি পাইত এরূপ নয়, তাহার আবার শক্তি-সঞ্চারের শক্তি প্রায় পূর্ণমাত্রায় লাভ হইত।

যেমন উষ্ণ জলের মধ্যে শীতল জলপাত্র রাখিলে উহা উষ্ণ হয়, এবং শেষোক্ত উষ্ণ জলের মধ্যে আবার শীতল জলপাত্র রাখিলে তাহাও উষ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উষ্ণতা কমিয়া যায়, সেইরূপ প্রভুর যে শক্তি তাহা সঞ্চারিত ব্যক্তির পূর্ণ মাত্রায় লাভ হইল না, আবার সঞ্চারিত ব্যক্তি যাহাকে সঞ্চার করিলেন তাহারও ঐরূপ সঞ্চারকের পূর্ণ শক্তি প্রাপ্তি হইল না। এই গেল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এরূপও কখন কখন হইত যে সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত ব্যক্তি অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন। সে কখন, না যখন সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত ব্যক্তি অধিক অধিকারী কি বড় সাধক।

অধিকার সকলের সমান হয় না, আবার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা সকলে সমান করে না। শাস্ত্রে আছে যে, গৌর অবতারে পাত্র মোটে সাড়ে তিন জন, যথা সরূপ, রাম রায়, শিখি মাহিতী ও মাধবী দাসী। সরূপ—ইনি নবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্য, যাঁহাকে পূর্ব্বে একবার আমরা পাঠকবর্গকে গললগ্নীবা সপূর্ব্বক প্রণাম করিতে বলিয়াছি। অপর আড়াই জন পাত্রের কথা পাঠক ক্রমে জানিতে পারিবেন। পাত্র মানে এই যে, ইঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-দত্ত সুধা যতখানি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এত আর কোন ভক্ত পারেন নাই। অতএব যাঁহার হৃদয়ে যতখানি এই ভক্তি কি প্রেম সুধারস ধরে, তিনি সেইরূপ অধিকারী। অধিকার সকলের সমান নয়, তাহা সকলে জানেন। কেন নয় তাহা বলিতে পারি না, তাহা লইয়া বিচার করিতে পারি মাত্র, তাহাও এ স্থলে করিব না।

এই যে অধিকার, ইহার পরিবর্দ্ধন করাকেই সাধন বলে। অতএব যেমন কর্কশ-কণ্ঠ কোন ব্যক্তি সাধনার দ্বারা, সুকণ্ঠ হইয়া ভাল গায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ অল্প অধিকারী হইয়াও সাধনার দ্বারা একজন উচ্চ অধিকারী অপেক্ষা অধিক অধিকার অর্জ্জন করিতে পারেন। পথে

চলিবার সময় শ্রীগৌরাঙ্গ কাহাকে কৃপা করিতেছেন, কাহাকে করিতেছেন না, ইহার কি কারণ তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে যে তিনি বাছিয়া বাছিয়া লোক উদ্ধার করিতে করিতে গমন করিতেন, তাহা স্পষ্ট বোধ হয়। পথে কত লোক দেখিলেন, কত সাধু দেখিলেন, কিন্তু কৃপা রজককেই করিলেন। রজকের দ্বারা কেবল যে তাহার গ্রামবাসীদিগকে কৃপা করিলেন তাহা নয়, সে খণ্ড ভক্তি-তরঙ্গে ডুবিয়া গেল।

দানীর সঙ্গে প্রভুর আর দুইবার গোল হয়, শুনিতে পাই। একবার কোন দানী মুকুন্দকে বন্ধন করে। তাহার নিকট কপর্দ্দক না পাইয়া তাঁহার গাত্রের ছেঁড়া কম্বল কাড়িয়া লয়। তাহা দানীর কোন কার্য্যে আসিল না, যে হেতু সে কম্বলে কোন পদার্থ ছিল না। তখন দানী চতুর্দ্দিক হইতে বঞ্চিত হইয়া, সক্রোধে কম্বলখানি ছয়খণ্ড করিয়া ছয় জনের দানস্বরূপ গ্রহণ করিল। কিঞ্চিৎ পরে সেই খেওয়ারির কর্ত্তা প্রভুকে দর্শন করিল ও সমুদায় কাহিনী শুনিল।

এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর।
নূতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর॥—চৈতন্য-মঙ্গল।

ইহার পূর্ব্বে প্রভু আর এক স্থানে পার হইয়া উন্মত্ত অবস্থায় দ্রুত গমনে চলিয়াছেন, যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন। শুধু তাহা নয়, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রভু এ পর্য্যন্ত দ্রুতগতিতে জগন্নাথ-দর্শনে চলিয়াছেন, এখন প্রত্যাবর্ত্তন কেন করেন? ভক্তগণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলেন না, কেবল পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। প্রভু ফিরিয়া আসিলে ভক্তগণ দেখিলেন যে বহু যাত্রীকে দানী বহুবিধ যন্ত্রণা দিতেছে। প্রভু যেই আসিলেন, সেই কি হইল শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে ঃ—

প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে যায়॥
প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সর্ব্বজন।
দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানী ভাবে মনে মন॥
এরূপ মানুষ নাই জগত ভিতরে।
এই নীলাচল-চাঁদ জানিল অন্তরে॥
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী॥

এই যাত্রীগুলি উদ্ধার করিয়া প্রভু আবার নীলাচলে চলিলেন। উড়িষ্যায় প্রবেশ করিয়াই প্রভু দেখেন যে, রাজপথে গমন তাঁহার বড়ই অসুখকর হইতে লাগিল। তিনি আপন মনে গমন করিবেন; ভক্তগণ যে তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছেন ইহাও তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। এই নিমিত্ত ভক্তগণের উপর মহা বিরক্ত। আবার রাজপথে উঠিয়া দেখেন যে, সৈন্যের কোলাহলে পথ চলিবার যো নাই। গজপতি প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌড়ের বাদশাহার যুদ্ধ হইতেছে। রাজপথে সৈন্য হাতী ও ঘোড়ার কোলাহল। প্রভু বিরক্ত হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন, করিয়া বনপথে চলিতে লাগিলেন। তবে করেন কি, যেখানে তীর্থস্থান আছে, তাহা দর্শন করিবার জন্য রাজপথে আগমন করেন। দর্শন সমাধা হইলে আবার বনপথে গমন করেন। তবু প্রভুর কণ্টক হইতেছেন—নিজগণ। যদিও প্রভু নাসিকায় ভোজন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন, তবু নানা প্রকারে ভক্তগণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে ভোজন করান। তাঁহাকে নানা প্রকার সেবা করেন। ইহা প্রভুর ভাল লাগে না। প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সুবর্ণরেখা নদীর পরিষ্কার জলে স্নান করিলেন। প্রভু

চলিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমরা কি আমার সঙ্গে যাইতেছ?" আমি একা, আমার সঙ্গী নাই। হয় তোমরা অগ্রে যাও, না হয় আমি অগ্রে যাই, আমার সঙ্গে তোমরা যাইতে পারিবে না।"

ভক্তগণ প্রভুর এই চরিত্র দেখিয়া একটু হাস্য করিলেন। কিন্তু বড় চিন্তিতও হইলেন। এ আবার প্রভুর কি লীলা? তাঁহার অভিসন্ধি কি? কে তাহা জিজ্ঞাসা করিবে? কে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? কে বা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, অর্থাৎ কিরূপে তাঁহাকে একা যাইতে ছাড়িয়া দিতে পারে? ভক্তগণ উত্তর দিতে পারিলেন না। মুকুন্দ বলিলেন, "তবে প্রভু আপনি গমন করুন, আমরা পাছে রহিলাম।" প্রভু এই কথা শুনিয়া মহাহর্ষিত হইয়া, হুঙ্কার করিয়া, শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে দৌড়িলেন, ভক্তগণ পাছে রহিলেন। প্রভু একটু দূরে গমন করিলে ভক্তগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। তাঁহাদের মনের ভাব কি তাহা অবশ্য বুঝিয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে দর্শন দিবেন না, অলক্ষিতরূপে তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে গমন করিবেন।

এখন শ্রীগৌরাঙ্গের এই "নিঠুরতা" লইয়া একটু বিচার করিব। প্রভুর এই নিঠুরতা কেন? ইহার উত্তর, "তিনি নিজ-জন-নিঠুর।" তাহার মানে কি? মানে আর কিছু নয়, তিনি নিজ-জনের সহিত যত নিঠুরতা করেন, তাঁহার নিজ-জনের সহিত তত আত্মীয়তা বৃদ্ধি পায়। প্রীতি কি কখন আস্বাদ করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, তবে জানিবে যে, যেখানে প্রীতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে এরূপ কোন্দলরূপ ঝড়ে ইহার মূর্ত্তি আরো পরিবর্দ্ধিত হয়। একটি কথা মনে কর। স্বামী যদি উদাসীন হইয়া যান, আর স্ত্রীকে তাঁহার পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া তাহাকে প্রহার করেন, কি তাহাকে লুকাইয়া পলায়ন করেন, তবে কি সেই

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ক্রোধ হয়? না আরো প্রেম বাড়িয়া যায়? ইহাও সেইরূপ।

প্রভু এক দৌড়ে জলেশ্বর আসিলেন। জলেশ্বর শিবের স্থান। বহুতর মন্দির সেখানে বিরাজমান। জলেশ্বর-শিব সেখানকার প্রধান ঠাকুর। প্রভু সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন কেবল আরত্রিক আরম্ভ হইয়াছে। শিবের পূজার মহা আয়োজন হইতেছে, এবং বহুতর বাদ্য বাজিতেছে। পূজার সমুদায় সজ্জা দেখিয়া প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইলেন, সেখানে যাইয়াই, কাহাকে কিছু না বলিয়া, সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত, পরে যাহা হইবার কথা তাহাই হইল। সকলে ভক্তি-তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন; এমন কি, সকলের মনে বোধ হইল শিব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

করিতে আছেন নৃত্য জগৎ জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন॥
দেখি শিবদাস সবে হইল বিস্মিত।
সবেই বলেন শিব হইল বিদিত॥
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাদ্য।
প্রভু নাচিতেছেন তিলার্দ্ধেক নাই বাহ্য॥

প্রভুর সঙ্গে দৌড়িয়া যাওয়া সহজ কথা নয়। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়িয়াছেন, কিন্তু পারিবেন কেন? তাহাতে আবার অনাহার। তবু প্রভু বড় অধিক অগ্রে আসিতে পারেন নাই। যেহেতু ভক্তগণ প্রাণপণে প্রভুর পশ্চাতে দৌড়িয়া আসিয়াছেন। প্রভু যখন আপনি আনন্দে পাগল হইয়া সকলকে আনন্দে পাগল করিয়াছেন,—যখন শিব আসিয়াছেন ভাবিয়া লোকের মনের অবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে,—

ঠিক সেই সময় ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, কি একটা কাণ্ড হইতেছে। তাঁহারা আসিয়া, প্রভুর সহিত যে চুক্তি ছিল তাহা অনায়াসে ভঙ্গ করিয়া, একেবারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভুর নৃত্যে ও শিবের বাদ্যে বড় একটা মিল হইতেছিল না। বলা বাহুল্য, শিবের গীত বাদ্যে ও শ্রীকৃষ্ণের গীত বাদ্যে বড় একটা মিল সম্ভবে না। তবে শিবের সম্মুখে, ঢাকের বাদ্যে নৃত্য তাহার তাল মান বড় প্রয়োজন ছিল না। তবু যখন মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন প্রভুর আনন্দ সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হইল, ও নৃত্য আরও মধুর হইল। প্রভু ভক্তগণকে দেখিলেন, দেখিয়া আরও সুখী হইলেন। ভক্তগণ গাইতে লাগিলেন, আর প্রভু তখন প্রাণাধিক প্রিয়জন পাইয়া, আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে প্রভুকে সকলে শান্ত করিলেন। তখন তিনি সুখে ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। নিজ-জন সহ পূর্ব্বকার সকল কলহ মিটিয়া গেল। প্রভু ক্রমে বাঁসদহা পথে, পরে তমলুক অতিক্রম করিয়া, রেমুনাতে আসিলেন। রেমুনা রাজপথের ধারে, গোপীনাথের স্থান। ঠাকুর গোপীনাথ দ্বিভুজ মুরলীধর। প্রভু এই প্রথম দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি আপনি দেখিলেন, ও ভক্তগণকে দেখাইলেন।

এ কথার তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই দ্বিভুজ মুরলীধর-ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার মানে এই যে, তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভূজরূপে ধ্যান করিতেন। এখন প্রভু শ্রীভগবানের মাধুর্য্যভাব শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ। মাধুর্য্য ভজন এই যে, শ্রীভগবানকে নিজ-জন রূপে, অর্থাৎ

পতি, পুত্র, প্রভৃতি রূপে ভজনা করা। সেই ভগবান যদি চারি হস্ত সম্পন্ন রহিলেন, তবে তাঁহাকে পতি কি পুত্র বলিতে জীবের সাহস হইবে কেন ? মুখে বলিলে ত হইবে না। অন্তরে একজন চারিহস্ত সম্বলিত, শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি ধারী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুরুষ নির্ভয়ে পুত্র কি পতি কি সখা বলিতে পারে না। সুতরাং মাধুর্য্য-ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের দুখানি হাত ফেলিয়া দিতে হয়। আর যে দুখানি রহিল তাহাতে এমন কোন বস্তু দিতে হইবে যাহা মনোহর ও মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী। অর্থাৎ প্রভু বৃন্দাবনের শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দের নন্দন ত চতুর্ভূজ নহেন ; তাহা হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরূপে মাথায় বোঝা বহাইবেন, কি যশোদা তাহাকে বন্ধন করিবেন ? শ্রীনন্দের নন্দন দ্বিভুজ মুরলীধর, আর প্রভু মাধুর্য্য-ভজনের নিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রভুর ভক্তগণ, অবশ্য প্রভুর এই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিবামাত্র, গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যাঁহারা বাহিরের লোক, তাঁহারা তর্ক উঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, যদি দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বস্তু হইলেন, তবে প্রাচীন এরূপ মূর্ত্তি নাই কেন? ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন না। কিন্তু রেমুনায় গোপীনাথ বহুদিনের প্রাচীন মূর্ত্তি। আর তিনি দ্বিভুজ-মুরলীধর। তাহাই প্রভু ভক্তগণ সম্বলিত, বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন করিতে আসিলেন।

এই ঠাকুর উদ্ধব কর্ত্তৃক বারাণসী নগরে স্থাপিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি রেমুনাতে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই কথা স্মরণ করিয়া "উদ্ধব" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঠাকুরের অগ্রে আসিলেন ; আসিয়া, প্রথমে "উদ্ধবের ঠাকুর" বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, মস্তক স্পর্শ করিয়া, শ্রীগোপীনাথকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পরে

প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। যথা চৈতন্য-মঙ্গলে—

"উদ্ধব" "উদ্ধব" বলি ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারে বার॥

গোপীনাথের দাসগণ প্রভুর রূপ গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, প্রভুর প্রেম-তরঙ্গ দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। তখন কে গোপীনাথ ইহা তাঁহাদের ভ্রম হইতে লাগিল। প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। শ্রীগোপীনাথের মস্তকস্থিত পুষ্পরচিত চূড়া অমনি খসিয়া প্রভুর মস্তকে পড়িল। প্রভু উহা মস্তকে করিয়া আরও স্ফূর্ত্তির সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার ভাবের তরঙ্গে কিয়ৎকালের নিমিত্ত নৃত্যে ক্ষান্ত দিয়া, ঠাকুরের অগ্রে দাঁড়াইয়া, করযোড়ে এই দুই শ্লোক পড়িয়া, গোপীনাথের স্তব করিলেন, যথা—

ন্যঞ্চৎ কফোণিনমদংশমুদঞ্চদগ্রং
তীর্য্যক প্রকোষ্ঠ কিয়দাবৃত পীনবক্ষাঃ।
আবর্ত্ত্যমাণবলয়ো মুরলী মুখস্থ
শোভাং বিভাবয়তি কামপি বামবাহুঃ॥
আকুঞ্চনা কুল কফোণিতলাদ্দধান,
লব্ধ স্রুতা মধুরিমামৃত ধারয়ৈব।
আপ্লাবয়ন্ ক্ষিতিতলং মুরলীমুখস্থ
লক্ষ্মীং বিলক্ষয়তি দক্ষিণ বাহু রেষ॥

ক্রমে লোক সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর নৃত্যের বিরাম নাই।

চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে।
আকাশ পরশে হেন প্রেমার হিল্লোলে॥—চৈতন্য-মঙ্গল।

এইরূপে সমস্ত দিবা নৃত্য চলিল, পরে সন্ধ্যা হইল। তখন ভক্তগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রভু বসিলেন, আর আর সকলে বসিয়া মনসুখে কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "এই যে ঠাকুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইয়াছে।" ভক্তগণ ইহাতে সে কাহিনী শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিতে লাগিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীপ্রভুর গুরু, আর ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্রের নিকট শ্রীঅদ্বৈত মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীবিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও বিল্বমঙ্গল যে রসের পদ সমস্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন, প্রভু তাহা জীবন্ত করিলেন। সেইরূপ মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া যান, প্রভু তাহাই অঙ্কুরিত ও পরিশেষে ফলবান করেন। মাধবেন্দ্রপুরী ভারতবিখ্যাত, তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক, প্রভুর পূর্ব্বে কেহ কখন দেখেন নাই, শুনেন নাই। মাধবেন্দ্রপুরীর মেঘ দেখিলে কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি হইত, ও তিনি অচেতন হইতেন! তখনকার কালে সে অতি বড় কথা। অবশ্য প্রভু অবতীর্ণ হইয়া যে বন্যা উঠাইলেন, তাহার নিকট মাধবেন্দ্রপূরীর প্রেমের তুলনা হয় না। কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রভু তাহা বলিতেন না। "মাধবেন্দ্র' নাম করিতেই প্রভু বিহ্বল হইতেন। এই মাধবেন্দ্রপুরী রেমুনার গোপীনাথের এখানে আসিয়াছিলেন। গোপীনাথের এখানে বার খানি ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয়। এই বার খানি ক্ষীর ভুবন-বিখ্যাত। মাধবেন্দ্রের মনে ইচ্ছা হইল যে, একবার এই ক্ষীর আস্বাদ করিয়া দেখিবেন। এ ক্ষীর কিরূপ, আর ইহা কেন ভুবন-বিখ্যাত। ভাবিলেন, ইহার তথ্য

জানিতে পারিলে তিনিও তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিবেন। মাধবেন্দ্রের মনে এই ইচ্ছা হইলে, তিনি আবার লজ্জিত হইলেন। তখন তিনি মন্দিরের দূরে গমন করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে পূজারি ভোগ দিয়া শয়ন করিলেন! এমন সময় তাহাকে স্বপ্নে গোপীনাথ বলিলেন, "এক খানি ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকান আছে, তুমি উহা লইয়া বাজারে মাধবেন্দ্রপুরী নামক যে এক জন সন্ন্যাসী কীর্ত্তন করিতে করিতে নিশি যাপন করিতেছেন তাঁহাকে দাও।" পূজারী যাইয়া মাধবেন্দ্রকে তল্লাস করিয়া তাঁহার অগ্রে ক্ষীর রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "গোসাঞি! এই ক্ষীর ধর, ঠাকুর তোমার নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

সেই অবধি গোপীনাথের নাম হইল, "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।"

ইহা বলিয়া প্রভু মাধবেন্দ্রের গুণ বলিতে লাগিলেন। এ সমস্ত কাহিনী তিনি শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী কিরূপে মানবলীলা সম্বরণ করেন, প্রভু তাহা ঈশ্বরপুরীর নিকট যেরূপ শ্রবণ করেন, এখন তাহাও বলিতে লাগিলেন। গোসাঞি মাধবেন্দ্র বৃক্ষতলবাসী, ঈশ্বরপুরী তাঁহার নিকট। গোসাঞির অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন। ঈশ্বরপুরী গুরুর মল মূত্র কিছুমাত্র ঘৃণা না করিয়া পরিষ্কার করিতেছেন। ঈশ্বরপুরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গুরুর সেবা করিতেছেন। পুরী গোসাঞি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরপুরীকে তাঁহার সমুদায় কৃষ্ণপ্রেম অর্পণ করিলেন। তাই ঈশ্বরপুরীও এত শক্তিধর হইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বাছিয়া, তাঁহারই নিকট মন্ত্র লইলেন।

প্রভু পুরী গোসাঞির তিরোভাব কাহিনী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট বলিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন, ঈশ্বরপুরী সেবা করিতেছেন,

মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। ক্রমেই তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ বৃদ্ধি পাইতেছে, শেষে সেই বিরহ বেগ একটি শ্লোকরূপে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইল। সে শ্লোকটি এই—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কাদবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

রাধাভাবে পুরী গোসাঞি বলিতেছেন, "হে নাথ! তোমার দীন জনের দুঃখে দয়ার উদয় হয়, হইয়া তোমার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে নাথ! হে প্রিয়! আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া তোমাকে ইতি উতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমায় দেখিব?" এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে পুরী গোসাঞির চক্ষু স্থির হইল। ঈশ্বরপুরী দেখেন যে, পুরী গোসাঞিকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছেন!

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন যে, পুরী গোসাঞি এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইহা বলিয়া শ্লোকটী পড়িলেন, আর—আপনিও অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তগণ দেখেন প্রভুর সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয় নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে। তখন সকলে নানাবিধ সৎকার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে প্রভু নিশ্বাস ফেলিলেন, নয়ন মেলিলেন, পরে—

প্রেমোন্মাদ হইল, উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাসে নাচে কান্দে গায়॥
"অয়ি দীন' "অয়ি দীন" বোলে বারে বার।
কণ্ঠে না নিঃস্বরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥

এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কবাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।—চরিতামৃত।

এখন আপনি পবিত্র হইব বলিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর কথা একটু আলোচনা করিব। তাঁহার কেহ ছিল না। কিছু ছিল না। তাঁহার আপনার বলিতে নিজজন কেহ ছিল না, এক কপর্দ্দক সম্পত্তিও ছিল না। যখন রোগাক্রান্ত, তখন তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া; ঈশ্বরপুরী তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার এই অবস্থা মনে করিলে কাহার না হৃৎকম্প হইবে? কিন্তু ইহা তাঁহার বোধ নাই। তবে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল বটে, কিন্তু তাঁহার যে কেহ নাই, কিছু নাই, কি তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া দুঃখ পাইতেছেন. সে নিমিত্ত নহে। তবে কি নিমিত্ত? না, কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া! আর কি করিতেছেন, না বলিতেছেন, "কৃষ্ণ তুমি বড় দয়াময়, দীনজনের দুঃখ দর্শনে তোমার কোমল হৃদয় দ্রব্য হয়!"

আচ্ছা, তিনি যে এই অবস্থায় পড়িয়া কৃষ্ণকে দয়াময় বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তিনি কি শ্রীভগবানকে বিদ্রূপ করিতেছিলেন? অবশ্য তাহা কখন নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নিঃসহায়, বৃক্ষতলে পড়িয়া যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল যে, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেন্দ্রপুরী বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, সাধনে অদ্বিতীয়; নতুবা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্রপুরীর, আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার বহুতর লোক অনুগত থাকিবে, রাজা মহারাজগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবেন ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচারে তিনি ইহার কিছুই

পাইলেন না; তবে পাইলেন কি, না—রোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটি জল পাত্র, ও একটি কৃপালু শিষ্যের সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া তাঁহার সমুদয় যন্ত্রণা ভুলিয়া মৃত্যুকালে বলিতেছেন যে, "হে দীনদয়ার্দ্র-নাথ!" ইহার তৎপর্য্য কি? শুধু তাহাও নয়। তিনি যে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণকে দীনদয়ার্দ্র-নাথ বলিয়া আদর করিতে ছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, শত সহস্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়াও, মহা সুখের সময়ও তাহা বলিতে পার না। কেন? ইহার একমাত্র এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস-দাসী দ্বারা যে সুখ, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অন্য জাতীয় সুখ মাধবেন্দ্রের ছিল। নতুবা তিনি মৃত্যুকালে রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া এ কথা বলিতে পারিতেন না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান জীবন্ত সামগ্রী, ও তাঁহার ভক্তগণও এই "ভবের বাজারে' সার্থক "বিকি কিনি" অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন।

আবার দেখুন, মাধবেন্দ্র "হে দীনদয়ার্দ্র-নাথ! আমি তোমাকে না দেখিয়া দুঃখ পাইতেছি" বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সামান্য জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে, যথা "আমার গা জলিতেছে," কি "উদরে যন্ত্রণা হইতেছে," কি "অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল," ইত্যাদি, ইহা একবারও বলিলেন না। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন?

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, সৃষ্টি প্রক্রিয়া আপনি হয়, অর্থাৎ নিসর্গই সমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান বলিয়া আর কোন পৃথক্ বস্তু নাই। জ্ঞানী লোকের এই কথায় আমার তত দুঃখ নাই, যেহেতু, তাঁহারা ইহাও বলেন যে, স্বভাবের সৃষ্টিতে জটিলতা নাই: যথা, স্বভাব যেমন অভাব দিয়াছেন তেমনি অভাব দূর করিবার বস্তু দিয়াছেন, যেমন পিপাসা দিয়াছেন তেমনি জল দিয়াছেন, যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন তেমনি

অন্ন দিয়াছেন। শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। স্বভাবই যদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর সে সৃষ্টির যদি ভুল না থাকে, তবে "আমি কখন মরিব না," কি "কৃষ্ণ দরশন দাও নতুবা প্রাণে মরিব," এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি মরিব, অর্থাৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা ভাবিতে পারে না। স্বভাবের সৃষ্টিতে যদি জটিলতা না থাকে, তবে ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে জীব বিলুপ্ত হইবে না। যদি শ্রীভগবান-রূপ বস্তু না থাকিতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আসিত দিত না। যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে স্বভাব কৃষ্ণের প্রতি লোভ দিতেন না। স্বভাব লোভ দিবেন, লোভের বস্তু দিবেন না, ইহা হইতেই পারে না।

এই যে মাধবেন্দ্রপুরী "কৃষ্ণ! দেখা দাও, প্রাণ যায়," বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বভাবের দৃষ্টিতে যদি ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন কি করিলেন? কৃষ্ণ তখন কি করিলেন বলিতেছি। এমন অবস্থায় কৃষ্ণ কি করিবেন, তাহা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়া রাখিয়াছেন। যখন গো-বৎস হাম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্ত্তী জননী সেই ডাক শুনিবামাত্র হাম্বা বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। যেমন মাধবেন্দ্র "কৃষ্ণ দর্শন দাও, প্রাণ যায়" বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ "এই যে আমি" বলিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন! স্বভাব পরোক্ষে ইহা প্রমাণ করিতেছেন। ইহা যদি না হয় তবে সমুদায় মিথ্যা, যে স্বভাব লইয়া নাস্তিক জনে গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা, তাঁহার বড় ভুল।*

প্রভু শান্ত হইলে, গোপীনাথের সেবকগণ প্রসাদী সেই বার খানা

---

* এই 'অয়ি দীন' শ্লোকে, শ্রীঠাকুর মহাশয় সুর বসাইয়া এবং আর কয়েকটী চরণ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া একটী অপরূপ পদের সৃষ্টি করেন।

ক্ষীর আনিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন। প্রভু কিছু লইলেন, কিছু ফিরাইয়া দিলেন। প্রভু মহাপ্রসাদ কখনও উপেক্ষা করিতেন না। প্রভু গোপী-নাথের বিখ্যাত ক্ষীর সেবা করিলেন।

রেমুনা পরিত্যাগ করিয়া সকলে জাজপুর নগরে আসিলেন। জাজপুর তখন বড় সমৃদ্ধিশালী স্থান। সে স্থানের প্রধান ঠাকুর আদিবরাহ। জাজপুর আবার বিরজা দেবীর স্থান। শুধু তাহাও নয়। এমন দেবতাই নাই, যাঁহার মন্দির জাজপুরে ছিল না। যথা ভাগবতে—

জাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি সেই স্থানে।
কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রামে॥

প্রকৃত কথা, ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়। জাজপুরের যে অবস্থা সমস্ত ভারতবর্ষের, এক কালে, সেই অবস্থা ছিল। মুসলমানগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া এই সমুদায় দেবালয় ভঙ্গ করিতে লাগিল, তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার দেবালয়শূন্য হইল। কিন্তু উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের অধিকারে মুসলমান প্রবেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-কার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার সাক্ষী তখন উৎকল দেশ। জাজপুরে কাজেই বহুতর ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহারা দেবালয় লইয়া জীবন যাপন করেন। জাজপুরের আর এক সম্পত্তি বৈতরণী নদী। সেই বৈতরণীর দশাশ্বমেধঘাটে প্রভু গণসহ স্নান করিলেন। স্নান করিয়া বরাহ দর্শন নিমিত্ত গমন করিলেন। সেখানে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রভু সমুদায় দেবালয় দেখিতে চলিলেন। প্রভু বিরজা দেবীকে দর্শন করিলেন। সেখানে গোপীভাবে অভিভূত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিরজা দেবীর নিকট শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করিলেন। সকলেই এইরূপে দেবদর্শনে উন্মত্ত

আছেন, এই অবকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র লুকাইলেন! ভক্তগণ আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পান না! তখন একটী সঙ্কেতস্থান করিয়া সকলে নগরে যেথানে যত দেবস্থান আছে সেখানে প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে সঙ্কেত স্থানে সকলে আসিলেন, সকলেই ভাবিতেছেন যে, কেহ না কেহ প্রভুকে অবশ্য পাইয়াছেন। কিন্তু প্রভু নিরুদ্দেশ! তখন সকলে বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা বড় অজ্ঞান। এস আমরা ভিক্ষা করি, ভিক্ষা করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করি। প্রভু আমাদিগকে ফেলিয়া যাইবেন কেন? যদি তিনি প্রকৃত লুকাইয়া থাকেন, তবে আমাদের কি সাধ্য যে তাঁহাকে তল্লাস করিয়া ধরিব? মুখে যাই বলুন, তিনি ভক্তবৎসল, আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।"

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া সকলে ভোজন করিয়া সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রকৃতই প্রভু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত। সকলে হারাধন পাইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর লুকাইবার আর কোন কারণ ছিল না। লোকসঙ্গে দেবদর্শনে সুখ নাই, তাই ভক্তগণকে ফেলিয়া একাকী সেই স্থানের দেবদেবী দর্শন করিতেছিলেন।

এইরূপে প্রভু কটকে আসিলেন। কটক উড়িষ্যার রাজধানী, প্রতাপরুদ্রের বাসস্থান। সেখানে দিবানিশি সৈন্য কোলাহল হইতেছে। প্রভু লোক-সঙ্গ-ভয়ে বনপথেই গমন করিতেছেন, কেবল যেখানে দেবস্থান সেখানেই রাজপথে আসিতেছেন। কটকে আসিবার আর কোন কারণ ছিল না। কটক সাক্ষীগোপালের স্থান। প্রভু সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে প্রতাপরুদ্রের নগরে আসিলেন, কিন্তু রাজা রাজকার্য্যে বিব্রত, ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের

ভবিষ্যৎ "সংত্রাতা" তাঁহার ভবনের নিকট দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন।

কটকের নিম্নে মহানদী বহিতেছে। সেখানে প্রভু গণসহ স্নান করিয়া গোপাল দর্শনে গমন করিলেন। সাক্ষীগোপাল ঠাকুরটী কি প্রকার, না, শ্রীগৌরাঙ্গের মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন, ও একরূপ ভঙ্গী। অন্ততঃ ভক্তগণের বোধ হইতে লাগিল যেন দুই জনেই এক বস্তু, কি এক প্রকার। বিশেষতঃ যখন শ্রীগৌরাঙ্গ গোপালের পানে, ও গোপাল শ্রীগৌরাঙ্গের পানে, চাহিয়া থাকিলেন, তখন ভক্তগণের মনে উদয় হইল যে, দুই জনেই এক, কিন্তু পৃথক্ হইয়া কথা কহিতেছেন। প্রকৃত কথা, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া এই বোধ হইত যে, তিনি যেন কোন জীবন্ত বস্তু দেখিতেছেন, ও তাঁহার সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন। ভক্তগণ দেখিতেছেন, যেন দুই জনে, গোপাল ও গৌরাঙ্গে, কথা হইতেছে।

শ্রীচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দুই এক মূর্ত্তি॥
দুঁহে এক বর্ণ, দুঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দুঁহে রক্তাম্বর, দুঁহে স্বভাব গম্ভীর॥
মহা তেজোময় দুঁহে কমল নয়ন।
দুঁহার ভাবাবেশে দুঁহে শ্রীচন্দ্র বদন॥
দুঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারা ঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥

ভক্তগণ কিরূপ দেখিলেন তাহা চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে। গোপাল—

অধর হইতে বেনু ভূমিতে রাখিল।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে যেন কথা আরম্ভিল॥

গোপালের সহিত এখানে প্রভুর চুপে চুপে এরূপ আলাপ করিবার আর কোন কারণ নাই। কটকের মত জনাকীর্ণ স্থানে প্রেমতরঙ্গ উঠাইলে বড় বিষম ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই চুপে চুপে গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভু গণসহ চলিলেন। ক্রমে ভুবনেশ্বরে আসিলেন।

ভুবনেশ্বরের যেরূপ সুন্দর মূর্ত্তি এরূপ জগতে আর কোথাও নাই। গ্রীস ও রোম দেশের অনেক মূর্ত্তি মনোহর বটে, কিন্তু ভুবনেশ্বরের দেবমূর্ত্তির যে ভঙ্গী তাহা ইউরোপে কিরূপে অনুভূত হইবে? মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে কারিগরি ব্যতীত আরও কিছু চাই। সে আর কিছুই নহে, প্রেমভক্তির চর্চ্চা। যেরূপ গায়ক প্রেমভক্তির চর্চ্চা করিলে তাঁহার গীতে ভুবন মোহিত করিতে পারেন, সেইরূপ চিত্রকর ভক্তিচর্চ্চা করিলে তাহার কারিগরিতে ভুবন মুগ্ধ করিতে পারেন। এখনকার অনেকে চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহারা এই বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে শ্রীভগবানের সঙ্গ করিতে শিখেন, তখনই তাঁহারা প্রকৃত চিত্র করিতে শিক্ষা করেন। বিশাখা চিত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বর শিবের স্থান, কাশীর ন্যায় বিখ্যাত, এমন কি উহাকে গুপ্তকাশী বলে।

প্রভু শিবের বৈভব দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। শিবের অগ্রে নৃত্য করিলেন।

যে চরণ রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে সবে বিদ্যমানে॥—ভাগবত।

শিবের প্রেমে প্রভু উন্মত্ত হইলেন—

মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর।
টলমল করে তনু নাহি রহে স্থির॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বার বার॥

পরদিন প্রাতে বিন্দুসরোবরে আবার স্নান করিয়া সকলে পথে চলিলেন। এইরূপে কমলপুরে আইলেন। তখন সকলে ভাগীনদীতে স্নান করিয়া, কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে চলিলেন : প্রভু নিত্যানন্দ গমন করিলেন না, ঘাটে রহিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের গৌর ব্যতীত অন্য কোন ঠাকুর দেখিতে বড় একটা স্পৃহা ছিল না। তবে যে অন্য কোন ঠাকুর দর্শন করিতে যান, তাহা কেবল তাঁহার গৌরঠাকুরের অনুরোধে। সে যাহা হউক, সকলে কপোতেশ্বর শিব দেখিতে চলিলেন, তখন জগদানন্দ ভাবিলেন যে অমনি ঐ সুযোগে ভিক্ষা করিয়া আনিবেন। তিনি ঠাকুরের দণ্ড বহিতেন, ভিক্ষা করিবেন বলিয়া যাইবার বেলা, দণ্ড খানি শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে দিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে চলিলেন।

নিতাই দণ্ড লইয়া ভাগীনদীর তীরে বসিলেন। একা বসিয়া, গৌর কাছে নাই, কাজেই নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ডের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "দণ্ড! তোমার মত একখানি দণ্ড আমারও ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি; এখন তোমাকে ভাঙ্গিতে পারিলে আমার মনের দুঃখ যায়। ভাল, দণ্ড! আমি যে ঠাকুরকে হৃদয়ে বহন করি, সে ঠাকুর তোমাকে বহন করেন, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা কেন ? এখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব, দেখি তোমাকে কে রাখে। ঠাকুর আমার বংশী হাতে করিয়া ত্রিজগৎ মোহিত করিতেন। সেই বংশী তুমি দণ্ড

হইয়া তাঁহাকে বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গাল করিয়াছ; আজ দণ্ড! তোমায় আমি দণ্ড দিব।" ফল কথা, শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে তাঁহার ভক্তগণ ও নিজ-জন বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের উপকরণ যত সামগ্রী সমুদায় বিষের ন্যায় বোধ হইত; কিন্তু ভক্তগণ করেন কি, কিছু করিতে, এমন কি কিছু বলিতে পর্য্যন্ত, সাহস পাইতেন না। এখন শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ডটীকে একা পাইয়াছেন তাহাকে ছাড়িবেন কেন? প্রকৃতই তাহাকে ভাঙ্গিলেন, ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিলেন, করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন।

জ্ঞানী লোকে বলে যে, দণ্ডটী বিধির প্রতিরূপ। শ্রীভগবান বিধির ভৃত্য নহেন, তিনি তাহার বাহির, তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। বিধি-ধর্ম্ম ও প্রেম-ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী। নিতাই প্রেম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ও ফলোপভোগী। তিনি প্রভুর এই দণ্ডরূপ ভণ্ডামি রাখিতে দিবেন কেন? তাই দণ্ড গাছটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিয়া নিতাই বসিয়া রহিলেন, মনে মনে সাহস বান্ধিতে লাগিলেন যে প্রভু যদি দণ্ড-ভাঙ্গা লইয়া ক্রোধ করেন, তবে প্রভুর সহিত ঝগড়া করিবেন।

সেই হইতে ভাগীনদীর নাম হইল দণ্ডভাঙ্গা নদী!

তৃতীয় অধ্যায়

শ্যাম-নাগর ডাকে মোরে অঙ্গুলি হেলায়ে।
চাহিছে আমার পানে হাসিয়ে হাসিয়ে॥—চৈতন্যমঙ্গল গীত।

প্রভু কপোতেশ্বর দেখিয়া আবার চলিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার যে দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন, ইহার তথ্য লইলেন না, তিনি যে ইহার কিছু অবগত আছেন তাহাও ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না। প্রভু আপন মনে চলিলেন। কমলপুর ছাড়িয়াই প্রভু মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলেন। চূড়া দেখিয়া প্রভু যেন চেতন পাইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "ও কি?" ভক্তগণ বলিলেন,—"শ্রীমন্দিরের চূড়া!"

তখন নানাভাবে প্রভুর শরীর তরঙ্গায়মান হইল। ক্রমে সেই সমুদায় ভাব অঙ্গে লুকাইবার স্থান না পাইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব দেহ ভার॥
প্রসাদের দিকে প্রভু চাহিতে চাহিতে।
বলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥

সে শ্লোকটী এই—

প্রসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো,
মমালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ।

প্রভু যখন প্রসাদাগ্র দর্শন করিলেন, তখন স্তম্ভিত হইলেন। প্রভুর মন তখন দাস্য ভাবে নীলাচলচন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্থান

বৃন্দাবন। তখন তাঁহার স্থান নীলাচল হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নীলাচলচন্দ্রের মন্দিরে অবস্থিতি করেন। শ্রীমন্দিরের চূড়া বহুদিন পরে, বহু কষ্টের পরে, বহু সাধনের পরে প্রভু দর্শন করিলেন। এ চূড়াটী কি, না মন্দিরের সাক্ষী। মন্দির কি না শ্রীকৃষ্ণ উহার মধ্যে আছেন। প্রভু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চূড়ার অগ্রভাগ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখেন যে বালক বনমালী প্রাসাদাগ্রে দাঁড়াইয়া, হাসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। যেন বলিতেছেন, "এই দেখ, তুমিও যেমন আমাতে মিলিতে ব্যস্ত, আমিও তেমনি তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে দাঁড়াইয়া আছি।"

শ্রীমন্দিরের চূড়ার উপর বালগোপাল ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া! তাঁহার গলে বনমালা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছচূড়া, সর্ব্বাঙ্গ কুসুমমালা সজ্জিত, বাম হস্তে মুরলী। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, আর বনমালী হাসিয়া হাসিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রভুকে ডাকিতেছেন! হে ভক্ত! এই চিত্রটি হৃদয়ঙ্গম কর। শ্রীনিমাই এই যে বালগোপাল দর্শন করিবেন, ইহা তিনি শ্রীভগবান বলিয়া দেখিলেন, তাহা নয়। তিনি ভক্তরূপ ধরিয়া ভক্তের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, লাভালাভ এবং সুখাসুখ কি, তাহা জীবগণকে দেখাইতেছেন। শ্রীনিমাই যেটুকু ভক্তির বলে গোপাল দর্শন করিলেন, তোমার যদি সেইটুকু ভক্তি হয়, তবে তোমাকেও বালগোপাল হাসিয়া হাসিয়া ঐরূপে ডাকিবেন। প্রভু "প্রাসাদাগ্রে" এই শ্লোকটি বালগোপাল দর্শনমাত্র রচনা করিলেন; অর্দ্ধটি বলিলেন, আর অর্দ্ধটি বলিতে গেলেন, পারিলেন না। অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সুতরাং এই শ্লোকটির অপর অর্দ্ধ কি তাহা আর জীবে জানিতে পারিল না।

প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আনন্দ এত হইয়াছে যে, হৃদয়ে না ধরিয়া উথলিয়া উঠিল। আনন্দ উথলিয়া উঠিতে থাকিলে

যতক্ষণ পথ পায় ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্থা থাকে। কিন্তু সে আনন্দ-তরঙ্গের যখন গতিরোধ হয়, তখনি মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। প্রভুর আনন্দ-তরঙ্গ এত হইয়াছে যে, উহার গতি বন্ধ হওয়াতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বালগোপাল ডাকিতেছেন, মূর্চ্ছাতে সে ভাবকে একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই, সুতরাং মূর্চ্ছাতে প্রভুকে অধিকক্ষণ ভূমিশায়ী রাখিতে পারিতেছে না। তিনি অল্প চেতনা পাইতেই আবার শ্রীমন্দিরের দিকে গমনের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চেষ্টা মাত্র, যাইতেছেন, আবার ধূলায় পড়িতেছেন। প্রভু যখন অল্প চেতন পাইয়া উঠিতেছেন, তখন অবশ্য গোপাল দাঁড়াইয়া আছেন কি না তাহাই জানিবার নিমিত্ত প্রাসাদাগ্রে চাহিতেছেন। চাহিয়া দেখিতেছেন তিনি আছেন, আর প্রভু চেঁচাইয়া বলিতেছেন, "দেখ! ঐ দেখ! কৃষ্ণবর্ণ শিশু! আহা মরি কি সুন্দর নীলমণিকান্তি! কি সুন্দর মুখ! কি সুন্দর হাস্য! তোমরা দেখছ না? ঐ দেখ আমাকে অঙ্গুলি হেলাইয়া ডাকিতেছেন! ঐ দেখ আমার পানে চাহিয়া মধুর হাসিতেছেন।" কখন বা প্রভু ইহাতেও ছাড়িতেছেন না। নিতাইয়ের হাত ধরিতেছেন, হাত ধরিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন, "ঐ দেখ! দেখিতেছ না?" নিতাই করেন কি, বলিতেছেন, "হাঁ দেখিতেছি।" আবার প্রভু, "এলেম! এলেম! দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমাকে ফেলে যেও না। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিতেছি," বলিয়া দৌড়িতেছেন। আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এই স্থানে চৈতন্য-মঙ্গলের অপরূপ বর্ণনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিব। যথা—

স্নান সমাপিয়া প্রভু চলি যায় পথে।
জগন্নাথ মন্দিরে দেখিল আচম্বিতে॥
অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥

ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত॥
তা দেখিয়া সব জন চিন্তিত অন্তর।
"প্রভু" "প্রভু" বলি ডাকে না দেয় উত্তর॥
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বরে।
পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বলে॥
দেখিয়া সকল জন হৈল পুনর্ব্বার।
মরণ শরীরে যেন জীউর সঞ্চার॥
তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচন।
"দেউল উপরে কিছু না দেখ নয়ন?
নীলমণি বরণ কিরণ উজিয়াল।
ত্রৈলোক্যমোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥"
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে, "দেখিল।"
পুনঃ মোহ যায় পিছে, আশঙ্কা বাড়িল॥
পথে যত দেখে সুকৃতি নরগণ।
তারা বলে এই ত সাক্ষাত নারায়ণ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দধারায় পূর্ণ সবার নয়ন॥
সবে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর তিনেতে আসি হইল প্রবেশে॥—চৈতন্যমঙ্গল।

এইরূপ লীলা করিতে করিতে প্রভু মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন। যে স্নিগ্ধ স্নেহময় মনোহর মুখ সহজ অবস্থায় দেখিলে লোকের জগৎ সুখময় বোধ হয়; এখন সেই বদন নানাভাবে, নানারূপ সৌন্দর্য্যে, পরিশোভিত হইয়াছে। যেমন দ্বাদশবর্ষীয়া বালার মনে আবেগ হইলে ঠোট অল্প

অল্প কাঁপিতে থাকে, প্রভুর সেইরূপ সুচিক্কণ হিঙ্গুলরঞ্জিত ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপিতেছে, দুই পদ্মচক্ষু লোহিত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, সে দুটি কারুণ্যরসের সরোবর। "প্রভুর গলিত সুবর্ণ অঙ্গ যখন ধূলায় ধূসরিত-হইতেছে, তখন একরূপ শোভা হইতেছে। আবার একটু পরেই নয়ন জলে সমস্ত অঙ্গ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুর সুবলিত অঙ্গে অস্থি আছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রভুর নবীন বয়স সত্য, কিন্তু যত বয়স তাহা অপেক্ষাও তাঁহাকে অল্প বয়স্ক বোধ হইত। যেহেতু বয়স বৃদ্ধির সহিত প্রভুর ইন্দ্রিয়গণ বৃদ্ধি পায় নাই। পূর্ব্বেও প্রভুর বালকের মুখ, গতি ও ভঙ্গি, এখনও তাই। পথের লোকে কাজেই ভাবিতেছে যে, ইনি যে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন, ইনিই ত কিশোর নারায়ণ, ইনি ত কখন মনুষ্য নহেন। প্রভু চলিয়াছেন কিরূপে, যথা—

হাসে কান্দে নাচে গায় হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথে হইল সহস্র যোজন ॥—চরিতামৃত।

কমলপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ, কিন্তু এইটুকু পথ আসিতে দুই প্রহর বেলা হইল। পরে পুরীর সীমানায় আঠারনালা পর্য্যন্ত প্রভু আসিলেন, সেখানে আসিয়াই সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন; করিয়া ভক্তগণকে লইয়া বসিলেন।

ভক্তগণ যখন পথে আসিতেছেন, তখন আপনারা আপনারা কথা বলিতেছেন। তাঁহারা যত জগন্নাথের নিকট আসিতেছেন ততই ভাবিতেছেন যে ঠাকুর-দর্শন কিরূপে হইবে? শ্রীজগন্নাথ রাজরাজেশ্বর। যেমন প্রতাপরুদ্র কটকের রাজা, তেমনি শ্রীজগন্নাথ পুরীধামের রাজা। তাঁহাকে ইচ্ছা করিলেই দর্শন করা যায় না। যথা চন্দ্রোদয় নাটকে—

নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দরশন।
পরিচারক বিনা নাহি পায় অন্য জন॥
তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব।
তা সবার দরশন অত্যন্ত দুর্লভ॥
রাজার মনুষ্য যদি করয়ে সহায়।
তবে সে সুলভ হয় জগন্নাথ রায়॥

ভক্তগণ ভাবিতেছে যে, তাঁহাদের দর্শন কিরূপে হইবে। তাঁহারা পরদেশী, কাহারও সহিত পরিচয় নাই। রাজার লোক, কি জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাদিগকে কি কোন সহায়তা করিবেন? তবে তাঁহাদের একটী ভরসা ছিল। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে আছেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি সহায়তা করিলে অবশ্য ঠাকুর দর্শন করাইতে পারেন, কারণ এক প্রকার তিনিই পুরীর রাজা, অর্থাৎ সমস্ত উড়িষ্যা-বাসীই তাঁহাকে রাজার নীচে, সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান করিতেন। কিন্তু তিনি বড় লোক, ভুবন-বিখ্যাত নৈয়ায়িক, রাজার মন্ত্রী হইতেও অধিকতর পূজ্য। রাজা যত্ন করিয়া তাঁহাকে রাখিয়াছেন, রাজা তাঁহার আজ্ঞাবহ, তিনি কেন তাঁহাদের ন্যায় উদাসীনদিগকে সহায়তা করিবেন? এই সমুদায় কথার মধ্যে মুকুন্দ বলিলেন যে, শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য, সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি, নীলাচলে আছেন। ইনি প্রভুর ভক্ত। ইনি অবশ্য সহায়তা করিবেন। আর ইনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি বলিয়া ইনি সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব এই গোপীনাথের ভরসাকে প্রধান করিয়া ভক্তগণ নীলাচলে যাইতেছেন। তাঁহাদের প্রভু যে কি বস্তু তাঁহারা তখন আবার তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

অবশ্য প্রভু এ পরামর্শের কিছুই জানেন না। তাঁহাকে এ কথা কে বলিবে? তিনিই বা এ কথা মনে স্থান দিবেন কেন? এখন আঠার-

নালায় আসিয়া প্রভু সমুদায় ভাব সম্বরণ করিয়া বসিলেন, বসিয়া ভক্তগণের প্রতি চাহিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দকে বলিতেছেন, "আমার দণ্ড কোথায় ?"

নিত্যানন্দ বরাবর ভাবিতেছেন যে, দণ্ড ভাঙ্গার দণ্ড হইতে তিনি এড়াইয়াছেন। এখন প্রভু কর্ত্তৃক দণ্ডের অনুসন্ধান দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু প্রভু এখন নীলাচলে আসিয়াছেন, আর কি করিবেন ? তাহার পরে, সন্ন্যাস অবধি প্রভু বরাবর ভক্তদিগের যাহাতে দুঃখ হয় তাহা বিবেচনা না করিয়া, আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীনিতায়ের মনে রাগও আছে। একবার এই দণ্ড ভঙ্গ লইয়া প্রভুর সহিত কোন্দল করিবেন, সে সঙ্কল্প পূর্ব্বেও করিয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু প্রভুর সম্মুখে সাহস অধিকক্ষণ থাকিল না। নিতাই উত্তর করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন।

নিতাই যদি প্রভুর কথায় উত্তর না দিয়া মস্তক হেট করিলেন, তখন প্রভু যেন কৌতূহলী হইয়া অন্যান্য ভক্তজনের মুখপানে চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহিতেন। তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়ী ; সুতরাং তাঁহার কথা কহিতে হইল। তিনি প্রভুকে বলিলেন, "আমাদের পানে চাহেন কেন ? শ্রীপাদকে জিজ্ঞাসা করুন।" ইহাতে প্রভু জগদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দণ্ড কোথায় ? তোমাদের কাছেও ত দেখ্‌ছি না ?" জগদানন্দ বলিলেন, "তাহা তিন খণ্ড হইয়া গিয়াছে।" তখন প্রভু একটু হাসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের পানে চাহিয়া বলিলেন, "দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন ? পথে কি কাহারও সহিত মারামারি করেছিলে ?" শ্রীনিত্যানন্দ তখন বলিলেন, "তাহা নয়, তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে। আমার হাতে দণ্ড ছিল। তোমাকে ধরিতে গেলাম, আর দুই জনের ভরে উহা ভাঙ্গিয়া গেল।"

জগদানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! উচিত বাক্য বলুন, প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া লাভই বা কি, অব্যাহতিই বা কোথা? আমার নিকট দণ্ড ছিল, আমার এই বেলা স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। প্রভু, শ্রীপাদ কি ভাবিয়া আপনার দণ্ড ভাঙ্গিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন।"

তখন প্রভু যেন কোপ করিয়া শ্রীনিতাইয়ের পানে চাহিলেন। নিতাইয়ের এখন, হয় চরণে পড়া, না হয় কোন্দল করা, এই দুই উপায়ের একটী বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু একটু কোন্দল করিবার সাধ তাঁহার বরাবর রহিয়াছে, সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাই বলিলেন, "তা ভেঙ্গেছি, আমি ইচ্ছা করেই ভেঙ্গেছি। এক খানা বাঁশ বইত নয়? ইহার যে দণ্ড হয়, না হয় তাহা কর।"

প্রভুর সহিত মুখোমুখি করিয়া নিতাই আবার ভয় পাইলেন, ভক্তগণও একটু চিন্তিত হইলেন। প্রভুও একটু ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর দণ্ডে সমস্ত দেবতার বাস, তাহা তুমি জান। তুমি সেই দণ্ডকে বল কি না একখানা বাঁশ?

এখন প্রকৃত পক্ষে নিতাইয়ের নিকট ঐ দণ্ডটী এক খানা বাঁশ বই আর কিছু নয়। প্রেমভক্তি ভজনে আবার সন্ন্যাসের বা অন্য নিয়মের প্রয়োজন কি? ব্রজের গোপীগণের মধ্যে কে কবে দণ্ড ধরিয়াছিলেন? কিন্তু নিতাই প্রভুর উত্তরে আর বাড়াবাড়ি করিলেন না। একটি বড় মধুর উত্তর দিলেন। বলিলেন, "ভাল, তোমার বাঁশে তোমার সমুদায় দেবগণ বাস করেন। তুমি বুঝি এখন তাঁহাদিগকে ঘাটে করিয়া লইয়া বেড়াইবে? তুমি অবশ্য সবই পার, কিন্তু আমরা তাহা কিরূপে সহিতে পারি?"

এ কথায় প্রভুর ক্রোধ গেল না। তবে ভক্তগণ যেরূপ মনে ভয় পাইয়াছিলেন যে, দণ্ড ভঙ্গ হওয়াতে প্রভু বড়ই রাগ করিবেন, প্রভু

তেমন কিছু ক্রোধ করিলেন না। প্রভু বড়ই ক্রোধ করিবেন এরূপ ভাবিবার কারণ ছিল। প্রভু কাহাকেও নিয়ম ভঙ্গ করিতে দিতেন না। কেহ ভঙ্গ করিলে তিনি ভারি শাসন করিতেন। আপনি কোন নিয়ম ভঙ্গ করিবেন না, তাহা নিশ্চিত। দণ্ড ধারণ সন্ন্যাসের নিয়ম। গুরু এই দণ্ড দিয়াছেন, এই দণ্ড ভঙ্গ হইলে আবার গুরুর কাছে গমন করিয়া আর একখানি দণ্ড লইতে হইবে। কিন্তু তিনিই বা কোথা, তাঁহার গুরু কেশব ভারতীই বা কোথা। যদি প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত বলিতেন যে দণ্ড ভাঙ্গার সঙ্গে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিব, তাহা বলিলেও পারিতেন। সুতরাং দণ্ড ভঙ্গ করা শ্রীনিতাইয়ের পক্ষে বড় সাহসিকের কার্য্য হইয়াছিল। তিনি নিত্যানন্দ বলিয়াই পারিয়াছিলেন, আর কাহারও এরূপ সাহস হইত না, সাধ্যও হইত না।

প্রভুর নিজের দণ্ডের উপর যে শ্রদ্ধা ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। এ দণ্ড-গ্রহণ প্রকারান্তরে তাঁহার আপনার ধর্ম্মের বিরোধী। অতএব দণ্ড ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার মনে বিশেষ কিছু ক্লেশ কি দুঃখ হইতে পারে না। ক্রোধও সেইরূপ করিলেন। ভক্তগণ ভাবিয়াছিলেন, প্রভু হয়ত কিছু বিষম কাণ্ড করিবেন, কিন্তু তাহা কিছু করিলেন না। যে টুকু ক্রোধ করিলেন, সেও তত মনোগত নয়, কেবল ভক্তগণকে শাসন করিবার নিমিত্ত।

প্রভু বলিতেছেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আসিয়া খুব উপকার করিলে। সবে এক দণ্ড মাত্র আমার সম্বল ছিল, তাহাও অদ্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভঙ্গ হইল। এখন আমার নিবেদন শ্রবণ কর। আমার সহিত আর তোমরা যাইতে পারিবে না। হয় তোমরা অগ্রে যাও, যাইয়া জগন্নাথ দর্শন কর, নতুবা আমি আগে যাইব।"

মুকুন্দ বলিলেন, "তবে তুমি অগ্রে গমন কর, আমরা পরে যাইব। প্রভু বলিলেন, "তাহাই ভাল, তোমরা আমার পশ্চাৎ আসিও," ইহাই বলিয়া প্রভু ছুটিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, প্রভুর মনে ইচ্ছা তিনি একা যাইবেন, একা মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, একা জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কেন এরূপ ইচ্ছা করিলেন তাহা পরের ঘটনা শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। তাই দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া ক্রোধ করিলেন; ক্রোধ উপলক্ষ করিয়া, ভক্তগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া একা শ্রীমন্দির মুখে তীরের ন্যায় ছুটিলেন।

এখন উপরের কথা একটু স্মরণ করুন। ভক্তগণ সমস্ত পথ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন যে, প্রভুকে লইয়া তাঁহারা কিরূপে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ও ঠাকুর দর্শন করিবেন। এখন সেই ঠাকুর একা চলিলেন; চলিলেন, একেবারে অচেতন হইয়া। প্রভু কি কোন বিপদে পড়িবেন? জগন্নাথের দ্বার সেবকগণ রক্ষা করিতেছে, তাহাদের অতিক্রম করিয়া যাইবার যো নাই। তাহারা কাহাকেও যাইতে দেয় না। প্রভু না জানি আজি কি লীলা করেন! আবার প্রভুর সঙ্গে গেলেও তাঁহারা হয়ত কিছু সহায়তা করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা সঙ্গে যাইতে পারিবেন না। তাহার পরে প্রভু বিদ্যুৎ গতির ন্যায় গমন করিলেন, তাঁহার সঙ্গে মনুষ্য যাইতে পারে না। ইচ্ছা করিলেও তাঁহার সহিত যাইতে পারিবেন না, তাহা জানেন। এই চিন্তায় মগ্ন হইয়া ভক্তগণ, প্রভু নয়নের অদর্শন হইলে, উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ক্রমে মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মনে নাই, মন্দির দর্শন করিয়া প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। সিংহদ্বারে আসিয়া, প্রভুকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্বারে জিজ্ঞাসা করিতে

লাগিলেন, 'ওগো, তোমরা একজন নবীন সন্ন্যাসীকে এদিকে আসিতে দেখিয়াছ? তাঁহার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, প্রকাণ্ড শরীর, বর্ণ কাঁচা সোণার মত, আর প্রেমে তাঁহাকে পাগলের মত করিয়াছে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে উপস্থিত সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "দেখিয়াছি! সে বড় অদ্ভুত কথা।"

এখন প্রভুর কাহিনী শ্রবণ করুন। তিনি আঠারনালায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লইবা মাত্র,

মত্ত সিংহগতি জিনি চলিল সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর ॥—ভাগবত।

যাঁহারা দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা নিবারণ করিতে পারিলেন না। কারণ নিবারণ করিবার অবকাশ পাইলেন না। মন্দিরের মধ্যে প্রভু প্রবেশ করিলে তাঁহারা জানিতে পাইলেন, ও তখন, "মার" "মার" করিয়া পশ্চাতে দৌড়িলেন। মনে ভেবে দেখুন, যেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন। বহুতর দ্বারী দ্বার রক্ষা করিতেছে। রাজার নিকটে গমন করে মক্ষিকার পর্য্যন্ত সাধ্য নাই। এই অবস্থায় যদি কোন একজন দৌড়িয়া, বিনা অনুমতিতে, রাজার নিকট আপন বলে যাইতে থাকে, তবে রাজসভাস্থ সকলের ও দ্বারিগণের মনে কি উদয় হয়? "কে" "কে" "মার" "ধর" শব্দ চারি দিক হইতে উঠে। আর সেই লোকের পশ্চাৎ, তাহাকে ধরিতে সকলে ধাবমান হয়। শ্রীমন্দিরেও তাহাই হইল।

প্রভু একেবারে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত!

দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কারে।
ইচ্ছা হইল জগন্নাথে কোলে করিবারে ॥

প্রভু দেখিলেন জগন্ননাথ সিংহাসনে বসিয়া। প্রভু ভাবিলেন তাঁহার

হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন, কি জগন্নাথকে আপন হৃদরে পূরিবেন। এই গাঢ় আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রভু জগন্নাথকে ধরিতে চলিলেন। ধরিতে গিয়া লম্ফ দিতে হইল। লম্ফ দিলেন, জগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এই সমস্ত জগন্নাথের সেবকগণ, যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং যাঁহারা প্রভুর পাছে পাছে দৌড়িয়া আসিলেন, সকলে দেখিলেন, কিন্তু কেহ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাহাদের মতে, প্রথমতঃ প্রভু আপন জোরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, সে তাঁহার এক অপরাধ। কিন্তু তাহা অপেক্ষা তাঁহার কোটিগুণ অপরাধ হইল, শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করা। মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে, যদি কেহ এইরূপ বিনা অনুমতিতে, তাঁহার রক্ষকগণকে অতিক্রম করিয়া, মস্তকে যষ্টির আঘাত করে, তবে সে সাহসিক ব্যক্তির, রক্ষক ও সভাসদগণের মতে, যেরূপ অপরাধ হয়, জগন্নাথ সেবকগণের মতে, প্রভুর তাহা অপেক্ষাও অধিক অপরাধ হইল। এরূপ ভাবিবার আর একটী বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীজগন্নাথ জীবন্ত ঠাকুর। তাঁহার সেবকগণের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাকে স্পর্শ করিবার তাঁহার সেবকগণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। যদি অপর কেহ স্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাহার অঙ্গ শত খণ্ড হইয়া যায়, এই সেবকগণের বিশ্বাস। প্রভু শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন, অথচ তাঁহার অঙ্গ খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল না, ইহাতে স্বভাবতঃ সেবকগণের ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ যখন দণ্ড করিলেন না, তখন সেবকগণ আপনারাই দণ্ড করিতে প্রস্তুত হইলেন।

প্রথমে "মার" "মার" বলিয়া সকলে প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল। আবার যখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখন কাজেই শত শত লোক বড় সুবিধা পাইয়া প্রভুকে মারিবার উপক্রম করিল।

সেই সময়ে সেখানে একজন দীর্ঘাকার, পঞ্চদশাধিক বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কিন্তু কোনরূপ ক্রোধ হয় নাই, বরং বিপরীত ভাব হইয়াছে। তিনি দেখিলেন, যেন বিদ্যুল্লতা-জড়িত কোন মহাপুরুষ আসিয়া জগন্নাথের সম্মুখে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই সকল দর্শনে, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ তখন তরঙ্গায়মান হইল; আর যখন শত শত সেবকগণ প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল, তখন প্রভুকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবেন, তিনি এই সংকল্প করিলেন।

তিনি অতি ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা কর কি? দেখিতেছ না, মহাপুরুষ!"

যিনি এ কথা বলিলেন তাঁহার আজ্ঞা সকলেরই পালনীয়। তিনি সে স্থানে আজ্ঞা করিতে পারেন, তিনি আজ্ঞা করিলে উহা লঙ্ঘন করে এরূপ সাহসিক লোক সেখানে কেহ ছিল না। কিন্তু তবু জগন্নাথের সেবকগণ নিরস্ত হইল না। যেহেতু তাহারা তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়াছে। তাহারা কাহারো কখন এরূপ স্পর্দ্ধা দেখে নাই, ইহাতে আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিতেছিল।

কাজেই তখন সেই ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া, আপন শরীর দিয়া, প্রভুকে আবরণ করিলেন; আর সেবকগণ তখন বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইল। যখন সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে আবরণ করিয়া রাখিলেন, মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে মরিতে পাছে তাঁহার গাত্রে লাগে, এই ভয়ে, সেবকগণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

যিনি প্রভুকে এইরূপ আবরণ করিয়া রাখিলেন, তিনি ভুবনবিখ্যাত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম। নদীয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র, বাচস্পতি ও সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া শ্রীনবদ্বীপে প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রথম ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন।

তিনি শ্রীনবদ্বীপে ন্যায়ের আদি, চিন্তামণি গ্রন্থ-রচয়িতা, রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। তাঁহার যশঃ শুনিয়া প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে যত্ন করিয়া পূরীতে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি সমুদায় ভারতবর্ষে বিখ্যাত; বলা বাহুল্য তিনি প্রতাপরুদ্রের গুরুস্থানীয়। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উড়িষ্যায় যে কিছু হয়, তিনি তাহার নেতা, মীমাংসক ও মন্ত্রী। কাজেই তিনি এক প্রকার জগন্নাথ মন্দিরের কর্ত্তা। বাসুদেব মিথিলার ন্যায় অভ্যাস করিয়া বারাণসী নগরীতে বেদ পড়িতে গমন করেন। সেখান হইতে বেদ সমাপ্ত করিয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। এখন পুরীতে টোল করিয়াছেন। এখানে কেবল ন্যায় নহে, যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাকে তাহাই পড়ান, কারণ তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা। বিশেষতঃ তিনি দণ্ডীগণকে বেদ পড়াইয়া থাকেন। সুতরাং বেদ পড়িতে কাশীতে না যাইয়া অনেকে তখন তাঁহার নিকট পুরীতে বেদ অধ্যয়ন করিতেন।

এরূপ অসময়ে, আড়াই প্রহর বেলার সময়, তাঁহার মন্দিরে থাকিবার কথা নহে, কিন্তু সে দিবস ছিলেন। কেন ছিলেন ভক্তগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি ছিলেন বলিয়াই জগন্নাথ-সেবকগণকে নিবারণ করিতে পারিলেন, তিনি ও কটকবাসী স্বয়ং মহারাজ ব্যতীত আর কেহ ইহা পারিতেন না; সার্ব্বভৌম যে মহাপুরুষের ভয় দেখাইয়াছিলেন, সে ভয়ে সেবকগণ অভিভূত হইত না, যেহেতু তাহারা জগন্নাথের সেবক। তাহাদের উপর আবার মহাপুরুষ কে? শ্রীভগবানের আত্মীয়ই বা কে? তবে তাহারা যে নিরস্ত হইল সে কেবল সার্ব্বভৌমের অনুরোধে। তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারিল না।

তবু তাহাদের ক্রোধের শান্তি হইল না, মনে মনে রহিয়া গেল। শ্রীজগন্নাথের ভোগ মুহুর্মুহু দেওয়া হয়। যখন ভোগ দেওয়া হয়,

তখন ভোগের সামগ্রী ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া, সেবাইতগণ কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আইসেন। সে সময় সেখানে কেহ থাকিতে পায় না। ভোগের সময় উপস্থিত হইল, অথচ ঠাকুরের সম্মুখে প্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া। জগন্নাথের সেবকগণ সেই কথা অবলম্বন করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম তখন কিছু বিপদে পড়িলেন। এই মহাপুরুষটীকে অচেতন অবস্থায় ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবেন, দিয়া বাড়ী যাইবেন, ইহা তিনি পারিলেন না। তখন মনে মনে চিন্তা করিয়া অচেতন সন্ন্যাসীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে সাব্যস্ত করিলেন। এই স্থির করিয়া সেবকগণের মধ্যে, তাঁহার যাঁহারা শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসীকে বহন করিয়া তাঁহার বাড়ী পঁহুছিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সকলের ক্রোধ একটু শান্তি হইয়াছে, সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়াও কেহ কেহ মুগ্ধ হইয়াছেন। সন্ন্যাসীকে সার্ব্বভৌমের বাড়ী লইয়া যাইতে অনেকে প্রস্তুত হইলেন। তখন কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ জানু, কেহ মস্তক, কেহ কটি, কেহ বক্ষ, এইরূপে সেই প্রকাণ্ড শ্রীঅঙ্গ বহন করিয়া সকলে সার্ব্বভৌমের গৃহাভিমুখে চলিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়াই হউক, কি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াই হউক, যখন প্রভুকে সকলে লইয়া চলিলেন, তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে, শ্রীজগন্নাথ-সেবকের স্কন্ধে, হরিধ্বনির সহিত, আমাদের প্রভু শ্রীসার্ব্বভৌমের গৃহে শুভাগমন করিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুকে অভ্যন্তরে লইয়া, পবিত্র স্থানে, পবিত্র আসনে, শয়ন করাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম বাহকগণকে বিদায় করিয়া, আপনি তাঁহার শিয়রে বসিয়া, প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই।

প্রথমে দেখিলেন, আয়ত নয়ন অর্দ্ধ-মুদিত ও তারা স্থির হইয়া আছে। তাহার পরে দেখিলেন, হৃদয়ে স্পন্দন নাই। ইহাতে প্রথমে ভয় পাইলেন, পাছে শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইয়া থাকে। এই ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া নাসিকায় তূলা ধরিলেন, এবং অতি মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন করিয়া বুঝিলেন, তুলা ঈষৎ চলিতেছে। ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং সেই অঙ্গ পুলকাবৃত দেখিয়া বুঝিলেন যে, প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই, সন্ন্যাসী মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ। শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে সমুদায় তিনি অবগত আছেন। তাহার মধ্যে কতক মনোগত বিশ্বাস করেন, কতক অভ্যাসবশতঃ বিশ্বাস করেন, আর কতক আদবে বিশ্বাস করেন না। "কৃষ্ণপ্রেম" শব্দই শুনিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেমে কি কি ভাব হয় তাহাও পড়িয়াছেন; কিন্তু ভাবিতেন যে, শাস্ত্রের কথা ঠিক, কিন্তু এ কলিকালে উহা ঘটে না। "কৃষ্ণপ্রেম" বলিয়া যদি প্রকৃত কোন বস্তু থাকে, তবে শ্রীকৃষ্ণের গণের থাকিতে পারে; মনুষ্যের দেহে এরূপ প্রেম,—যে শ্রীকৃষ্ণের গুণে একেবারে অচেতন,—ইহা আর সম্ভবে না। সার্ব্বভৌম এখন দেখিতেছেন যে, যে কৃষ্ণপ্রেম তিনি শাস্ত্রের কল্পনা বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহা কল্পনা নয়, প্রকৃত বস্তু। ইহাতে তিনি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, হইয়া সন্ন্যাসীটীকে পাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিতে লাগিলেন।

এ দিকে সন্ন্যাসীটী সকল প্রকারে ভাল। সন্ন্যাসী দেখিলে গৃহস্থ লোকের কখন কখন ঘৃণা হয়, যেহেতু তাহারা বড় অপরিষ্কার।

কিন্তু এ সন্ন্যাসীর অঙ্গে সর্ব্বদা পদ্মগন্ধ বহিতেছে। এই যে বহিতেছে বলিলাম, ইহা যে প্রভুকে স্তুতি করিয়া বলিলাম তাহা নহে। প্রভুর লীলা-লেখকেরা বলিয়াছেন যে, প্রভুর অঙ্গের সর্ব্বকালীন সৌরভে নাসিকা মত্ত হইত। তাহার পরে সার্ব্বভৌম দেখিতেছেন যে, সন্ন্যাসীটীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সুবলিত অঙ্গ, এবং অঙ্গের অলৌকিক বর্ণ। বদন দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেহে কখন পাপ কি কু-ইচ্ছা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই। আরও বোধ হইতেছে যে, ইঁহার হৃদয় করুণা, স্নেহ ও মমতায় পূর্ণ; ইঁহার অন্তর সরল, ও বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ। সার্ব্বভৌম যত দেখিতেছেন, ততই তাঁহার প্রাণ সন্ন্যাসীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে; তবে বহুক্ষণেও চৈতন্য হইতেছে না, ইহাতে মনে কিছু চিন্তিত রহিয়াছেন।

ওদিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়া শুনিলেন মহা কলরব হইতেছে। একটু পরেই বুঝিলেন যে, একজন অতি রূপবান নবীনবয়স্ক সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ধরিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাওয়ায়, সার্ব্বভৌম ঠাকুর তাঁহাকে আপনার বাড়ী লইয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ বুঝিলেন যে, এ প্রভুর কথাই হইতেছে, আর প্রভুকে অচেতন অবস্থায় সার্ব্বভৌমের বাড়ী লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ভক্তগণ তখন সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইবেন এই স্থির করিয়া ভাবিতেছেন, তিনি বড়লোক, কিরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন; এমন সময় সেখানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোপীনাথ আচার্য্য মহেশ্বর বিশারদের জামাতা, সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি, পরমপণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গের পরমভক্ত। স্বয়ং কুলীন ব্রাহ্মণ,

শ্যালকের নিকট আগমন করিয়াছেন, করিয়া সেখানে আছেন। শ্রীগোপীনাথকে পাইয়া সকলেই মহা হর্ষযুক্ত হইলেন। সকলে ভাবিলেন যে, এ প্রভুর কার্য্য সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে, যে সময় যাঁহাকে প্রয়োজন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কেন? পরস্পরে বন্দন-আলিঙ্গনাদির পরে গোপীনাথ শুনিলেন যে, শ্রীনিমাই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, আর এখন তিনি সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে। এই সংবাদ শুনিয়া গোপীনাথের সুখ দুঃখ উভয় হইল। দুঃখ হইল, নবদ্বীপনাগর এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন বলিয়া। সুখ হইল তাঁহার স্বার্থপরতার নিমিত্ত, অর্থাৎ প্রভুকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া। এই জন্য গোপীনাথ ভক্তগণকে লইয়া অবিলম্বে সার্ব্বভৌমের বাড়ী দৌড়িলেন। ভক্তগণ এখানে মহা অপরাধ করিলেন, যেহেতু মন্দিরের নিকট আসিয়াও শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে চাহিলেন না। গোপীনাথ সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই দর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে নিবিষ্ট, জগন্নাথের কথা একেবারে মনেই ছিল না। তবে যাইবার বেলা শ্রীমন্দিরকে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইয়া, গোপীনাথ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে দ্বারে রাখিয়া, আপনি অভ্যন্তরে গমন করিলেন। যাইয়া দেখেন যে, নবদ্বীপের আনন্দ, কাঙ্গাল বেশ ধরিয়াছেন, আর ধূলায় ধূসরিত হইয়া অচেতন অবস্থায় শুইয়া আছেন! গোপীনাথের, প্রভুর মুখ দেখিয়া যেরূপ সুখ হইল, তাঁহার পূর্ব্বকার অবস্থা মনে করিয়া ও তখনকার অবস্থা দেখিয়া, সেইরূপ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রভুর দর্শনসুখ অধিকক্ষণ ভোগ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি বাহিরে দাঁড়াইয়া। দ্বিতীয়তঃ সার্ব্বভৌম যদিও শ্যালক, তবু বহিরঙ্গ লোক; তাঁহার নিকট, সেই সংজ্ঞাশূন্য সন্ন্যাসীর উপর নিজের কি ভাব

তাহা প্রকাশ করিলেন না। প্রভুর আপাদমস্তক দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন যে, শায়িত সন্ন্যাসীর গণ পঞ্চজন দ্বারে দাঁড়াইয়া, তাঁহারা অভ্যন্তরে আসিতে চাহিতেছেন। সার্ব্বভৌম "এখনি লইয়া আইস" বলিলেন। ফল কথা, তিনি সন্ন্যাসীটিকে লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাঁহার গণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে অভ্যাগত সন্ন্যাসীকে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন, ভাবিলেন। সার্ব্বভৌমের অনুমতি পাইয়া গোপীনাথ দৌড়িয়া বাহিরে যাইয়া ভক্তগণকে অভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন।

প্রভুকে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন ও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারাও, প্রভুকে যত্ন করিয়াছেন বলিয়া, সার্ব্বভৌমকে অশেষবিধ ধন্যবাদ দিলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোসাঞির এরূপ অচেতন অবস্থা কতক্ষণ থাকিবে?" ভক্তগণ বলিলেন যে, এরূপ ঘোরমূর্চ্ছা হইলে প্রভু অচেতন অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকেন। তাহার পরে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভৃতির ঠাকুর দর্শন হইয়াছে কি না। ইহাতে শুনিলেন যে, তাঁহাদের সে ভাগ্য হয় নাই। তখন তিনি আপন পুত্র চন্দনেশ্বরকে, ভক্তগণকে লইয়া ঠাকুর দর্শন করিতে পাঠাইলেন। ভক্তগণ বাধ্য হইয়া, গোপীনাথের তত্ত্বাবধানে প্রভুকে রাখিয়া, নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতে চলিলেন। যখন ভক্তগণ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেবকগণ শুনিলেন যে, পূর্ব্বে যে সন্ন্যাসী শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারি গণ ইহাঁরা। তখন সেবকগণ ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "আপনারা স্থির হইয়া দর্শন করিবেন, পূর্ব্বকার গোসাঞির মত অধীর হইবেন না, আর জগন্নাথকে ধরিবেন না।" ফল কথা, সেবকগণের, পূর্ব্বকার গোসাঞির সাহসিক কাণ্ড

দেখিয়া, প্রভু ও তাঁহার গণের উপর একটু ভয় ও শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। সেবকগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে সেইজন্য মালা প্রসাদ আনিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি জগন্নাথ দর্শনের সুখ অল্প ভোগ করিয়া আবার প্রভুর ওখানে প্রত্যাগমন করিলেন, ও আবার প্রভুকে ঘিরিয়া বসিলেন।

ভক্তগণ বসিয়া, গোপীনাথ বসিয়া, ও সার্ব্বভৌম বসিয়া, কিন্তু প্রভুর চৈতন্য নাই।

বাহু পরে শিরঃ রাখি প্রভু অচেতন।
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ মুদিত নয়ন॥

তখন ভক্তগণ প্রভুকে বল দ্বারা চেতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ উচ্চ করিয়া নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মধুর হরিধ্বনি প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি হুঙ্কার করিয়া, "হরি" "হরি" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রভু চৈতন্য পাইবামাত্র, সার্ব্বভৌম "নমো নারায়ণায়" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন। প্রভু "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম করযোড়ে বলিলেন, "স্বামিন্, সমুদ্র স্নান করিয়া আসুন, অদ্য এ অধমের বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করুন।" প্রভু স্বীকার করিলেন, আর সেই তৃতীয় প্রহর বেলায় গণসহ সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন।

এদিকে সার্ব্বভৌম মনের সাধে প্রসাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রভুও স্বগণে স্নান করিয়া আইলেন। তখন সার্ব্বভৌম সুবর্ণ থালাতে আপনি প্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। প্রভু যখন ভক্তগণ সঙ্গে স্নান করিতে গমন করেন, তখন সমুদয় কাহিনী, অর্থাৎ তিনি কি কি করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি অচেতন অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করেন, শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে যাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান, সেবকগণ

তাঁহাকে আক্রমণ করে ও সার্ব্বভৌম তাঁহাকে রক্ষা করেন, এবং শেষে কিরূপে তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান, এ সমুদায় ভক্তগণের মুখে শুনিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমের কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। সকলে স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। "তৃণাদপি" নীচ হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার দেখিয়া সার্ব্বভৌম একেবারে মোহিত হইলেন। তিনি যে উত্তম উত্তম অতি উপাদেয় প্রসাদ আনিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, নবীন সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবেন। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী কিরূপ নিয়ম পালন করেন, তাহা জানেন না। যদি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তিনি সুরস প্রসাদ ভোগ না করেন, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম আপনি পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া ভাল করিয়া ভুঞ্জাইবেন। প্রভুও সার্ব্বভৌম যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই করিলেন, তিনি সুস্বাদু প্রসাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া করযোড়ে সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "এই সমুদায় পীঠাপানা, ছানাবড়া প্রভৃতি শ্রীপাদ প্রভৃতিকে দিতে আজ্ঞা হয়। আমাকে কেবল কিঞ্চিৎ নফরা ব্যঞ্জন দিবেন, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে।"

প্রভু গরুড় পক্ষীর ন্যায় সার্ব্বভৌমের অগ্রে বসিয়া আছেন। সার্ব্বভৌম প্রভুকে প্রসাদ ভুঞ্জাইবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথ কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, স্বামিন্! একবার আপনি আস্বাদন করিয়া দেখুন।" এইরূপে করযোড়ে শ্রীসার্ব্বভৌম ঠাকুর প্রভুকে অনুরোধ করিতে থাকিলে, প্রভু না বলিতে পারিলেন না। প্রভু সমুদায় প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে রাখিয়া, গোপীনাথকে লইয়া ভোজন করিতে অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

এ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম জানেন না যে, ইহাঁরা কাহারা। ইহা জানিবার

অবকাশও পান নাই। যতক্ষণ প্রভু অচেতন ছিলেন, ততক্ষণ কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। তাহার পরে সকলে সমুদ্র স্নান হইতে আগমন করিলে, তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই অন্যায়, তাহাতে প্রভু সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে আসিয়াছেন। সার্ব্বভৌম অতি বিনয়ী ও ভদ্র, তিনি কাজেই সন্ন্যাসীগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিবার আর এক কারণ ছিল। গোপীনাথ যে শ্রীগৌরাঙ্গের গণ ইহা সার্ব্বভৌমকে পূর্ব্বেও বলেন নাই, এখনও জানিতে দিতেছেন না। সার্ব্বভৌম কর্ত্তব্যে নাস্তিক, তাঁহার নিকট নদীয়ায় অবতার হইয়াছেন এ সব কথা বলাও যে, বেণা-বনে মুক্তা ছড়ানও সে। এখন গোপীনাথ প্রভুর সাক্ষাতে এরূপ ভাব করিতেছেন, যেন তাঁহাদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু ইহা গোপন কেন থাকিবে? সার্ব্বভৌম বেশ বুঝিলেন যে, নবীন সন্ন্যাসী গোপীনাথের শুধু পরিচিত মাত্র নহেন, অতি প্রিয় ও আত্মীয়ও বটেন। সেই জন্য সার্ব্বভৌম ভাবিলেন যে, তাঁহাদের পরিচয় গোপীনাথের নিকট পাইবেন। তিনি কেবল প্রভুর আশীর্ব্বাদে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" শুনিয়া ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী কৃষ্ণভক্ত।

অভ্যন্তরে গমন করিয়াই সার্ব্বভৌম গোপীনাথের নিকট নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাঁরা কাহারা?

গোপীনাথের ইচ্ছা ছিল না যে প্রভুর পরিচয় দেন, কিন্তু পরিচয় দিতে হইল ও দিলেন। তিনি বলিলেন, "নবীন সন্ন্যাসী যিনি, ইনি নিমাই পণ্ডিত নামে শ্রীনবদ্বীপে বিখ্যাত, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র ও জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরের পুত্র; আর সঙ্গীগণ যাঁহারা তাঁহারা নবীন সন্ন্যাসীর গণ।"

সার্ব্বভৌম এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি নির্ব্বাসিতের ন্যায় দূরদেশে বাস করেন। উড়িষ্যার রাজা ও বাঙ্গালার বাদসাহের যুদ্ধের নিমিত্ত লোক গতায়াত বন্ধ। এমত অবস্থায় গৌড়ীয় মাত্রই সার্ব্বভৌমের আদরের বস্তু। এখন দেখিলেন যে, সন্ন্যাসী ও তাঁহার গণ শুধু গৌড়ীয় নহেন, নদীয়াবাসী; শুধু নদীয়াবাসী নহেন, তাঁহার পরিচিত,—এক প্রকার আত্মীয়ও বটেন।

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "বটে! তবে ইনি যে আমার নিজ-জন। আমার পিতা বিশারদ ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সমাধ্যায়ী, ইনি তাঁহারই দৌহিত্র। জগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর আমার সমাধ্যায়ী, ইনি তাঁহার পুত্র। আমি বড় সুখী হইলাম।" ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌম আবার প্রভুর সম্মুখে আসিয়া, "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন, প্রভুও "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "আমি আপনার মহিমা শ্রবণ করিলাম। আপনি আমার অতি নিজ-জন। আপনার পিতা ও মাতামহের সহিত আমাদের বরাবর ঘনিষ্ঠতা আছে, সহজেই আপনি আমার পূজ্য। আবার এখন সন্ন্যাস লইয়াছেন, অতএব আমাকে আপনার নিজ দাস বলিয়া জানিবেন।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু শিহরিয়া উঠিয়া কর্ণে হস্ত দিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আপনি বলেন কি? আপনি জগদ্‌গুরু, সকলের শীর্ষস্থানীয়। আমি সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর আপনি শিক্ষাগুরু। আপনি পরম দয়ালু, এই জগৎকে নিজ দয়া-গুণে শিক্ষা দিতেছেন। এই সমুদায় জানিয়া আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি বালক, অজ্ঞ, ভাল মন্দ জানি না; বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। আপনি

আমাকে আপনার শিশু ভাবিয়া, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। অদ্যকার বিপত্তির কথা মনে করিলে আমার হৃৎকম্প হয়। ভাগ্যে আপনি উপস্থিত ছিলেন, তাহা না হইলে, আমার যে আজি কি গতি হইত তাহা বলিতে পারি না। আমার মনে বড় সন্দেহ ছিল, বুঝি আমি আপনার দর্শন পাইব না, তাহা, শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, আমাকে মিলাইয়া দিলেন।"

ইহাতে সার্ব্বভৌম প্রভুর কথা রাখিয়া বলিতেছেন, "তুমি আর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিও না। তোমার যেরূপ ভাব, তাহাতে সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া তোমার দর্শন করা কর্ত্তব্য। শুন, গোপীনাথ, তুমি প্রত্যহ স্বামীকে আপনি লইয়া যাইয়া ঠাকুর দর্শন করাইও। গোসাঞির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি তোমার উপর দিলাম।"

প্রভু যে অতি দীনভাবে সার্ব্বভৌমকে আত্মসমর্পণ করিলেন, ইহাতে সার্ব্বভৌম পরমানন্দিত হইলেন। শুধু তাহাও নয়, তিনি ধন্ধার বিষম আবর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। ইহার তাৎপর্য্য বিবরিয়া বলিতেছি।

যখন সার্ব্বভৌম প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার তেজ, আকার, প্রকৃতি, ভাব দেখিয়া মনে নিশ্চয় করিলেন, হয় এ বস্তুটী স্বয়ং জগন্নাথ, না হয় কোন দেবতা, মনুষ্যরূপে বিচরণ করিতেছেন। মনে ভাবিলেন, এ বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি ঠিক মনুষ্যের মত নয়। ইহা ব্যতীত এই মহাভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ গাঢ় প্রেম, ইহা ত জীবে সম্ভবে না। অতএব এ বস্তুটী অন্ততঃ অতি দুর্লভ, পরম ভাগ্যে মিলিয়াছে। সার্ব্বভৌম এইরূপ মনের ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে বাড়ী আনয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু যখন তাঁহার সঙ্গীগণ আসিলেন, তখন ভাবিতেছেন, নবীন সন্ন্যাসী একজন উচ্চ শ্রেণীর সন্ন্যাসী, দেবতা নহেন, যেহেতু ইঁহার সঙ্গীগণ মনুষ্য, মনুষ্যের মত আকার প্রকার, এবং সেইরূপ কথা বলেন। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ চেতনা পাইলেন, তখন তাঁহার শরীরের তেজ লুকাইল, আর তখন তিনিও মনুষ্যের মত হইলেন। তাহার পরে স্নান করিলেন, গরুড় পক্ষীর ন্যায় সার্ব্বভৌমের সম্মুখে বসিলেন, মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করিলেন, ও অতি দীন মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিলেন। এই সমুদায় দেখিয়া, সার্ব্বভৌমের প্রথম যে চমক লাগিয়াছিল, তাহা অনেক অন্তর্হিত হইল।

আবার গোপীনাথের নিকট প্রভুর পরিচয় শুনিয়াছিলেন। সে এই যে, বস্তুটী দেবতাও নয়, কোন বিশেষ বস্তুও নয়, নদীয়ার একটী ব্রাহ্মণকুমার মাত্র। শুধু ইহাও নয়। নদীয়ার একজন সামান্য পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র, তাহারি বেটা। কাজেই প্রভুর উপর অতি বৃহৎ বস্তু বলিয়া যে ভক্তিটুকু জন্মিয়াছিল, তাহা প্রায় সমুদায় অন্তর্হিত হইল।

প্রভুর নিকট আসিয়া যখন তাঁহাকে আবার প্রণাম করিলেন, তখন একটু কষ্ট হইল। ভাবিলেন, সন্ন্যাস আশ্রমের এই একটা বড় দোষ। এ আশ্রম আশ্রয় করিলে দম্ভের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। যেহেতু সন্ন্যাসী হইলে গুরুজনও তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করেন, আর তিনিও, কেবল সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া, গুরুজনকে আশীর্ব্বাদ করিতে অধিকার পান। কিন্তু সার্ব্বভৌমের এ দুঃখ অধিকক্ষণ থাকিল না। প্রভুর বিনয় ও মধুর বাক্য শুনিয়া, সার্ব্বভৌমের মনে একটু যে কুভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা একেবারে গেল। প্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি হইল না বটে, কিন্তু ঈর্ষা ভাবের যে অঙ্কুর হইতেছিল, তাহা গেল, ও তাহার স্থানে বাৎসল্যরূপ

ভালবাসার উদয় হইল। প্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমের প্রকৃতই পুত্র-স্নেহের উদয় হইল।

তাহার পর প্রভুকে বলিতেছেন, "তুমি আর একাকী মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইয়া দর্শন করিও না। হয় গোপীনাথের কি আমার সহিত, কি আমি যে লোক দিব তাহার সহিত, জগন্নাথ দর্শন করিও।"

সার্ব্বভৌম তাহার পর গোপীনাথকে আবার বলিলেন, "ইঁহাদের বাসস্থান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাও আমি ঠাওরাইয়াছি। আমার মাসীর বাড়ী অতি নির্জ্জন স্থান, সেখানে ইঁহাদের বাসা দাও। আর জলপাত্র প্রভৃতি যাহা যাহা ইহাদের প্রয়োজন, তাহারও সংস্থান করিয়া দাও।"

প্রভু ও প্রভুর গণ সার্ব্বভৌমের মাসীর বাড়ী গমন করিলেন, এবং সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। কখন সার্ব্বভৌম প্রসাদ পাঠাইয়া দেন, কখন গোবিন্দ, জগদানন্দ, প্রভৃতি ভিক্ষা করেন।

এ গ্রন্থের প্রথমে একটি কথা লেখা আছে; পাঠক উহা স্মরণ করিবেন, কি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। কথাটি এই যে, এই গৌরাঙ্গলীলা বিচার করিলে, স্বভাবতঃ এইটিই বোধ হইবে যে, এ সমুদায় কাণ্ড হঠাৎ অর্থাৎ আপনাআপনি হইয়াছে, তাহা নহে। লীলা বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, হয় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং শ্রীভগবান; আর যদি ততদূর বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে বুঝিবেন যে, তিনি শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষরূপে চালিত, নিয়োজিত ও রক্ষিত। যাঁহারা সন্দিগ্ধচিত্ত, তাঁহাদের পক্ষে ইহার একটা মানিলেই যথেষ্ট। দেখুন, যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে যাইতেছেন, তখন, যেখানে হিন্দু ও মুসল-

মানের বিরোধের স্থান, ঠিক সেখানে, সেই সময়ে, রাজা রামচন্দ্র খাঁ আসিয়া উপস্থিত! নীলাচলের নিকটে আসিয়া, দণ্ড ভাঙ্গার ছল করিয়া, প্রভু অগ্রে একাকী জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। এখন প্রভুর নীলাচল প্রবেশের অদ্ভুত আয়োজন দেখুন। মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কেহ রোধ করিতে পারিল না। সকলে একত্রে গমন করিলে ইহার কিছুই হইত না। মূর্চ্ছিত হইলেন, সেখানে সার্ব্বভৌম দাঁড়াইয়া! তিনি তখন সেখানে কেন? তিনি না থাকিলে, জগন্নাথের সেবকগণকে রোধ করে কাহার সাধ্য? সার্ব্বভৌম না থাকিলে, জগন্নাথের দাম্ভিক সেবকগণ, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিত। তাহার পর সার্ব্বভৌমই বা এত বিচলিত কেন হইলেন? তিনি ত কিছুই মানেন না। যদি কিছু মানেন তবে আপনাকে। তিনি একটা সন্ন্যাসীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আপনার অঙ্গ দ্বারা আবরণ কেন করেন? কত সহস্র সন্ন্যাসী ত তাঁহার শিষ্য?

আবার প্রভুর লীলাকার্য্যের নিমিত্ত সার্ব্বভৌমকে প্রয়োজন, তাঁহার সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন। সার্ব্বভৌম কর্ত্তব্যে শ্রীক্ষেত্রের রাজা, তিনি ব্যতীত সেখানে কিছুই হয় না। তাই তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া। তাই তিনি, যদিও জগৎপূজ্য, তথাপি আপনার দেহ দিয়া প্রভুকে রক্ষা করিলেন, আর তাই তিনি প্রভুকে আপনি বহিয়া ও জগন্নাথের সেবকগণ দ্বারা বহাইয়া হরিনামের সহিত, আপনার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এ সমুদায় আপনা আপনি হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রভু বাসায় আগমন করিলে, গোপীনাথ বলিলেন যে, পরদিবস অতি প্রত্যুষে আসিয়া তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করাইবেন। গোপীনাথ তাহাই করিলেন ও তাহার পরে সকলে

আবার সার্ব্বভৌমের সভায় আগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রণাম করিলেন, করিলে প্রভু আবার "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুর কথা এই প্রথম শুনিলেন; শুনিয়াই তাহাদের বড় আমোদ বোধ হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, সন্ন্যাসী হইয়া বলে কিনা কৃষ্ণে মতি হউক! এটা কি পাগল, না মূর্খ? ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌমের মূঢ় শিষ্যগণ খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সার্ব্বভৌম ইহাতে লজ্জা পাইয়া প্রভুকে অন্য নির্জ্জন স্থানে লইয়া বসিলেন। প্রভুর কথাতে পড়ুয়াগণ যে হাস্য করিল, তিনি ইহা বুঝিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানিতেও পারিলেন না। সকলে নির্জ্জন স্থানে বসিলে, প্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমি শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছি। আপনি জগতের উপদেষ্টা, আমি আপনার আশ্রয় লইলাম, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। আমাকে আপনি উপদেশ করুন। দেখিবেন যেন আমি ভবকূপে না পড়ি।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তোমাকে আমি কি উপদেশ করিব? তোমার ত উপদেশের কিছু অভাব আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে ভক্তি তোমার হয়েছে, ইহা মনুষ্যের পক্ষে দুর্লভ। তবে সরল ভাবে তোমাকে একটা কথা বলি; সন্ন্যাস করিয়া তুমি ভাল কর নাই। তোমার বয়স অতি অল্প, এ বয়সে সন্ন্যাস শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। প্রথমে সংসার-সুখ সমুদায় আস্বাদন করিয়া, যখন ইন্দ্রিয়ের তেজ শিথিল হয়, তখনি সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। তাহার পরে আবার দেখ, সন্ন্যাস করিয়াছ ইহাতে গুরুজনে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। তুমি অতি সুবোধ, দেখ দেখি এ অবস্থায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা কি না?"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সার্ব্বভৌমের যে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রকে প্রণাম করিতে হইতেছে, উহা তাঁহার নিকট একেবারে ভাল লাগিতেছে না। এমন সেই রাগ শোধ দিলেন।

প্রভু বলিলেন, "আপনি আমার পরম সুহৃদ, তাই আমার যাহাতে ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন। তবে, আমি যখন সন্ন্যাস করি, তখন কৃষ্ণের জন্যে মতিচ্ছন্ন হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করি, সুতরাং এ কার্য্যের জন্যে আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।" এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম লজ্জা পাইলেন। বলিতেছেন, "তাহা হউক, তুমি অতি ভাগ্যবান, তোমার যে প্রেম দেখিলাম, ইহাতে তোমার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। তোমার ভালই হইবে।"

সার্ব্বভৌম, 'আমি তোমার ভাল করিব', ইহা না বলিয়া, 'তোমার ভালই হইবে' বলিলেন।

কিছু কাল আলাপের পর প্রভু উঠিয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য ভক্তগণও গমন করিলেন, কেবল সার্ব্বভৌম রহিলেন, আর রহিলেন গোপীনাথ ও মুকুন্দ। গোপীনাথ ও মুকুন্দে চিরদিন বড় প্রীতি। তারপর তাঁহারা তিন জনে আবার সভায় আসিলেন।

আপনারা জানিবেন যে, জগতে যত বিরোধের সৃষ্টি হয়, তাহার অধিকাংশই কেবল অনুগত জনের দোষে। দুটী নায়কের এক স্থানে নির্ব্বিবাদে বাস করা সম্ভব, কিন্তু তাঁহাদের গোঁড়াগণ তাহা পারিবে না। সার্ব্বভৌমের পড়ুয়াগণ তাঁহাকে প্রায় শ্রীভগবান্ বলিয়া মান্য করে। তাহারা বিদ্যাকে পূজা করিয়া থাকে, আর সার্ব্বভৌম বিদ্বান্ লোকের পরম পূজ্য। প্রভুর যত গণ, তাঁহারা আবার প্রভুকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সম্মান ও পূজা করেন। কিন্তু সার্ব্বভৌমের পড়ুয়াগণ প্রভুকে খ্যাপা কি মূর্খ সন্ন্যাসী ভাবে। প্রভুর গণ আবার সার্ব্বভৌমকে

একটী পণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ড ভাবেন। সার্ব্বভৌমকে দেখিলে তাঁহার শিষ্যগণ জড়সড় হন, কিন্তু প্রভুর গণ সেরূপ কিছু হয়েন না। আর প্রভুকে দেখিলে তাঁহার গণ সংজ্ঞাশূন্য হয়েন, কিন্তু সার্ব্বভৌমের প্রতি দৃক্‌পাত পর্য্যন্তও করেন না। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হয় আর কি। এতক্ষণ হয় নাই কেবল প্রভু নিতান্ত নিরীহ, ও সার্ব্বভৌম বড় পদস্থ ও গম্ভীর বলিয়া।

প্রভু উঠিয়া গমন করিলে, সার্ব্বভৌম মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "স্বামী কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন?" মুকুন্দ বলিলেন, "ভারতী সম্প্রদায়ে। ইহাঁর গুরুর নাম কেশব ভারতী, ইহাঁর নিজের নাম কৃষ্ণচৈতন্য।" সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "নামটী বেশ হয়েছে। আহা সন্ন্যাসীর প্রকৃতি কি মধুর! একেবারে বিনয়ের খনি। বলিতে কি, ইহাঁকে দেখিয়া আমার হৃদয় তরল হয়েছে। কেন কি জানি বলিতে পারি না, উহার প্রতি আমার বড় আকর্ষণ হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছি যে, ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া ইনি ভাল করেন নাই। কারণ সম্প্রদায়টা ভাল নয়। গিরি, পুরী, তীর্থ, সরস্বতী, এ সমুদায় সম্প্রদায় থাকিতে কেন নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলেন?"

গোপীনাথ বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! স্বামীর বাহ্যাপেক্ষা নাই। সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাহা যেন তেন প্রকারেণ করিয়াছেন।"

সার্ব্বভৌম। বাহ্যাপেক্ষা তুমি কাহাকে বল?

গোপীনাথ। এ সম্প্রদায় ভাল, ও সম্প্রদায় মন্দ, এ সমস্ত অসার কথা। স্বামীর এ সমুদায় অসার বিষয়ে মন নাই, কোন প্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ বিচার করিবার অবকাশ পান নাই।

সার্ব্বভৌম। তুমি ভাল বলিলে না। যখন সম্প্রদায় আশ্রয় করিতে হইবে, তখন বাছিয়া ভাল লওয়াই ত কর্ত্তব্য?

গোপীনাথ। এ সমুদায় মনের ভাব দম্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনাকে পোষণ না করাই ভাল।

সার্ব্বভৌম। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনার দোষ কি হইল? তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া আছি কেন? লোকে গৌরব করিবে, মনুষ্য এই নিমিত্তই ত সকল কার্য্য করিয়া থাকে? ও সমুদায় বালকের কথা ছাড়িয়া দাও। স্বামীকে হঠাৎ কোন অনুরোধ করা আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। তিনি তোমাদের আত্মীয়, তোমরা তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া বাধ্য কর। আমি একটী ভাল দেখিয়া ভিক্ষুক আনাইয়া পুনরায় তাঁহার সংস্কার করাইব।

এ সমস্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুন্দের হৃদয়ে শেলের মত বাজিতেছে। প্রথমতঃ সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ প্রভুকে উপেক্ষা করিয়া হাসিল; ইহাতে তোমার আমার মর্ম্মান্তিক হয়, তাঁহাদের কি হইল মনে অনুভব কর। তাঁহারা ভাবিলেন, যেমন গুরু, শিষ্যগুলিও সেইরূপ হয়েছে। তাহার পরে, সার্ব্বভৌমের প্রত্যেক কথায় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। প্রভুকে তাঁহারা শ্রীভগবান্ বলিয়া জানেন; তাঁহারা প্রভুর প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ কিরূপে সহ্য করিবেন? যদিও প্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমের স্নেহ অকৃত্রিম, কিন্তু সে তাঁহার নিজের গুণে নয়, কেবল প্রভুর প্রকৃতির গুণে। সার্ব্বভৌম প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইবার মোটে অবকাশ পাইতেছেন না। একটু ঈর্ষার অঙ্কুর হইতেছে, আর প্রভুর সরল বদন দেখিয়া, আর চিত্তমোহন বাক্য শুনিয়া, শুধু তাঁহার সেই ঈর্ষা অন্তর্হিত হইতেছে তাহা নয়, এরূপ কুপ্রবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন বলিয়া মনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। এই গোপীনাথের

দম্ভের সহিত কথা, ইহা সার্ব্বভৌমের কাছে অবশ্য ভাল লাগিতেছে না। তাঁহার এরূপ কথা জগতে কাহারও নিকট শ্রবণ করা অভ্যাস নাই। তবে যে অনেক সহিয়া রহিয়াছেন, সে কেবল প্রভুর গুণে। তা না হইলে গোপীনাথ আরো রূঢ় বাক্য শুনিতেন। কিন্তু তবু গোপীনাথের কথায় সার্ব্বভৌমের ক্রোধ হইতেছে, ও তাঁহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। গোপীনাথকে আঘাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই। তবে প্রভুকে আঘাত করিয়া অতি অনায়াসে তাঁহাকে ব্যথা দিতে পারেন। তাই সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "আহা কি সুন্দর এই সন্ন্যাসীটী। কিন্তু ইহাঁর কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছেন, ইহাতে ইন্দ্রিয় বারণ কিরূপে হইবে? আমি ইহাঁর যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিব। ইহাঁকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব। এইরূপে যাহাতে ইহাঁর ধর্ম্ম থাকে, আমি তাহাই করিব।"

গোপীনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাহ্য হারাইলেন। তিনি প্রভুর আগমন অবধি প্রাণপণে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা উঠান নাই, উঠাইতেও দেন নাই। সেই তিনি, সার্ব্বভৌমের সাক্ষাতে, আর সার্ব্বভৌমের সভায় শিষ্যগণ মাঝে, একেবারে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। গোপীনাথ রুক্ষভাবে বলিতেছেন, "ওখানে পাণ্ডিত্য চলিবে না। তুমি যাঁহার ভাল করিবে বলিয়া বারম্বার ঔদার্য্য দেখাইতেছ, তিনি তোমার সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না। তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্।"

যেমন কোন নির্জ্জন সরোবরে বন্দুকের শব্দ করিলে বিবিধ পক্ষী বিবিধ স্বর করিয়া উড়িতে থাকে, সেইরূপ গোপীনাথের বাক্যে সার্ব্বভৌমের সভায় নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি হইল। সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি বলিয়া হঠাৎ কিছু বলিলেন

না। একটু ঠাহরিয়া বলেন, তাহার অবকাশও পাইলেন না। যেহেতু তাঁহার শিষ্যগণ চারিদিক হইতে "কি প্রমাণ?" "কি প্রমাণ?" বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

গোপীনাথ তখনি বুঝিলেন কাজ ভাল করেন নাই, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। আপনি বিচলিত হইয়া যে ঝড় উঠাইয়াছেন, তাহা নিবারণ করিবার উপায় হঠাৎ স্থির করিতে পারিলেন না। তবে শিষ্যগণের সহিত মারামারি করিবেন না, ইহা তখনি স্থির করিলেন। শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও করিলেন না। সার্ব্বভৌমের পানে চাহিলেন, চাহিয়া উত্তর করিলেন।

সার্ব্বভৌমও দেখিলেন যে, কাজ ভাল হয় নাই। নবীন সন্ন্যাসীটী তাঁহার প্রিয়বস্তু, বাড়ীতে অতিথি ও নির্দ্দোষী। তাঁহাকে লইয়া যে তাঁহার শিষ্যগণ চর্চ্চা করিবে, ইহা তাঁহার অভিমত হইতে পারে না। তিনি সেখানে উপস্থিত; তিনি সেখানে থাকিতে শিষ্যগণ বিচার করিবে, তাহাও হইতে পারে না। তাহার পরে গোপীনাথ তাঁহার ভগিনীপতি; তাঁহার ভগিনীপতির সহিত যে তাঁহার শিষ্যগণ সমান হইয়া বিচার করিবে, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নয়। স্থতরাং তিনি, শিষ্যগণকে লক্ষ্য না করিয়া, গোপীনাথের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন।

গোপীনাথের উচিত ছিল যে, তখনি সার্ব্বভৌমের নিকট ক্ষমা চাহিয়া চুপ করা। তিনি তাহাই করিতেন; কিন্তু তিনি তখন একটু বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ঐ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "ইহা লইয়া তোমার সহিত বিচার করিতে আমার ইচ্ছা নাই। তবে ভট্টাচার্য্য, তুমি উহাঁর মহিমা জান না তাই বলিলাম। তুমিও সত্বর জানিবে যে,

ও বস্তুটী কি।" কিন্তু শিষ্যগণ চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সার্ব্বভৌমকে উত্তর দিবার অবকাশ তাহারা দিল না, "কি প্রমাণ?" "কি প্রমাণ?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ তখনও চুপ করিলে পারিতেন, কিন্তু চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হওয়ায় তাহা পারিলেন না। সার্ব্বভৌমের দিকে চাহিয়া শিষ্যগণের কথার উত্তর দিলেন। বলিতেছেন, "প্রমাণ এই যে, তাঁহাতে শ্রীভগবানের সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।"

শিষ্যগণ আবার সার্ব্বভৌমকে উত্তর করিতে দিল না, অমনি বলিয়া উঠিল, "এই সন্ন্যাসী শ্রীভগবান্, কি অনুমানে সাধিবে?" গোপীনাথ আবার উত্তর করিলেন; কিন্তু সেইরূপে সার্ব্বভৌমের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "ঈশ্বর-তত্ত্ব অনুমানে জ্ঞান হয় না। ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবার এক মাত্র উপায় ঈশ্বর-কৃপা।" তাহার পরে শিষ্যগণকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! পৃথিবীতে তোমার মত পণ্ডিত নাই, তুমি জগতের গুরু, শাস্ত্রে তোমার দ্বিতীয় নাই। কিন্তু তুমি যে বলে বলীয়ান, ঈশ্বর-জ্ঞান সে বলের অধীন নয়। যেহেতু তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা নাই।"

সার্ব্বভৌম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি নৈয়ায়িক। গোপীনাথের তর্ক করিতে ভুল হইল, তিনি কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন? তাহা কি কখন হইতে পারে? অমনি বলিতেছেন, "তোমাতে যে ঈশ্বর-কৃপা আছে তাহার প্রমাণ?"

গোপীনাথ তখন ঠকিলেন, ঠকিয়া কতক কান্দ কান্দ হইয়া, কতক কোপের সহিত বলিতেছেন, "তুমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছ তাহাতেও তুমি প্রভুকে চিনিতে পারিলে না, কাজেই বলি যে তোমাতে ঈশ্বর-কৃপার লেশ মাত্র নাই।"

সার্ব্বভৌম গোপীনাথের ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইলেন। কুলীন ভগিনীপতি, উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ী আসিয়াছেন। যদি কোপ করিয়া চলিয়া যান, তাহাও পারেন। তাই গোপীনাথকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, "ভাই, ক্রোধ করিও না। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে বলি। শাস্ত্রে কলিযুগে অবতারের উল্লেখ নাই। তাই শ্রীভগবানের নাম ত্রিযুগ হইয়াছে। তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক, সন্ন্যাসীটী পরম ভাগবত, কিন্তু তিনি ভগবান্ এ কথা শাস্ত্রে পাই না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হয়েছেন, শ্রীনবদ্বীপে এ কথা প্রথমে উঠিলেই বিপক্ষ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র দেখিতে চাহিলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাই বলিতে লাগিলেন। কাজেই গৌরভক্তগণ দেখিলেন যে, সাধারণ লোকের নিকট গৌর-অবতার প্রমাণ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োজন, তাই গৌরভক্ত পণ্ডিতগণ, শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শাস্ত্র হইতে তাঁহারা নানা প্রমাণ বাহির করিলেন। যখন শ্রীনিমাই সন্ন্যাসী হইলেন, তখন আবার বিপক্ষ পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীভগবান সন্ন্যাসী হইবেন তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে? সে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যাহা মহাভারতে আছে, বাহির করিতেও ভক্তগণ বাধ্য হইলেন।

তখন পণ্ডিতগণ ন্যায় ও শাস্ত্র লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। যে কোন কথা উপস্থিত হইলেই পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের প্রমাণ চাহিতেন। সুবিধার মধ্যে শাস্ত্রের অবধি ছিল না, কাজেই প্রমাণেরও অবধি ছিল না। অতএব শাস্ত্রের এত বড় শাসন সত্ত্বেও লোকের সংসার, যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে বড় বাধা হইত না। ন্যায়ের চর্চ্চাতে আবার সেইরূপ লোকের "কি প্রমাণ?" ব্যাধি উপস্থিত হইল। প্রভাতে এক পড়ুয়া আর এক পড়ুয়াকে উঠাইতেছেন, "উঠ প্রভাত হইয়াছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া চক্ষু

মেলিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাত হইয়াছে তাহার কি প্রমাণ?" জাগরিত পড়ুয়া বলিলেন, "যেহেতু আলো হইয়াছে।" নিদ্রিত পড়ুয়া বলিলেন, "আলো হইলেই প্রভাত হয় না, গৃহ দাহ হইলেও রজনীযোগে আলো হয়।" এইরূপে দুই প্রহর পর্য্যন্ত বিচার হইল। শেষে ক্লান্ত হইয়া উভয়ে ক্ষান্ত দিলেন। এই গেল সমাজের গতি।

এখন বিচার করুন যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যখন কথা উঠিল যে, নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহার পূর্ব্বে অবতার বলিয়া কথা আদৌ জগতে ছিল না। এখন অবতারে বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে, কিন্তু তখন শ্রীভগবান মনুষ্যসমাজে আসিয়াছেন, এরূপ কথা শুনিলে স্বভাবতঃ সর্ব্বদেশে, সকল স্থানে হাসি পাইবার কথা ছিল। কিন্তু গৌর-অবতারের কথা যখন ও যে স্থানে উঠিল, সে সময়ের ও সে নগরের অবস্থা মনে করুন। সে সময়ে সে স্থানে প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে ভদ্রলোকে ইহাও স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং হে সুবোধ পণ্ডিত! কৃপাময় পাঠক! এখন বিবেচনা করুন যে, এইরূপ সময়ে ও সমাজে, শ্রীগৌরাঙ্গের জীবের নিকট শ্রীভগবান বলিয়া সম্মান লইতে, কত শক্তি ও আয়োজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করিতেন, ইহা মুখে নয়, একেবারে হৃদয়ের সহিত। তাহা না হইলে যে সমুদায় মহান্তগণ পরকালের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলবাসী হয়েছেন, তাঁহারা হিন্দু হইয়া তাঁহার শ্রীপদে তুলসী, চন্দন ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে পারিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অবিশ্বাস থাকিলে শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে গঙ্গাজল তুলসী দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করা একেবারে অসম্ভব হইত।

সেই সময়ের ও সেই সমাজের কথা এই গ্রন্থের প্রারম্ভে কিছু বর্ণনা করিয়াছি। সেই স্থলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম বস্তু কি তাহাও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি। যেখানে বিচার ও প্রমাণ ব্যতীত প্রভাত হইয়াছে কি না, লোকে ইহা গ্রহণ করিত না, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি এই সমাজের দুগ্ধফেণ, কি প্রকাশ, কি শক্তি। তাঁহার সহিত শ্রীপ্রভুর রঙ্গ, অতএব অতিশয় রহস্যজনক। সেই নিমিত্ত উহা আমি একটু বিস্তার করিয়া লিখিলাম। পাঠকমহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সতেজ বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা আপনাদের ও সার্ব্বভৌমের মনের ভাবের অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন, সেই নিমিত্তই আমি এ অধ্যায়ে ঐ সম্বন্ধে একটু বিস্তার করিলাম।

শ্রীগোপীনাথ আবার চঞ্চল হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি পণ্ডিত-শিরোমণি হইয়া কিরূপে বলিতেছ যে কলিযুগে অবতারের কথা শাস্ত্রে নাই? তবে এ সমুদায় শ্লোকের অর্থ কি?" ইহাই বলিয়া শ্রীগোপীনাথ, প্রভুর অবতার সম্বন্ধে যে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তখন সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা একে একে বলিতে লাগিলেন। এ সমুদায় শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ নীরস বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। প্রথমতঃ আমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই; দ্বিতীয়তঃ গোপীনাথ যাহা সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন তাহা ঠিক কথা, অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রমাণে শ্রীগৌরচন্দ্রকে যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁহার বিশ্বাস না করাই ভাল।

গোপীনাথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিতে থাকিলে, সার্ব্বভৌম তাঁহার প্রতিপক্ষ করিতে পারিতেন; করিলেও হয়ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতের সহিত গোপীনাথ পারিয়া উঠিতেন না। কিন্তু সার্ব্বভৌম অনেক কারণে সহিয়া গেলেন, আর তর্ক উঠাইলেন না। বলিলেন, "ও সমুদয় এখন থাকুক। তুমি এখন তোমার শ্রীভগবানকে তাঁহার

গণ সহ আমার হইয়া নিমন্ত্রণ কর গিয়া। তবে আমাকে শিক্ষা দেওয়া—তাহা পরে দিলেই পারিবে।”

এইরূপ কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম সমুদায় মনের বেগ ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ তোমার শ্রীভগবানকে গণসহ নিমন্ত্রণ কর, ইহা হাসিবার কথা। শ্রীভগবানের আবার “গণ” কে? আর তাঁহাকে মনুষ্যে নিমন্ত্রণ করিবে তাহাই বা কি? আবার সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে উপরের কথা গুলিতে ইহাও বলিলেন যে, শ্রীভগবানকে নিমন্ত্রণ করা, ইহাও যেরূপ হাস্যকর কথা, তুমি গোপীনাথ আমি সার্ব্বভৌম, তোমার আমাকে শিক্ষা দিতে আসা, সেও সেইরূপ হাস্যকর।

এই কথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের সভা ত্যাগ করিয়া প্রভুর ওখানে চলিলেন। এখন সার্ব্বভৌমের অবস্থা শ্রবণ করুন। তিনি দিগ্বিজয়ী, জয় করা তাঁহার ব্যবসায়, পরমার্থ ও আনন্দ। এইরূপে অন্যকে জয় করিয়া তাঁহার কয়েকটি প্রবৃত্তি বড় প্রবল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্যের উপর আধিপত্য করা একটি। তিনি যেখানে থাকিবেন সেখানকার কর্ত্তা তিনি, এরূপ অবস্থা না হইলে তাঁহার সেস্থানে থাকিবার সম্ভাবনা হইত না। এ অবস্থার বিপরীতও কখন হয় নাই, কারণ তাঁহার সমকক্ষ লোক তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না। অতএব তাঁহার কোথাও থাকিতে অসুবিধা হয় নাই। এখন তাঁহার নিজ স্থানে, এমন কি তাঁহার নিজ ভবনে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু নয়, তাঁহার বড়, স্বয়ং ভগবানের ন্যায় পূজিত। সার্ব্বভৌমের এ অবস্থা মনে মনে ভাল লাগিতেছে না।

আবার তাঁহার পক্ষে নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি ঈর্ষা ভাব অতি গর্হনীয় কার্য্য তাহাও মনে বুঝিতেছেন। যখন মনে মনে বুঝিতেছেন যে, নবীন সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার একটু ঈর্ষা জন্মিয়াছে, তখনি আপনাকে

ধিক্কার দিতেছেন। কাজেই আপনার মনের যে ঈর্ষা, উহা আপনার মনের নিকট আপনি গোপন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, "জগন্নাথ মিশ্রের পুত্রের উপর আমার ঈর্ষা, তাহা হইতেই পারে না। তাঁহার উপর মাঝে মাঝে একটু ক্রোধ হইতেছিল, কিন্তু তাহাতে আমারও দোষ নাই, তাঁহারও দোষ নাই; সে দোষ তাঁহার গোঁড়াগণের। তাহারা বলে কি না তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান! এ কথা শুনিলে সহজে একটা বিরক্তি হয়, কিন্তু এ সামান্য কথা লইয়া আমার মত লোকের চিত্তচাঞ্চল্য ভাল দেখায় না। আমার চিত্তের চাঞ্চল্যও হয় নাই, সন্ন্যাসীর উপর কোন প্রকার ঈর্ষাও নাই। তবে সন্ন্যাসীটি অপরূপ বস্তু, আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমিও বলিয়াছি যে তাহার যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিব। এখন পাঁচজন মূর্খতে যদি তাহাকে "তুমি ভগবান্" বলিয়া পূজা করিতে থাকে, তবে আর তাহার চিত্ত কতদিন স্থির থাকিবে? এ অপরূপ বস্তুটি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। আপনিও ক্রমে ভ্রমকূপে পড়িয়া আপনাকে ভগবান ভাবিবে। অতএব সন্ন্যাসীকে কেহ ভগবান না বলে তাহার উপায় করিতে হইবে। আবার গোপীনাথ প্রভৃতি যে, সন্ন্যাসীকে ভগবান বলে, তাহাতে তাহাদেরই বা লাভ কি? শাস্ত্রে দেখি যে, জীবকে শ্রীভগবান বুদ্ধি করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব গোপীনাথ প্রভৃতি তাহাদের নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে, এরূপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমি তাহা দিব না। গোঁড়াগণ যে সন্ন্যাসীকে শ্রীভগবান বলিয়া উন্মত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহা হইলে সন্ন্যাসীরও ভাল, তাহার অনুগতগণেরও ভাল, আমারও কর্ত্তব্য করা হয়, যেহেতু ইহারা সকলে আমার আশ্রিত। অতএব এ সন্ন্যাসীটী ভগবান, এ কথাটি আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব। কেন দিব? আমি সন্ন্যাসীর উপর ঈর্ষান্বিত

বলিয়া নয়। তবে কেন দিব? না, আমার কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া, আর উহা করিলে সকলেরই ভাল।" এই সমুদায় ভাবিয়া সার্ব্বভৌম আপনার মনকে বুঝাইলেন যে তাঁহার সন্ন্যাসীর উপর ঈর্ষা নাই, আর তিনি যে সন্ন্যাসীর ভগবত্তা উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এ কেবল সাধু অভিপ্রায়ে, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে নহে। কিন্তু সরল কথায় বলিতে, তিনি যে সন্ন্যাসীকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে, তিনি সন্ন্যাসীর আধিপত্য সহিতে পারিতেছেন না। সার্ব্বভৌম সেই জন্য সন্ন্যাসীর ভগবত্তা কিরূপে উড়াইয়া দিবেন তাহার উপায় মনে স্থির করিলেন। সে উপায় কি পরে বলিতেছি।

এ দিকে মুকুন্দ ও গোপীনাথ প্রভুর ওখানে আসিলেন। পরে গোপীনাথ সার্ব্বভৌম প্রেরিত অতি অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ প্রভুকে ও ভক্তগণকে ভুঞ্জাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পরে প্রভু ও ভক্তগণ বসিলেন। তখন গোপীনাথ করযোড়ে প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু, ভট্টাচার্য্য আর এক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও আপনার নামটী ভাল, কিন্তু আপনার সম্প্রদায় ভাল নয়। অতএব তিনি ভাল একজন ভিক্ষুক আনাইয়া আপনার পুনঃসংস্কার করাইবেন। তাঁহার বড় ভয় হইয়াছিল যে, আপনার অল্প বয়স, কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ও ধর্ম্ম থাকিবে। তাহার উপায় তিনি ঠাহরিয়াছেন। তিনি আপনাকে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন ও স্বয়ং ক্লেশ করিয়া নিয়ত আপনাকে বেদ শ্রবণ করাইবেন।"

গোপীনাথ এ সমস্ত কথা এরূপভাবে বলিলেন, যাহা শুনিয়া প্রভুর রাগ হয়। কিন্তু তাঁহার কিছুই হইল না। প্রভুর মুখে বিরক্তি কি কোন মন্দ ভাবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না। বরং এ কথা শুনিয়া প্রভু যেন বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, "বটে বটে, তাঁহার উপযুক্ত কথাই

হয়েছে। তাঁহার আমার উপর বাৎসল্য ভাব ও বিস্তর অনুগ্রহ; তিনি আমার মঙ্গল সর্ব্বদা কামনা করিতেছেন। আমি এ কথা শুনিয়া বড়ই কৃতার্থ হইলাম।”

সভাসদ্‌গণের কাহারও এ কথা ভাল লাগিল না। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, প্রভু ভট্টাচার্য্যের দম্ভের কথা শুনিয়া অন্ততঃ মনে মনে ক্রোধ করিবেন; কিন্তু তাঁহার মুখে, কি কথায়, ক্রোধের লেশমাত্রও উপলক্ষিত হইল না। বরং যেন সার্ব্বভৌমের উপর বড় খুসী। কাজেই ভক্তগণের তখন প্রভুকে বুঝাইয়া, যাহাতে সার্ব্বভৌমের উপর তাঁহার রাগ হয়, তাহার উপায় করিতে হইল। সেই অভিপ্রায়ে মুকুন্দ বলিতেছেন, “তুমি ভট্টাচার্য্যের এ সমুদায় অভিপ্রায় বিষম অনুগ্রহ ভাবিতে পার, কিন্তু তাঁহার কথা সমুদায় তোমার ভক্তগণের গাত্রে অগ্নিকণার ন্যায় লাগিয়াছে। বিশেষতঃ গোপীনাথ বড় দুঃখ পাইয়াছেন, যেহেতু ভট্টাচার্য্য তাঁহার কুটুম্ব। এমন কি, গোপীনাথ দুঃখে অদ্য উপবাসী আছেন।”

এ কথা শুনিয়া প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গোপীনাথের দিকে চাহিলেন; চাহিয়া বলিতেছেন, “গোপীনাথ, সে কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয়, স্নেহ ও বাৎসল্যে, আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা তিনি যেরূপ বুঝেন, সেইরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে তুমি দুঃখ পাও কেন?”

গোপীনাথ তখন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বলিতেছেন, “সার্ব্বভৌম আমার কুটুম্ব। তিনি তোমাকে কথায় কথায় অবজ্ঞা করিয়া কথা বলেন, আমি ইহা কিরূপে সহ্য করিব?

গোপীনাথ কহে পুন সজল নয়ন।
ভট্টাচার্য্য বাক্য হইল শেলের সমান॥

মোর বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ।
সেই শেল তুমি প্রভু উদ্ধারো আপন॥
তবে সে করিব আমি জীবন ধারণ॥

চন্দ্রোদয় নাটক।

গোপীনাথের প্রার্থনা অতি অল্প,—না? জগতের যে সর্ব্ব-প্রধান নৈয়ায়িক, প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করুন, তাহা হইলে তিনি অন্ন জল খাইবেন, প্রাণ রাখিবেন, নতুবা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন! প্রভুর কাণ্ডও এইরূপ অবুঝ ভক্তগণ লইয়া! করেন কি? শ্রীভগবানের সংসারই অবুঝ ভক্ত লইয়া, তাহাদের কথা না শুনিলে তাঁহার সংসার থাকে না। প্রভু বলিতেছেন, "দামোদর! তুমি গোপীনাথকে লইয়া যাও, যাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করাও।" তাহার পরে গোপীনাথের প্রতি চাহিলেন, একটু হাঁসিলেন, হাঁসিয়া বলিলেন, "তুমি ভক্ত, শ্রীজগন্নাথ বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি অবশ্য তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যাও, এখন প্রসাদ গ্রহণ কর গিয়া।"

এই কথা প্রভু যে মাত্র বলিলেন, অমনি ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা জানেন প্রভুর শক্তির সীমা নাই, ও তাঁহার বাক্য অখণ্ডনীয়। তাঁহারা বুঝিলেন যে, সার্ব্বভৌমের সৌভাগ্যচন্দ্র উদয় হইতে আর বিলম্ব নাই। গোপীনাথ অমনি আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া, প্রভুকে প্রণাম করিয়া, প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিলেন।

এখন এই দুই জনের দুই কথা মনে করুন। শ্রীনবীন সন্ন্যাসী ও শ্রীসার্ব্বভৌম, উভয়েই শক্তিধর পুরুষ। উভয়ে উভয়কে পদতলে আনিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। যুদ্ধটীতে বিশেষ রস আছে। যখন দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ হয়, তখন তাহা ক্ষুদ্র লোকে জ্ঞানহারা হইয়া দাঁড়াইয়া দেখে।

পাঠক মহাশয়, আপনার নিকট আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। প্রশ্ন এই যে, গুরু হওয়া ভাল, না শিষ্য হওয়া ভাল? যদি বল শিষ্য হওয়া ভাল, কিন্তু দেখিবে জগতে সকলেই গুরু হইতে চাহে, শিষ্য হইতে কেহ চাহে না। এখন গুরু ও শিষ্য উভয়ের কার্য্য দেখুন। গুরু দান করেন, আর শিষ্য গ্রহণ করেন। গুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় না, শিষ্যের সমুদায় লাভ। এমত স্থলে, শিষ্য হওয়াতে লাভ আছে, কিন্তু দেখিবেন জগতে সকলেই গুরু হইবার বাসনা করিতেছে।

দুই জনে দেখা হইল। এক জন বলিলেন, তুমি আমার নিকট শিক্ষা কর। অন্য জন বলিলেন, তাহা নয়, তুমি আমার কাছে কর। এমত স্থলে যে সুবোধ সে শিখাইতে না গিয়া শিখিতে স্বীকার করে। কারণ তাহার যাহা আছে তাহা ত আছেই, আর যদি কিছু নূতন পায়, তবে তাহা ছাড়িবে কেন?

এই যে আমি গুরু হইব, আমি অন্যকে শিক্ষা দিব, আমি অন্যের নিকট শিখিব না, এই কুপ্রবৃত্তিতে জগতের জীব নষ্ট হইল। যদি কিছু গ্রহণ করিতে চাও, তবে দীন হইয়া আঁচল পাত। যে মাত্র ইহা করিতে শিখিবে, সেই তোমার প্রতি শ্রীভগবানের করুণা হইবে। বিবেচনা করিতে গেলে, তুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই। এক মুহূর্ত্ত পরে কি হইবে তুমি বলিতে পার না। ত্রিতলে থাকিয়া, সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াও তোমার নিশ্চিন্ততা নাই। সেখানে তোমার অভিমান কেন আইসে? শ্রীভগবান তাই জীবের আঁচল পাতিবার অধিকার দিয়াছেন; আঁচল পাতিলেই, এ জগতে সরল মনে যাহা চাও তাহাই পাওয়া যায়।

এই আঁচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দম্ভ ও অভিমান। "আমি উহার নিকট কেন খর্ব্ব হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিব," এই প্রকার প্রায়

জীব মাত্রেরই ভাব। ঐ ব্যক্তি আমার পদতলে আস্থক, আমি উহার অধীন হইব না। জীবগণে অন্যকে পদতলে আনিবে, অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, এই সাধ মিটাইবার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছে। আমি গুরু হইব, ও ব্যক্তি আমার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিবে। গুরুগিরির এই স্থখ, আর এই সামান্য স্থখের নিমিত্ত জীব অনায়াসে পরম লাভ ত্যাগ করিতেছে।

সার্ব্বভৌম যখন প্রথম নবীন সন্ন্যাসীর মহাভাব দেখিলেন, তখন এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। তারপর প্রভুর মহাভাব দেখিয়া ভাবিলেন, ত্রিজগতের মধ্যে এই ব্যক্তিই ভাগ্যবান। তখন আপনার বিদ্যাবুদ্ধি অতি নিস্ফল ধন বলিয়া বোধ করিলেন। তাঁহার যে বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাহা আর যাইবে না। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর যে ভাব তাহা তাঁহার নাই। সে যে পরম ধন সন্দেহ নাই, সেরূপ বোধ না হইলে তিনি তাঁহাকে অত যত্ন করিয়া বাড়ী আনিতেন না। সার্ব্বভৌমের কর্ত্তব্য ছিল যে, কৃষ্ণ প্রেম-রূপ মহাভাব যে পরম ধন, যাহা তাঁহার নাই, তাহাই যদি পারেন আদায় করুন। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি সেদিকে গেল না। তিনি লইবেন না, তিনি দিবেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লইবেন না, তিনি তাঁহার নাস্তিককতা-রূপ ছাইভস্ম প্রভুকে দিবেন। কেন? কারণ দিলে তিনি গুরু হইলেন, আর আধিপত্যের স্থখভোগী হইবেন। এই অতি তুচ্ছ কুপ্রবৃত্তির তৃপ্তির নিমিত্ত তিনি পরম ধন অবহেলায় ছাড়িলেন। তাই বলি, গুরু হইব এই লোভে জীব ছারেখারে গেল।

এই যে পুরুষ ভাব, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মপক্ষে একেবারে বিষ। তাঁহার দাসেরা বলেন যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল একজন, আর সেই পুরুষ তিনি—কানাইলাল। আর সকলেই প্রকৃতি। আর সকলকেই

গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা পুরুষ হইতে চাহেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। অতএব প্রকৃতির যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ গ্রহণ করা, তাহাই কর ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার কথা। তুমি প্রকৃতি হও, পুরুষ এ অভিমান ছাড়িয়া দাও। পুরুষ এ অভিমান করিলে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে পারিবে না। সেখানে পুরুষ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরুষের প্রকৃতি অনুকরণ করে, সে যাইতে পারে না।

সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য কামনা করেন। ঐশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য কোন মূল্যবান সম্পত্তি যে ত্রিজগতে আছে, তাহা তিনি জানেন না। তিনি আপনি বড় হইবেন, বড় হইয়া অন্যের মস্তকে পদ দিবেন, এই তাঁহার চরম আশা। কাজেই তিনি প্রভুকে শিক্ষা দিতে চলিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়, আপনি যদি বৃদ্ধি পাইতে চাহেন, তবে প্রকৃতি হউন। আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে প্রভুর আজ্ঞা বলিতেছি। তাঁহার শ্রীমুখের শ্লোক শ্রবণ করুন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

প্রভু বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্ত্তনে অধিকার পায়, যে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন ভাব ধরিয়া, আপনি অপমান লইয়া অন্যকে মান দেয়। অতএব পাঠক, জীব মাত্রকে মনে মনে তোমার গুরু ভাবিয়া শ্রদ্ধা করিও। কারণ এমন জীব নাই, যার কাছে তুমি কিছু না কিছু শিখিতে না পার। আপনি নীচ হইয়া অন্যকে মান দাও, ইহাতে তোমার কত লাভ হইবে তাহা বলিতে পারি না। প্রথমতঃ তোমার মন কোমল হইবে। দ্বিতীয়তঃ তুমি হৃদয়ে সুখ পাইবে, অন্যের হৃদয়ে সুখ দিবে। তৃতীয়তঃ তুমি ক্রমে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে। আর চতুর্থতঃ তুমি কি শুন নাই যে, তিনি

"দীন দয়ার্দ্র নাথ', অর্থাৎ দীনজন দর্শনে শ্রীভগবানের পদ্ম-চক্ষু করুণার জলে ডুবিয়া যায়?

তবে কি অন্যকে শিক্ষা দিবে না? তুমি দীন ভাব অবলম্বনে যেরূপ শিক্ষা দিতে পারিবে, গুরুভাবে তাহা পারিবে না। তুমি প্রতিষ্ঠা লোভ ত্যাগ করিয়া শিক্ষা দিলে তাহার ফল সদ্য উদয় হইবে। এখন বিনয়ের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ, ও দম্ভের পর্ব্বত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংঘর্ষণে, কি ফলোৎপত্তি হইল শ্রবণ করুন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন, তাঁহার এই সংকল্প। তাঁহার এই কার্য্যের সহায় এই কয়েকটী উপকরণ, যথা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অগাধ শাস্ত্রবিদ্যা, শীর্ষস্থানীয় পদ-মর্য্যদা, ও তীব্র শাসন-বাক্য। সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর দেখা হইল, ও দুই জনে নিভৃতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রথমতঃ আপনার নিস্বার্থতা প্রমাণ করিলেন। বলিলেন, "স্বামী, তুমি আমার এক গ্রামস্থ, বন্ধুতনয়, ও পরম গুণে ভূষিত। তোমাতে সহজে আমার চিত্ত ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত আমি তোমাকে গুটী কয়েক কথা বলিতে বরাবর ইচ্ছা করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য বিচার করিয়া তুমি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবা।

এ স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। সার্ব্বভৌম যতই দাম্ভিক ও পদস্থ হউন, প্রভুর নিকট আসিলেই একটু নম্র হইতে বাধ্য হয়েন। কেন তাহা বুঝিতে পারেন না; তবে ইহা বুঝিতে পারেন যে, পরোক্ষে তাঁহার যতখানি সাহস, প্রভুর নিকট আইলে উহার সমুদায় থাকে না।

সার্ব্বভৌম এক ঠাকুরকে উপাসনা করেন, সে বিদ্যাবুদ্ধি। প্রভুর কতদূর বিদ্যা জানেন না, কতটুকু বুদ্ধি তাহাও জানেন না। কিন্তু যদিও প্রভুর বিদ্যাবুদ্ধির সীমা জানেন না, তবু সার্ব্বভৌমের এ বিশ্বাস অটল রূপে রহিয়াছে যে, বালক সন্ন্যাসী আর কোন ক্রমে তাহার ন্যায়

পণ্ডিতের সমকক্ষ হইবেন না। ইহা তাঁহার মজ্জাগত বিশ্বাস। কিন্তু তবু সেই বালক-সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেই একটু স্তম্ভিত হয়েন, আর চেষ্টা করিয়াও আপনার সেই সহজ স্বচ্ছন্দতা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করিতে পারেন না। সার্ব্বভৌম সে দিবস সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন, আর প্রভুর নিকট নত হইবেন না। সেই নিমিত্ত রুক্ষ কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবে, কিন্তু আমি তোমার সমুদায় কার্য্য শাস্ত্রসম্মত কি ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি না। তুমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস লইয়াছ, উহা ভাল কর নাই; কিন্তু সে কথা বলিয়া আর ফল নাই। তোমার যে ভক্তি উদয় হইয়াছে উহা দুর্লভ, কিন্তু যদি তুমি ভাবুকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তবে সন্ন্যাস আশ্রম কেন গ্রহণ করিলে? সন্ন্যাসীর পক্ষে নর্ত্তন গায়ন অতি দূষ্য কার্য্য, কিন্তু তোমার সেই হইল ভজন সাধন! তোমার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় বশে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত নর্ত্তন ও গায়নে, কিরূপে ইহাতে শক্ত হইবে?

শ্রীনিমাই তখন করযোড়ে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি অজ্ঞ বালক, ভাল মন্দ বুঝি না, আর সেই নিমিত্ত আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি আমার এই দেহ আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আমার যাহাতে মঙ্গল হয় আপনি তাহাই করুন।'

সার্ব্বভৌম এই কথায় পরম পুলকিত হইলেন। যদি প্রভু বলিতেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি অন্ধ, দাম্ভিক ও বৃথা রস লইয়া আছ। আমার নিকট অমূল্য ধন আছে, আর আমি উহা বিনা বিনিময়ে তোমাকে দিতে আসিয়াছি, তবে ভট্টাচার্য্য মহা ক্রুদ্ধ হইতেন। এই জীবের ধর্ম্ম। শ্রীপ্রভু যে তাহা না বলিয়া বলিলেন, "তুমি বড় আমি ছোট",

তাই এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। হে প্রতিষ্ঠা-লোভ! তোমাকে ধন্য!

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তুমি অতি সুপাত্র, তাই তোমার গুণে তোমার প্রতি আমার চিত্ত এইরূপে ধাবিত হইতেছে। তুমি যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লইয়াছ, ইহা ভাবুকের ধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক বড়। অতএব আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইব। সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম বেদ শ্রবণ' তুমি উহা শ্রবণ কর; ক্রমে তোমার জ্ঞান স্ফুরিত হইবে, ও ইন্দ্রিয় দমন-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, আমি তোমাকে প্রত্যহ অপরাহ্নে বেদ শ্রবণ করাইব।"

প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা। আমি অপরাহ্নে আপনার নিকট বেদ শ্রবণ করিব।" পর দিবস শ্রীমন্দিরে প্রভু ও সার্ব্বভৌম মিলিত হইলেন। সেখান হইতে দুইজনে সার্ব্বভৌমের বাড়ী আইলেন। দুই জনে নিভৃত স্থানে বসিলেন,—প্রভু এক আসনে, সার্ব্বভৌম অপর আসনে। সার্ব্বভৌম বেদ খুলিয়া বসিলেন, প্রভু শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সার্ব্ব-ভৌমের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল; তিনি তাঁহার যে স্থান তাহা পাইলেন। তিনি গুরু, চিরদিন গুরু হইয়া আসিয়াছেন, তবু গুরুগিরির পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও আপনি বাছিয়া গুরুর আসন লইলেন, লইয়া আসন জুড়িয়া বসিলেন, বসিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এ দিকে আবার সেই আসন ত্যাগ না করিলে তাঁহার মঙ্গল নাই। তাঁহার প্রকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে, অর্থাৎ গ্রহণ করিবার শক্তি পাইতে হইবে, তবে প্রেম কি ভক্তির বীজ পাইবেন। সার্ব্বভৌম আসন জুড়িয়া বসিলেন। প্রভুর তাঁহাকে কৃপা করিতে হইলে, অগ্রে সেই আসন হইতে তাঁহাকে ছাড়াইতে হইবে।

সার্ব্বভৌম বেদপাঠ ও তাহার ব্যাখা করিতে লাগিলেন। প্রভু মনোনিবেশপূর্ব্বক এক চিত্ত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রভু হাঁ কি না, ভাল কি মন্দ, কিছুই বলিলেন না। এমন কি, একটী কথাও বলিলেন না। তাহাও নয়, বেদ শ্রবণে তাঁহার মনে কিরূপ খেলা খেলিতেছে, তাহার চিহ্ন মাত্রও বদনে দেখিতে দিলেন না।

কিন্তু তাঁহার মনে মনে কি খেলিতেছে? প্রভুর তখন ভক্তভাব। কৃষ্ণনাম শুনিলে তিনি প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়েন। এই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা। কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কথা আইসে না, কর্ণে তিনি অন্য কথা শ্রবণ করেন না, হৃদয়ে তাঁহার অন্য কথার স্থান নাই। কিন্তু সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন যে, "এ সমুদায় মায়া, জগৎ মায়া, ভগবান আর কোন পৃথক্ বস্তু নয়, তুমিই ভগবান।" ইহাতে শ্রীভগবান গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন, বৃন্দাবন গেলেন, গোপীগণ গেলেন, ভগবদ্ভক্তি গেলেন। এমন কি, পরকাল পর্য্যন্ত গেলেন। রহিলেন কি না—নাস্তিকতা। ইহার প্রত্যেক অক্ষর শ্রীপ্রভুর হৃদয়ে বিষাক্ত শরের ন্যায় লাগিতেছে। প্রভু এত বিকল হইতেছেন যে, তাঁহার প্রাণ বাহির হয় আর কি। কিন্তু তিনি শক্তিধর, সব পারেন, সমুদায় সহিয়া নীরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সার্ব্বভৌমের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, বেদ শুনিবেন, তাহাই শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইল, পুস্তকে ডোর দেওয়া হইল। প্রভু বাসায় আসিয়া, তাপিত হৃদয় শীতল করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে আরত্রিক দর্শন করিতে গমন করিলেন।

সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা করিলেন, তাঁহার যতদূর সাধ্য। বাসনা, নবীন-সন্ন্যাসীটীকে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, চমকিত করিবেন। এক একবার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির চমক উঠাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, নবীন সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হইবেন। কিন্তু তিনি তাহা না হওয়াতে সার্ব্বভৌম

একটু মনস্তাপ পাইতেছেন। আবার প্রভুর মুখের ভাব ঠাহুরিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহার মনের গতি কিছু বুঝিতে পারেন কি না। কিন্তু প্রভুর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। মনে ভাবিলেন, নবীন-সন্ন্যাসীর ধান্দা লাগিয়াছে, দুই এক দিবস ধান্দা ভাঙ্গিতে যাইবে। উহা অতিক্রম করিলে তখন কথা বলিবেন।

দ্বিতীয় দিবস সার্ব্বভৌম আবার পড়িতে ও প্রভু শ্রবণ করিতে বসিলেন। প্রভু ঠিক সেইরূপ চুপ করিয়া সময় কাটাইলেন, সার্ব্বভৌমও দুঃখিত হইয়া পাঠ বন্ধ করিলেন।

এইরূপে তিন চারি করিয়া সাত দিবস গত হইল। সার্ব্বভৌম তখন ধৈর্য্য হারাইয়াছেন। ভাবিতেছেন, এ ত ভোগ মন্দ নয়? এত পরিশ্রম করিয়া আমি কোন কালে কাহারও নিকট বেদ ব্যাখ্যা করি নাই। কিন্তু ফল কি হইতেছে? সন্ন্যাসীটী একবার আমার নিকট উপকারও স্বীকার করিল না? ভাল, তাই না করুক, একবার ভাল কি মন্দ কিছুই বলিল না? ইহার মানে কি? এটী কি পাগল, না নির্ব্বোধ, না মূর্খ? সত্যই কি এ মূর্খ! আমি যাহা বলিতেছি তাহা বুঝে না? তবে কি ইহার কাছে আমার ব্যাখ্যা ভাল লাগিতেছে না? তাহাই বা বলি কিরূপে? যেরূপ বিনয়ী, লাজুক ও নম্র, ইহার দম্ভ ও অভিমানের লেশমাত্র আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। যাহা হউক, কল্য ইহার তথ্য জানিতে হইবে। ইহার তথ্য না জানিয়া আর ব্যাখ্যা করিব না।

এদিকে প্রভুও সার্ব্বভৌমের বিষাক্ত বাণ-স্বরূপ ব্যাখ্যায় জরজর হইয়াছেন। তিনি শক্তিধর বলিয়া সাহিয়াছেন, ত্রিজগতে আর কেহ পারিতেন না।

অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম পুস্তক খুলিয়া বলিতেছেন, "স্বামিন! এই

সপ্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করিতেছি, কিন্তু তুমি হাঁ কি না কিছুই বল না কেন?”

প্রভু। আপনার আজ্ঞা বেদ শ্রবণ করা, তাই করিতেছি।

সার্ব্বভৌম। সে উত্তম, কিন্তু আমি যে শুধু পাঠ করিতেছি তাহা নয়, ব্যাখ্যাও করিতেছি। ব্যাখ্যা তোমার নিমিত্ত করিতেছি। কিন্তু তুমি চুপ করিয়া শুনিতেছ, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতেছ না।

প্রভু। আমি অজ্ঞ, অধ্যয়ন নাই। আপনি ভুবন-বিজয়ী পণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম। বুঝিতেছ না? তবে আমি ব্যাখ্যা কেন করিতেছি? তুমি বুঝিতে পারিবে, এই জন্যেই ত? আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাক; বুঝ না বুঝ আমি কিরূপে জানিব? যে না বুঝে, সে জিজ্ঞাসা করে। তোমার এ কি ভাব? বুঝ না বলিতেছ। বুঝ না, তবে জিজ্ঞাসা কর না কেন?

প্রভু। বেদের সূত্রগুলি পরিষ্কার। তাহা অল্পায়াসে বুঝা যায়। তাহা পরিষ্কার বুঝিতেছি। কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম, এ কথা শুনিয়া, প্রভু কি বলিতেছেন, হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না। প্রভু যাহা বলিলেন তাহা অসম্ভব। সেরূপ কথা তাঁহার শুনা অভ্যাস নাই। আর চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়স্ক একটী নিরীহ বালক-সন্ন্যাসীর নিকট যে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বালক-সন্ন্যাসীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, পণ্ডিত-প্রবর সার্ব্বভৌম ভুল ব্যাখ্যা করিতেছেন! সার্ব্বভৌম বলিলেন, “তুমি কি বলিলে? বেদের সূত্র বেশ বুঝিতে পার, কিন্তু আমার ব্যাখ্যা

বুঝিতে পারিতেছ না? অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যায় ভুল যাইতেছে, আর তোমার মনোমত হইতেছে না?"

প্রভু বলিলেন, "শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত, শ্রীভগবানের আজ্ঞাক্রমে, শঙ্করাচার্য্য বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া মনঃকল্পিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে মনঃকল্পিত, তাহা বেদের সূত্র ও তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ মাত্র জানা যায়। সূত্রের একরূপ অর্থ, শঙ্করাচার্য্য কল্পনা বলে অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। আপনার ব্যাখ্যা সেই শঙ্করাচার্য্যের অনুযায়ী। সে ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার অন্তর অত্যন্ত বিকল হইতেছে। কিন্তু আপনি বেদ শ্রবণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই আপনার আজ্ঞানুসারে শ্রবণ করিতেছি।"

সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, প্রভু তাঁহার অর্থের ভুল ধরিতেছেন, তাঁহার অর্থ কল্পিত বলিতেছেন। তিনি পুরীতে টোল স্থাপন করিয়া বেদ পড়াইয়া থাকেন। কাশীতে যেরূপ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদের টোল, শ্রীক্ষেত্রে তেমনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদের টোল। বহুতর পড়ুয়া এখন কাশীতে না যাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে বেদ পড়িতেছেন। এমন কি, বহুতর দণ্ডী সার্ব্বভৌমের টোলে বেদ পড়িয়া থাকেন। সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শুনিতেছেন কে, না নদে নিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের বেটা, বয়স চতুর্ব্বিংশতি, কখন বেদ পাঠ করেন নাই। ব্যাখ্যা করিতেছেন যিনি, তিনি কে, না সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, স্বয়ং সেই বেদের আকরস্থান, কাশীতে গমন করিয়া সেখানকার যত বিদ্যা বুদ্ধি শুষিয়া লইয়া আসিয়াছেন। সেই বালক-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহার বাৎসল্য ভাব। তাঁহাকে অতি পরিশ্রম করিয়া, শত সহস্র কার্য্যের মধ্যে, বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করাইতেছেন। এখন সেই বালক বলে কি যে, তোমার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ বুঝি, তোমার ব্যাখ্যা আমূল

কেবল ভুল! কাজেই সার্ব্বভৌম ধৈর্য্য হারাইলেন, হারাইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন।

বলিতেছেন, "হুঁ! আবার পাণ্ডিত্য অভিমানও আছে! বাহিরে দীনতা, অন্তরে দেখি অভিমানপূর্ণ। তুমি আমাকে শিখাইবে নাকি? তাই হউক, এখন বৃদ্ধকালে তোমার নিকটেই বেদ শিখিব। তুমি ব্যাখ্যা কর, আমি শ্রবণ করি। দেখি তুমি কাহার কাছে কিরূপ ব্যাখ্যা শিখিয়াছ।"

ভট্টাচার্য্য পুনঃ পুনঃ কহয়ে প্রভুরে।
বেদান্ত শুনহ নাচ কাচ ত্যজ দূরে॥
প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত।
হয় তাহা কৃপা করি কর যে উচিত॥
মূর্খ মুঞি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান।
দয়া করি কর যাহে মোর পরিত্রাণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে।
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে॥
এত কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত ব্যাখ্যান।
সাত দিন করেন প্রভু বসিয়া শ্রবণ॥
নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান।
মায়াময় বাদ যাহা পাষণ্ডী বিধান॥
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য।
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌনে কেন রহ।
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ॥

প্রভু কহে কি কহিব যে কহিছ অর্থ।
সকলি যে বিপর্য্যয় ব্যাখ্যান অনর্থ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান।
অনন্ত স্বরূপ শক্তি যোগমায়া হন॥
জীব মায়াদাস সেব্য সেবক সম্বন্ধ।
ইহার অন্যথা কহ এ বড়ই ধন্ধ॥
মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান॥
লক্ষণ করিয়া সব কহ অবিধান॥
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনর্থ।
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে।
ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হৈল মনে॥
কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখাও?
কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও॥
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি।
কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি॥
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল।
যাটি প্রকার তার সদর্থ করিল॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে।
ইহা ত সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে॥
ভট্টাচার্য্যের যেই পাণ্ডিত্য অভিমান।
গেল যদি প্রভু তবে হৈল কৃপাবান॥

সার্ব্বভৌম যে নিতান্ত বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কথা বলিতেছেন, প্রভু তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া

বলিতে লাগিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা মায়াবাদ স্থাপন। সেটি যেন তেন প্রকারেণ করিতে হইবে। কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী। বেদ বিরোধী হইলে কেহ তাঁহার মত লইবে না। সেই নিমিত্ত, বেদের সূত্রের পরিষ্কার অর্থ ত্যাগ করিয়া, মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। কাজেই সূত্র বুঝিতে যত সহজ, তাঁহার ভাষ্য বুঝা তাহা অপেক্ষা কঠিন। বেদ বলেন যে, "শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ও তাঁহার উপর প্রীতি জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।"

প্রভু এই কথা বলিয়াই বেদের সূত্র আওড়াইলেন, ও তাহার সরল অর্থ করিতে লাগিলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রথমে ভাবিলেন, তাড়া দিয়া প্রভুকে নিরস্ত করিবেন। সেইরূপ উদ্যোগও করিলেন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই প্রভুর মুখে নূতন কথা শুনিলেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই, শুনিয়া একটু আকৃষ্ট হইলেন। আকৃষ্ট হইয়া, প্রভুকে তাড়া না দিয়া তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে অবসর দিলেন। ব্যাখ্যা করিতে দিয়া, আরো ধান্দায় পড়িলেন; যেহেতু প্রভুকে আরও নূতন কথা বলিতে অবকাশ দিলেন। আবার আকৃষ্ট হইলেন, হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রভুর কথা শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী নির্ব্বোধ নহেন। আর একটু পরে বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পণ্ডিতও বটেন। আর একটু পরে বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও সুবোধ নহেন, একজন উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত!

প্রভুর উপর সার্ব্বভৌমের ক্রমেই শ্রদ্ধা হইতেছে। যখন সার্ব্বভৌম বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার অবজ্ঞার পাত্র ত নহেন, এক জন তাঁহার সমকক্ষ, তখন কিছু ব্যস্ত ও ভীত হইলেন। ভাবিতেছেন, তাঁহার গুরুর আসন খানি রাখিতে যুদ্ধ করিতে হইবে। আর চুপ

করিয়া থাকা উচিত নয়। ভট্টাচার্য্য তখন উত্তর আরম্ভ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ আবার করিল।
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল॥—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

অর্থাৎ তর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত নৈয়ায়িকদিগের যত ন্যায্য ও অন্যায্য উপায় আছে, ভট্টাচার্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতে—

ইত্থং প্রমাণৈ রখিলৈশ্চ শক্ত্যে তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়াচ গৌণ্যা
মুখ্যা জগৎস্বার্থ তদন্য মিশ্রস্বরূপয়া স্বমতমাবভাষে॥

অর্থাৎ এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব অখিল প্রমাণ দ্বারা তথা তাৎপর্য্য লক্ষণা, গৌণী, মুখ্যা, জগৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, এবং জহদজহৎস্বার্থা নামক শব্দের শক্তি দ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অসৌ বিতণ্ডাচ্ছন্ন নিগ্রহাদির্নিরস্ত ধীর পূর্ব্ব পক্ষং।
চকার বিপ্রা প্রভুণা সচাস্ত স্বসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তং॥

অনন্তর বিপ্রবর সার্ব্বভৌম বিতণ্ডাছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা নিরস্ত বুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিলেন, এবং স্বভাব-সিদ্ধ সিদ্ধান্তবিৎ মহাপ্রভু শীঘ্র পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করিলেন।

তখন ভট্টাচার্য্যের প্রাণপণ হইয়াছে, তিনি তখন যান, তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তাঁহার চিরজীবনের সাধনের ধন সেই গুরুর আসন, তাঁহার অর্থের পরম সীমা সেই ভুবনবিখ্যাত প্রতিষ্ঠা—যায় যায় হইয়াছে। কিন্তু করেন কি? আবার, অন্যায় ছল উঠাইয়া পদে পদে আপনি অপদস্থ হইতে লাগিলেন।

যখন দুই বীরে মল্লযুদ্ধ হয়, তখন প্রথম ধীরে ধীরেই আরম্ভ হয়, ক্রমে প্রাণপণ হয়। একজন ক্রমে দুর্ব্বল হইতে থাকেন, তাহার পরে

তাহার সমুদায় শক্তি লোপ হইয়া পড়ে। তখন সে নিরাশ হইয়া পৃষ্ঠাসন অবলম্বন করে, আর তাহার জয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার হৃদয়ের উপর বসিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরে। পরাজিত মল্ল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে কাতরভাবে চাহিতে থাকে।

পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছেন; বুঝিতেছেন, দুর্ব্বল হইতেছেন, কিন্তু উপায় নাই। প্রাণপণ করিয়াও পারিতেছেন না। অগ্রে যে বিরোধ করিতেছিলেন, তাহা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। আর শক্তি নাই। তখন নিরাশ হইয়া অতি কাতর বদনে, চুপ করিয়া বসিয়া, প্রভুর দিকে চাহিয়া, তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তখন সার্ব্বভৌম হইয়াছেন যেন একটি পঞ্চম বর্ষের শিশু, আর প্রভু তাঁহার পরম উপদেষ্টা, অতিশয় বাৎসল্যের সহিত তাঁহাকে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি বুঝাইয়া দিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদভগবদ্ভক্তি জীবের পরম সাধন, যাঁহারা মুনি, সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন।"

ইহা বলিয়া প্রভু অন্যান্য অনেক শ্লোকের মধ্যে, শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন, যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূতো গুণোহরিঃ॥

সার্ব্বভৌম তখন বিনয়ের সহিত বলিলেন, "স্বামিন্! এই শ্লোকটির অর্থ আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা।" প্রভু বলিলেন, "যে আজ্ঞা তাই করিব। কিন্তু অগ্রে আপনি একবার অর্থ করুন। পরে আমি ইহার অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছি করিব।"

সার্ব্বভৌম ইহাতে পরম আশ্বাসিত হইলেন—তিনি নূতন জীবন

পাইলেন। তিনি মরিয়াছিলেন, বাঁচিবার একটি উপায় পাইলেন। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শাইবার অবকাশ পাইলেন। এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার বিচ্যুতপদ, যতদূর পারেন, পুনঃ অধিকার করিবেন। তাই অতি আগ্রহের সহিত এই শ্লোকের ব্যাখা আরম্ভ করিলেন। নানা তর্কের ছল উঠাইলেন, নানা কথার নানা অর্থ করিলেন, শ্লোকের এইরূপে নয়টি অর্থ করিলেন, করিয়া ভাবিলেন, তিনি যাহা করিলেন ইহা জগতের অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু প্রভুর সেরূপ ভাব বোধ হইল না, তিনি যেন সার্ব্বভৌমের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, তিনি প্রশংসা আশয়ে মহাপ্রভুর মুখ পানে চাহিলেন। প্রভুও সার্ব্বভৌমকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "পৃথিবীতে তোমার সমান পণ্ডিত নাই। তুমি ইচ্ছা করিলেই এক শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে পার। তবে ভট্টাচার্য্য, তুমি পাণ্ডিত্যের শক্তিতে অর্থ করিয়াছ। কিন্তু ইহা ব্যতীত শ্লোকের আরও তাৎপর্য্য থাকিতে পারে।

ভট্টাচার্য্য ইহাতে বিস্মিত হইলেন। তিনি ন্যায্য ও অন্যায্য যত প্রকার উপায় আছে, সমুদায় অবলম্বন করিয়া শ্লোকটিকে নানারূপে বিভাগ করিয়া নয়টি অর্থ করিয়াছেন। যখন তাঁহার বিবেচনায় শ্লোক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু নাই, সম্ভব ও নাই, তখনই ব্যাখ্যা করিতে ক্ষান্ত দিয়াছেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিতেছেন শ্লোকের আরও অর্থ আছে। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন, "সে কি? আপনি বলেন ইহাতে আরও অর্থ আছে! আর কি অর্থ আছে বলুন দেখি?"

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, করিয়া ব্যাখ্যা

আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম যে নানাবিধ অর্থ করিয়াছিলেন, তাহার একটিও স্পর্শ করিলেন না। সে পথেই গেলেন না। শুদ্ধ তাহা নহে, যে পথ লইলেন উহা একেবারে নূতন; এবং যতগুলি অর্থ করিলেন তাহা সমুদায় নূতন।

এইরূপে প্রভু সেই আত্মারাম শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন।

কিরূপে প্রভু এই এক শ্লোকের বিবিধ অর্থ করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবরিত আছে। প্রভুর ব্যাখ্যার পদ্ধতি দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমে প্রভু শ্লোকের 'আত্ম' শব্দ লইলেন, লইয়া এই শব্দটির যত প্রকার অর্থ আছে বলিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত—

আত্ম শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, রত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥

তথাহি বিশ্ব প্রকাশে। আত্মা, দেহ, মনো, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধিযু প্রযত্নে চ।

প্রভু এইরূপে ঐ শ্লোকের যতগুলি শব্দ আছে, তাহার একটি একটী লইতে লাগিলেন, ও তাহার প্রত্যেক শব্দের কত অর্থ তাহা অভিধান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ শ্লোকের মধ্যে যতগুলি শব্দ আছে, এবং অভিধান অনুসারে প্রত্যেক শব্দের যতটী অর্থ আছে, সব বলিয়া গেলেন। এই সমস্ত শব্দের নানাবিধ অর্থ যোগ করিয়া শ্লোকের নানাবিধ অর্থ করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধ তাহা নহে, তিনি দেখাইলেন, প্রত্যেক অর্থের তাৎপর্য্য এক, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বজীবের পরম পুরুষার্থ!

এখন প্রভু, সার্ব্বভৌমের নিকট ভক্তির প্রাধান্য দেখাইবার

নিমিত্ত, অন্যান্য বহুতর শ্লোকের মধ্যে আত্মারাম শ্লোকটি আওড়াইয়া ছিলেন। এই শ্লোকের যে অর্থ করিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। শ্লোক ব্যাখ্যা করা প্রভুর কার্য্য নহে। সে সমস্ত পণ্ডিতগণের কার্য্য। সার্ব্বভৌমের নিকট শ্লোক পড়িতে গিয়া, যে তাহার মধ্যে বাছিয়া আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা প্রভুর জানিবার কোন কারণ ছিল না। সার্ব্বভৌমও যে প্রভুর নিকট এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিবেন তাহাও অননুভবনীয়।

ঘটনাটি এইরূপে হইল। প্রভু কথায় কথায় অন্য শ্লোকের মধ্যে আত্মারাম শ্লোকটি আওড়াইয়া ছিলেন। সার্ব্বভৌমও, কেন তিনিই জানেন, উহার ব্যাখা শুনিতে চাহিলেন। প্রভু বলিলেন "আগে, তুমি ব্যাখ্যা কর, পরে আমি করিব।" এই অনুমতি পাইয়া সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সেই ভুবনবিজয়ী পণ্ডিত, তাঁহার যতদূর সাধ্য, সেই শ্লোকটি নিঙ্গড়াইয়া অর্থ বাহির করিলেন। যখন দেখিলেন, শ্লোকের মধ্যে আর এক বিন্দুও অর্থ নাই, তখনি প্রভুকে উহার অর্থ করিতে দিলেন।

প্রভু অমনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম যত প্রকার অর্থ করিলেন, প্রভু তাহার একটিও লইলেন না। নূতন নূতন অর্থ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই দেখাইলেন যে, সমুদায় অভিধানখানি তাঁহার কণ্ঠস্থ। তাহার পরে, এই সমস্ত শব্দ সংযোগ করিয়া প্রভু প্রথমে একটি সম্পূর্ণ নূতন অর্থ করিলেন।

সার্ব্বভৌম মনে মনে ভাবিতেছেন,—অদ্ভুত! অদ্ভুত!

তাহার পরে, প্রভু শ্লোকের শব্দের অন্য অর্থ দিয়া উহার আর একটি অর্থ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন,—হরি! হরি! কি অদ্ভুত! কি পাণ্ডিত্য! কি অমানুষিক শক্তি!

প্রভু উপরি উক্ত প্রকারে শ্লোকের আর একটি নূতন অর্থ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম এই নূতন নূতন অর্থের মধ্যে আর একটি কারিগরি দেখিতে পাইলেন; তিনি দেখিতেছেন যে, যদিও প্রভু শ্লোকের নূতন নূতন অর্থ করিতেছেন, কিন্তু সমুদায় অর্থ দ্বারাই তাঁহার মত, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহা প্রমাণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ক্রমে সার্ব্বভৌমের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভু শ্লোকের যে অর্থ করিলেন, উহা পূর্ব্বে যে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা নয়; উপস্থিত মত করিলেন। ইহা সার্ব্বভৌম বুঝিলেন। আবার উপস্থিত মত অর্থ করিতে, নবীন সন্ন্যাসী যে, তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের একটী অর্থও লইলেন না তাহাও বুঝিলেন। প্রথমে প্রভু যখন শব্দের অর্থ করিতে লাগিলেন তখন সার্ব্বভৌম ভাবিলেন, "শব্দ যে উহার খেলার সামগ্রী। ইনি যে সরস্বতীর বরপুত্র।" ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন অর্থ শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে বুঝিলেন, নবীন সন্ন্যাসী মনুষ্য নয়। শ্লোকের অর্থ করিতে প্রভু এই যে অদ্ভূত শক্তি দেখাইতে লাগিলেন, ইহা যে কত বিস্ময়কর তাহা পাঠকগণ কিছু বুঝিতে পারেন; কিন্তু পাঠকগণ যতই বুঝুন, সার্ব্বভৌম উহা যেরূপ বুঝিলেন ওরূপ আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না, কারণ তিনি নিজে কারিগর লোক। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য পণ্ডিতে যেরূপ বুঝিতে পারেন, অন্যে তাহা পারেন না। আবার যাঁহার যত বড় পাণ্ডিত্য, তিনি অন্যের পাণ্ডিত্য শক্তি তত অনুভব করিতে পারেন। নবীন সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য সার্ব্বভৌম যেরূপ অনুভব করিলেন, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পণ্ডিতে তাহা পারিতেন না।

প্রভুর শ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্ব্বভৌমের মনের ভাব

ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে প্রভুর মুখে বেদের অর্থ শুনিয়া সার্ব্বভৌম বুঝিলেন যে, জগতের মাঝে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত নন, তাঁহার উপরে আরো পণ্ডিত আছেন। কিন্তু প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রথমেই বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসীর শক্তি তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক। শুধু তাহা নহে; তবে কি না, অমানুষিক—মনুষ্যের এরূপ শক্তি হইতে পারে না!

তখন তিনি ভাবিতেছেন, এটীত মনুষ্য নয়, তবে এ বস্তুটী কি? ইনি কি স্বয়ং বৃহস্পতি, মনুষ্য রূপ ধরিয়া আমার অহঙ্কার খর্ব্ব করিতে আসিয়াছেন? যথা চৈতন্য চরিতে—

অথৈষ বিস্মের মনা দ্বিজাগ্রণী হৃদাহৃদি ব্যাকুলিতং জগাদ।
ক এষ মৎপ্রাতিভ খণ্ডনার্থ মিহাবতীর্ণঃ কিমুগীস্পতিস্যাৎ॥

অর্থাৎ সার্ব্বভৌম ব্যাকুলিত ও বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, ইনি কি বৃহস্পতি, আমার প্রতিভা হরণ করিতে আসিয়াছেন? আবার ভাবিতেছেন, বৃহস্পতি হইলেও আমি একটু যুদ্ধ করিতে পারিতাম, ইনি তাঁহা অপেক্ষাও বড়।

তখন তাঁহার গোপীনাথের কথা মনে পড়িল। ভাবিলেন, গোপীনাথ বলেছিল যে, এ সন্ন্যাসী সেই স্বয়ং—তিনি। তাই কি হবে? সেইরূপ আকৃতি প্রকৃতি বটে, যেমন সুন্দর মুখশ্রী, তেমনি মধুর প্রকৃতি, আবার তেমনি সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যে মণ্ডিত। এত রূপ গুণ কি তাঁহা ব্যতীত আর কাহারো সম্ভবে? এই কথা মনে হওয়াতে শরীর আনন্দে পরিপুর্ণ হইল। সেই মুহূর্ত্তে সার্ব্বভৌমের যত অবিদ্যা সব অন্তর্হিত হইল। তাহাতে কি হইল, না, তাঁহার চিত্তদর্পণ নির্ম্মল ও সমুদায় দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি হইল। তখন দেখিলেন, তিনি অভিমান ও ঈর্ষার দ্বারা চালিত হইয়া সম্মুখের বৃহদ্বস্তুটীকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, আর

তাঁহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন। তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। আর থাকিতে পারিলেন না, গলায় বসন দিয়া "আমি অপরাধী" বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন।

কিন্তু তাঁহার চরণে পড়িতে পারিলেন না; পড়িতে গিয়া দেখেন যে, সম্মুখে নবীন সন্ন্যাসী আর নাই, তবে সে স্থানে বিদ্যুল্লতা-মণ্ডিত সুবর্ণ বর্ণের অঙ্গ লইয়া একজন অতি সুন্দর পুরুষ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া! তাঁহার ষড়্ভুজ। ঊর্দ্ধে দুই বাহু, দূর্ব্বাদলের ন্যায় বর্ণ, উহাতে ধনুর্ব্বাণ। মধ্যের দুই বাহু নীলকান্তমণির ন্যায়, উহাতে মুরলী। নিম্নের দুই বাহু সুবর্ণ বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু। এই সুন্দর মূর্ত্তির শ্রীবদন মুরলীরন্ধ্রে চুম্বিত। ইহার মুখে মধুর হাস্য, মস্তকে চূড়া, আর অঙ্গের জ্যোতি সুশীতল, স্নিগ্ধকারী ও আনন্দপ্রদ।

সার্ব্বভৌমের প্রণাম করিতে হইল না, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥

সার্ব্বভৌমের চিত্তদর্পণ বিদ্যামদে মলিন হইয়াছিল। চাঁদ কাজীকে বাহুবলে অন্ধ করে। চাঁদ কাজীর যখন বাহুবল অন্তর্হিত হইল, তখনি তাহার চক্ষু পরিষ্কার হইল। যে বলে চাঁদ কাজীর উদ্ধার সমাধা হইয়াছিল, সে বলে সার্ব্বভৌমের কিছুই হইত না। যে শক্তিতে সার্ব্বভৌম উদ্ধার হইলেন, উহা চাঁদ কাজীকে স্পর্শও করিত না। সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য অভিমান হরণ করিবার প্রয়োজন হয়, প্রভু তাহাই করিলেন। যে মাত্র তাঁহার পাণ্ডিত্য অভিমান গেল, সেই তিনি দিব্যচক্ষু পাইলেন।

সার্ব্বভৌম ষড়ভুজমূর্ত্তি কিরূপ দর্শন করিলেন, উহা আপনি জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে ও আপনার ঘরে অঙ্কিত করিয়া রাখেন। উহা অদ্যাপি আছেন, সকলেই দেখিতে পারেন।

সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছিত হইলে প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিলেন।

'শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।'—চৈতন্য ভাগবত।

সার্ব্বভৌম অর্দ্ধচেতন পাইয়া চক্ষু মেলিলেন, তখন সার্ব্বভৌম প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি আমার ভক্ত, অতএব আমি তোমাকে দর্শন দিলাম।"

সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুই বহি নাহি আর ॥—চৈতন্য ভাগবত।

তাহার পরে সার্ব্বভৌম ক্রমে সচেতন হইলেন; একটু চেতন পাইয়া উঠিলেন, উঠিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন; কিন্তু সে মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলেন না। তবে দেখিলেন সে স্থানে সেই নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া। প্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্পূর্ণরূপে চেতন হইতে অবকাশ দিলেন না। তাঁর সম্পূর্ণরূপে চেতন হইবার পূর্ব্বেই প্রভু উঠিয়া বাসায় গমন করিলেন।

ক্রমে সার্ব্বভৌমের নিপট্ট বাহ্য হইল। তিনি তখন, কি দেখিয়াছেন, কি শুনিয়াছেন, স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেখিবার পূর্ব্বে কি কি ঘটনা হয়, তাহাও স্মরণ করিতে লাগিলেন। কখন ভাবিতেছেন, সমুদায় ইন্দ্রজাল; আবার ভাবিতেছেন, বেদের যে নূতন অর্থ শুনিলাম তাহা ত ইন্দ্রজাল নয়! আত্মারাম শ্লোকের যে ব্যাখ্যা শুনিলাম তাহা ত সমুদায় মনে আছে। যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু মূর্ত্তি দেখিবার অগ্রে, আমি না সন্ন্যাসীকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গিয়াছিলাম? সন্ন্যাসী যে মনুষ্য নয়, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রকাশ।

যাঁহার এরূপ অমানুষিক শক্তি, তাঁহার পক্ষে ষড়্ভুজ হওয়ার বিচিত্রতা কি? তবে এ ষড়্ভুজের অর্থ কি? ইহার এক অর্থ এই হইতে পারে,—অগ্রে রাম, পরে শ্রীকৃষ্ণ, পরে শ্রীগৌরাঙ্গ; অর্থাৎ আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আর আমিই সেই গৌরাঙ্গ। প্রভু ষড়্ভুজের দ্বারা আমাকে সেই পরিচয় দিলেন। এ স্বপ্ন কিরূপে হইবে? স্বপ্নে এত জ্ঞানগর্ভ অর্থ কিরূপে থাকিবে? প্রভু, মুখে কিছু বলিলেন না, প্রকারান্তরে আমাকে সমুদায় পরিচয় দিয়া গেলেন।

সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন, 'এ আমি কি দেখিলাম? স্বপ্নে এরূপ সম্ভবে না। স্বপ্নে এরূপ আমূল সংলগ্ন অর্থ হইতে পারে না। যাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক। তবে কে, কিরূপে, উহা আমাকে দেখাইলেন? এই সন্ন্যাসীরই যে এই কার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে সন্ন্যাসীটী কি শ্রীভগবান?

যে মাত্র এইরূপ ভাবিতেছেন, অমনি সার্ব্বভৌমের মন বলিয়া উঠিতেছে,—"না, না, সন্ন্যাসী ভগবান কিরূপে হইবেন?" সার্ব্বভৌমের এরূপ মনের ভাবের কারণ এই যে, জীবের দুইটী মন্ত্রী আছেন—সন্দেহ ও বিশ্বাস। দুটীই উপকারী; তাহার মধ্যে সন্দেহ, বিশ্বাস অপেক্ষা বলবান। সন্দেহ ও বিশ্বাসে হুড়াহুড়ি বাধিলেই সন্দেহের জয় হয়। সার্ব্বভৌম ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান কখনও নয়; শ্রীভগবান কলিকালে নর-সমাজে আসিয়াছেন, তাহা কি হইতে পারে? এ যে হাসিবার কথা। তবে সন্ন্যাসীটী সম্ভবত ইন্দ্রজাল জানে, তাহার দ্বারা আমার ভ্রম জন্মাইয়াছিল। সে ভগবান কখনও হইতে পারে না।"

আবার বিশ্বাস আসিতেছে। ভাবিতেছেন, "সন্ন্যাসী আপনিই স্বীকার করিলেন যে, তিনি শ্রীভগবান। ইহা ঘোর নাস্তিক ও পাষণ্ড ব্যতীত আর কেহ কি বলিতে পারে? কিন্তু সন্ন্যাসী নাস্তিকও নয়,

মূর্খও নয়, ভণ্ডও নয়। ইঁহার প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের ন্যায়, যাহা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। ইঁহার বুদ্ধি বিদ্যা সরস্বতীকান্তের ন্যায়, বৈরাগ্য অকথ্য, আর স্পৃহা মাত্র নাই। ইঁহার দীনতা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইঁহার বদনের সারল্য দেখিলে, অতি কঠিন পুরুষেরও নয়নে জল আইসে। এ ব্যক্তি আপনাকে শ্রীভগবান বলিয়া পরিচয় দিবে কেন? ইহার স্বার্থ কি? ইহার ত কোন স্পৃহা নাই? এ কখনই ভণ্ড ভক্ত হইতে পারে না; কারণ ইহার বায়ুতে জীবের হৃদয় ভক্তিতে গদগদ হয়। যে প্রকৃত ভক্ত, সে কি কখন শ্রীভগবানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাকে সেখানে বসাইতে পারে? ইনি যে শ্রীভগবান, তাহার সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান না লইলে, আপনাকে শ্রীভগবান বলিয়া পরিচয় দিতেন না।" ইহা ভাবিয়া আবার সার্ব্বভৌম আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

সার্ব্বভৌমের এইরূপে সমুদায় নিশি কাটিয়া গেল। এই এক নিশির মধ্যে তাঁহার হৃদয় কর্ষিত হইল। তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র কণ্টক-বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল; প্রভু তখন তাহার মধ্যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিলে উহা অঙ্কুরিত হইত না। এই নিমিত্ত ভক্তি-বীজ রোপণ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে উহার হৃদয়স্থ কণ্টকী-লতা গুলি উৎপাটিত ও হৃদয় কর্ষণ করিতে হয়। ষড়ভুজ দর্শন করিয়া এবং প্রভুর সহবাসে সার্ব্বভৌম ভক্তি পাইলেন না। তবে ভক্তি পাইবার যোগ্যপাত্র হইলেন। এই এক নিশির মধ্যে, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত ও সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত এবং নয়ন-জলে আর্দ্র হইল। তখন কেবল বীজ রোপিত হইতে বাকি রহিল।

সে নিশি ভট্টাচার্য্যের আনন্দে অনবরত নয়ন-জল পড়িয়া তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল ও কোমল করিয়া রাখিল। কিঞ্চিৎ রজনী থাকিতে তিনি নিদ্রা গেলেন।

এদিকে প্রভু বাসায় আসিয়া রজনী যাপন করিয়া, অতি প্রত্যূষে শয্যোত্থান দর্শন করিতে চলিলেন। প্রভু দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ নিকটে দাঁড়াইয়া। শ্রীজগন্নাথদেবের গাত্রোত্থান, মুখধাবন, স্নান, বস্ত্রপরিধান, বাল্যভোগ ও পরে হরিবল্লভ-ভোগ হইল। তখনও আন্ধার আছে। তাহার পরে প্রাতে ধূপপূজা হইল। এমন সময় শ্রীজগন্নাথের দুইদিক হইতে দুইজন সেবক হঠাৎ বাহির হইলেন। তাঁহারা প্রভুর নিকটে আসিলেন। একজনের হস্তে মালা, আর একজনের অঞ্জলিতে ধূপপূজার প্রসাদান্ন। তাঁহারা প্রভুর নিকট আসিলে,—

মহাপ্রভু অধো মাথা করিলা আপনে।
এক জন মালা গলে দিলেন তখনে॥
বহির্ব্বাস অঞ্চল প্রসারি ভগবান।
প্রসাদান্ন আর জল করিলা স্বাদন॥—চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মালা পরান হইলে, তিনি বহির্ব্বাসের অঞ্চলে প্রসাদান্ন লইলেন। ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন। এত ভোরে উঁহারা কাহারা আসিলেন? আর কেন আসিলেন? আপনা আপনি আসিবারও কোন কথা নয়, কেহ অবশ্য তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কে পাঠাইয়াছেন? প্রভুর কি গোপনে গোপনে সেবকগণের সহিত কোন বন্দোবস্ত হইয়াছিল? তাই বা কখন হইল? আমরা ত সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে। সকলে ভাবিতেছেন, এ কাণ্ড স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ করিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। বোধহয় তাঁহারা,—অর্থাৎ জগন্নাথ ও প্রভু,—দুই জনে কি যুক্তি করিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভক্তগণ এই কাণ্ড দেখিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের আশ্চর্য্য ভাব ক্রমে আরও

বৃদ্ধি পাইল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন প্রভু সমুদায় জানিতেন; অর্থাৎ দুই জনে আসিয়া যে তাঁহাকে প্রসাদ দিবেন, ইহা যেন প্রভু প্রত্যাশা করিতেছিলেন। প্রভু প্রসাদ পাইলেন, কিন্তু বাঙ্-নিষ্পত্তি করিলেন না; তবে অমনি তীরের মত ছুটিলেন। প্রভু যদি দৌড়িলেন, ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্রভু হঠাৎ ও বিদ্যুৎ গতিতে গমন করিলেন, সুতরাং ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারিলেন না। কিন্তু তবু তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন। তিনি নিজ বাসার পথ ছাড়িলেন, ছাড়িয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ী যে পথে সেই পথের দিকে ছুটিলেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তাঁহারাও সেই পথে কাজেই চলিলেন। প্রভু দৌড় দিয়া, একবারে সার্ব্বভৌমের গৃহের দ্বিতীয় কক্ষের ভিতরে, দ্বার অতিক্রম করিয়া, উপস্থিত হইলেন। গৃহে সার্ব্বভৌম নিদ্রা যাইতেছেন, দাওয়ায় একজন ব্রাহ্মণকুমার শয়ন করিয়া। প্রভু যাইয়া "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিলেন। ইহাতে প্রথমেই ব্রাহ্মণবালক উঠিল, উঠিয়া প্রভুকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিতে লাগিল। বলি, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! শীঘ্র উঠুন, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন।" সার্ব্বভৌম ইহাতে উঠিলেন, উঠিয়া হাই তুলিতে তুলিতে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার অগ্রে কৃষ্ণনাম বলিতেন না। এই প্রথম বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন বুঝিলেন যে প্রভু আসিয়াছেন, তখন ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম আসিয়াই প্রভুর চরণে পড়িলেন, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

এখন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিরূপ ধর্ম্ম মানেন, তাহা একটু

বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হইতেছে। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যেরূপ তিনিও সেইরূপ। তবে এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধিক তেজস্কর, ও অধিক সূক্ষ্মদর্শী। ভিন্ন জাতির জল হিন্দুদের আচরণীয় নহে। কিন্তু সার্ব্বভৌমের অঙ্গে যদি ঐরূপ জলের ছিটা লাগিত, তবে তিনি উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। সমাজের ঘোর শাসন ছিল, তাহা ভট্টাচার্য্যেরাই করিতেন; কাজেই তাঁহাদের সেই শাসনের অধীন থাকিতে হইত। আপনারা না মানিলে অন্যে মানে না, সুতরাং সেই শাসন অন্য অপেক্ষা আপনারা অধিক মানিতেন। আচার বিচার ও শুচি লইয়া দেশ সমেত লোক বিব্রত। এ ব্যক্তি অস্পৃশ্য, এ দ্রব্যটা অশুচি—ইহার বিচারই ক্রমে জীবের প্রধান ধর্ম্ম হইল। জাতি বিচার ইহার প্রধান কারণ। আর এক বিচার দেহধর্ম্ম লইয়া। অস্নাত ভোজন করিতে নাই, দন্তধাবন না করিলে পূর্ব্বপুরুষ নরকে যায়, রাত্রিকালের বসন ত্যাগ করিতে হয়, ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য উচ্ছিষ্ট। অমূক চণ্ডাল, তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে নাই। অমুকের বাড়ী মুসলমান ভৃত্য, তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের মুখে জোর করিয়া মুসলমানের জল দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাশয়গণ ব্যবস্থা করিলেন যে, তাঁহার তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে! এই সব কঠোর শাসনের শাস্ত্রবেত্তা শ্রীনবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যগণ; আর এই ভট্টাচার্য্যগণের প্রধান সার্ব্বভৌম।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম ইহার ঠিক বিপরীত। জাতি বিচার আবার কি, সকলেই ত শ্রীভগবানের? যে ভক্ত সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি, অভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত-চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। হরিদাস যবন, তাঁহার পাদোদক

ভক্তগণ পান করিতে লাগিলেন। হরিদ্দাস যবন, তিনি কুলীনগ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু বসুগণের গুরু। যে অন্ন শ্রীভগবানকে প্রদান করা হইয়াছে, সে আবার উচ্ছিষ্ট কি? তাহা অতি পবিত্র বস্তু, অঙ্গে মাখিতে হয়। অতএব ভট্টাচার্য্যগণের নিয়মাবলী এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম,—এই উভয় ধর্ম্ম,— এক সঙ্গে যাজন করা যায় না। এই নিমিত্ত ভট্টাচার্য্যগণ, শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের প্রতিবাদী হইলেন। যদিও প্রভু সমাজের বিরোধী কোন উপদেশ দিতেন না, তবু তাঁহার ধর্ম্ম যে সামাজিক নিয়মের বিরোধী, তাহা পণ্ডিতগণ বেশ বুঝিলেন, আর সেই নিমিত্ত উহা ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সার্ব্বভৌম শাস্ত্রবেত্তা-ভট্টাচার্য্যগণের প্রধান। তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত ভক্তি-পথে আনা হইল। সার্ব্বভৌম ভক্তি পাইলেন, ষড়ভুজ দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তবুও তিনি উপরি উক্ত সামাজিক বন্ধনে আষ্টে পিষ্টে আবদ্ধ রহিলেন। সেই সমুদায় বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার কিছুই হইবে না। প্রভু এখন সেই বন্ধন ছেদন করিতে বসিলেন।

উভয়ে বসিলে, প্রভু অতি যতন করিয়া, অঞ্চলের প্রসাদান্ন বাহির করিয়া, ভট্টাচার্য্যের হস্তে দিয়া, মধুর হাসিয়া বলিতেছেন, "গ্রহণ কর, ইহা শ্রীমুখের প্রসাদ।" তখন সার্ব্বভৌম স্নান করেন নাই, বাসী বসন ত্যাগ করেন নাই, শৌচে যায়েন নাই, এমন কি দন্তধাবনও করেন নাই; তিনি কিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন? প্রসাদ কি না ভাত! ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, শত মৃত্যু স্বীকার করিবেন, তবুও মুখ না ধুইয়া অন্ন মুখে দিতে স্বীকার করিবেন না। সেই ভাত লইয়া, অতি প্রত্যূষে, স্নান না করিয়া, মুখ না ধুইয়া, প্রভু উহা সার্ব্বভৌমকে গ্রহণ করিতে, অর্থাৎ খাইতে, বলিতেছেন! প্রভু যে বলিলেন, "শ্রীমুখের প্রসাদ গ্রহণ কর"; তাহার

অর্থ (ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের নিকট) আর কিছু নয়, কেবল এই যে, "মুখ না ধুইয়াই তুমি এই কয়টী শুখ্না ভাত খাও।" কিন্তু সার্ব্বভৌম তখন আর সেই পূর্ব্বকার ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ নাই, তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনের বায়ু তাঁহার অঙ্গে লাগিয়াছে।

"প্রভু খাও খাও ভট্টাচার্য্যে বলে হাসি।"—চন্দ্রোদয় নাটক।

ভট্টাচার্য্য আর দ্বিধা করিলেন না; অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলেন, করিয়া অভ্যাসবশতঃ তবু দুইটা শ্লোক পড়িলেন, যথা—

(১) শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥

(২) ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

সার্ব্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কুলধর্ম্ম ছাড়িলেন!

কিন্তু সেই প্রসাদান্ন ভোজন মাত্র সার্ব্বভৌমের এক অপরূপ ভাব হইল। কি না, (যথা চন্দ্রোদয় নাটক)—

"চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত কণ্টকিত গাত্র।"

তাহার পরে সার্ব্বভৌম আপনাকে আর সামলাইতে পারিলেন না, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার কি দশা হইল তাহা শ্রবণ করুন।

নিরন্তর কণ্ঠ শব্দ হয় ঘরঘর।
অপস্মার রোগে যৈছে ব্যগ্র কলেবর॥
মহীতলে গড়াগড়ি যায় বার বার।—চন্দ্রোদয় নাটক।

এই মহাপ্রসাদে কি শক্তি নিহিত ছিল তাহা প্রভুই জানেন। সার্ব্বভৌম এই কয়েকটী শুষ্ক প্রসাদান্ন যেই মুখে দিলেন, অমনি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রভুর হাতে

এই প্রসাদ গ্রহণরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সার্ব্বভৌম নির্ম্মল হইলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।

সার্ব্বভৌম অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর প্রভু তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইতে লাগিলেন; হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন, যেহেতু তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা ছিল না। উঠাইয়া প্রভু অতি আদরে, অতি প্রেমে—আহা ভগবানের প্রেমের কি বর্ণনা করিব, যে প্রেমের কণা পাইয়া সতী নারী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরে—সেই ভগবানের প্রেমে সার্ব্বভৌমকে বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন!

প্রভু আলিঙ্গন দিবার সময় কি বলিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যকে আলিঙ্গন দিতে দিতে বলিতেছেন—

আজি মুই অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

সেই আলিঙ্গনের সহিত সার্ব্বভৌম পঞ্চম-পুরুষার্থ পাইলেন। তাঁহার যে শুদ্ধ বন্ধন ছেদন হইল তাহা নহে, আরো কিছু হইল। যেরূপ

বিদ্যুৎমালা মেঘের সহিত খেলা করে, সেইরূপ আনন্দ-লহরী, তাঁহার অঙ্গের সহিত খেলা করিতে লাগিল। সেই লহরী, শরীরে যত ধমনী আছে তাহা বাহিয়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল, প্রত্যেক অঙ্গ-ছিদ্র দিয়া সেই আনন্দ চোয়াইয়া পড়িতে লাগিল, আর তাহাতেই প্রত্যেক লোমকূপে একটী একটী পুলকের সৃষ্টি হইতে লাগিল! তখন হৃদয়-কবাট খুলিয়া গেল, ঝলকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ আসিতে লাগিল। তরঙ্গ আসুক তাহে ক্ষতি নাই, কিন্তু হৃদয়ে আর স্থান রহিল না। এমন অবস্থায় মূর্চ্ছা হয়, কিন্তু প্রভু তখন সার্ব্বভৌমের আনন্দ তরঙ্গের নালী কাটিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ধরিলেন, তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, উঠাইয়া দুই জনে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই প্রথম নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই যে নৃত্য, ইহা বন্ধন ছেদনের অব্যর্থ প্রমাণ। চির-আবদ্ধ পশুগণ যদি কোন ক্রমে বন্ধন ছেদন করিতে পারে, তবে একবার অকারণে ছুটাছুটি করে। সমাজের বন্ধনে লোকে স্থির-শান্ত ভব্য-সভ্য হইয়া বেড়ায়; মদ্যপানে সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে তখন নির্ল্লজ্জের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। যখন মদ্যপান করিয়া কেহ নৃত্য করে, তখন, সে যে উন্মত্ত হইয়াছে, সেই নৃত্যই তাহার প্রমাণ। সার্ব্বভৌম নৃত্য করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

কোন একজন যুবক, এক দস্যুপতির নিকট আসিয়া, তাহার দলভুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। দস্যুপতি দেখিল, যুবক বলবান বটে। পরে তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "বাপু! তুমি পারিবে না, দস্যু হইবার যে সমস্ত গুণ প্রয়োজন তাহা তোমার নাই।" যুবক দুঃখিত হইয়া বলিল, সে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছে। দস্যুপতি ইহাতে হাসিয়া তাহার পার্শ্বের তরবারি খানি লইয়া যুবকের হস্তে দিল; দিয়া বলিল,

"ঐ যে ষাঁড়টী মাঠে চরিতেছে, উহার মস্তকটী লইয়া আইস।" যুবক বলিল, "অনর্থক কেন একটী জীব হত্যা করিব?" তখন দস্যুপতি একটি ভৃত্যকে ডাকিল। তাহাকে বলিল, "তুমি ঐ পশুর মস্তকটী লইয়া আইস।" সে কোন কথা না বলিয়া তাহাই করিল। যদি যুবকটি আজ্ঞা মাত্র পশুটির মস্তক ছেদন করিতে পারিত, তবে দস্যুপতি বুঝিতে পারিত যে, সে তাহারই গণ বটে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মদ্যপান করিয়া যে নৃত্য করে, তাহাকে একথা বলা যাইতে পারে যে, "হাঁ, এ ব্যক্তি মাতাল বটে।" সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রেম ও ভক্তির শক্তিতে নৃত্য করিতে পারে, তাহাকে বলা যাইতে পারে যে, সে ভক্ত কি প্রেমিক বটে।

যখন জগাই মাধাই উদ্ধার হইলেন, জগাই নাচিতে লাগিলেন। তাহার পরে মাধাইও নাচিতে লাগিলেন। মাধাই অপেক্ষা জগাই ভাল, বিশেষতঃ তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে প্রাণে বাঁচাইয়াছিলেন। অতএব জগাই নাচিতে থাকিলে ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। কিন্তু যখন মাধাই নাচিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর একি ঠাকুরাল! জগাই নাচিলেও নাচিতে পারে। এ যে মাধাই নাচে!" মাধাই যখন প্রেমে ও ভক্তিতে নাচিতে পারিলেন, তখন বুঝা গেল যে, তাঁহার সর্ব্ব বন্ধন ছেদন হইয়াছে।

দেবাদিদেব মহাদেব-অবতার শ্রীঅদ্বৈত সকল ভক্তের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার দাস্যভক্তি। তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়া শ্রীভগবানকে পূজা করিতেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ, যাজক ও মন্ত্রবিৎ। তিনি পূজা অর্চ্চনা আদি সমুদায় ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন। নৃত্য গীত তাঁহার ভজন নয়। যখন তিনি প্রভুর প্রকাশ দেখিলেন, তখন নানা উপহারে ও শাস্ত্র বিধানে শ্রীভগবানের চরণ পূজা করিলেন।

কিন্তু তখনও তাঁহার জাড্য রহিয়াছে। পূজা সমাপ্ত হইলে প্রভু বলিলেন, "নাড়া, একবার নৃত্য কর।" অমনি সেই পরম-গম্ভীর পৃথিবী-পূজিত বৃদ্ধব্রাহ্মণ ভঙ্গি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সে ভঙ্গি দেখিয়া প্রভু পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন নৃত্য করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইল। সার্ব্বভৌম নৃত্য করিতেছেন, অতএব তাঁহার সর্ব্ব বন্ধন ছেদন হওয়াতে নাচিবার আর বাধা নাই। কিন্তু নাচিতে বাধা নাই বলিয়াই কি লোকে নাচে? তা ত পারে না? ঘরে দ্বার দিয়া কি কেহ আপনা আপনি নাচিতে পারে? তাহার সে ইচ্ছা হইবে কেন? নাচিবার কারণ চাই, কিছু উত্তেজক মাদক দ্রব্য চাই। সেই মাদক ভট্টাচার্য্যের পক্ষে হইতেছে—প্রেম ও ভক্তি। ভট্টাচার্য্য মুক্ত হইয়াছেন শুধু নয়, সেই সঙ্গে নৃত্য করিবার শক্তি, যে শক্তি কেবল বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তিতেই আছে,—উহা পাইয়াছেন; তাই প্রভুর হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এখন ব্রজের দুই সখীর একটী কাহিনী শ্রবণ করুন—

প্রথম সখী। ভদ্রে একি? তুমি যে নৃত্য করিতেছ?

দ্বিতীয় সখী। কেন? একটু নাচিব না? তোরা নাচিস্, আমি কেন নাচিব না?

প্রথম সখী। আমরা নাচি, আমরা কুলটা, আমরা কুল হারাইয়াছি, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমাদের অনেক প্রভেদ। তুমি কুলবালা, ধীর, গম্ভীর; আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার দেখিয়া তুমি ঘৃণায় মূর্চ্ছিত হইতে, আমাদিগকে নিন্দা করিতে; এমন কি, আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এ দশা কেন?

দ্বিতীয় সখী। সই! আমিও শ্যামের হাতে কুল হারাইয়াছি।

প্রথম সখী। সে কি! সই, তুই এত বড় গম্ভীর, তোর এ দশা হইল, কেন বল্ দেখি?

দ্বিতীয় সখী। শুন্‌বি?

শুন সই মনের মরম। ধ্রু

এত দিন জাতি কুল, রাখিয়াছিলাম গো,
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম॥
কানু সেই কালিন্দি তীরে, মুই গেনু যমুনা নীরে,
গা খানি মাঝিতেছিলাম একা।
যুবতীর চিতচোরা, জলের ভিতরে গো,
যৌবন-রতনে দিল দাগা॥
হৃদয়ের মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো,
উপরেতে ঝাঁপি দিলাম বাস।
হেনকালে গুরুজনা, চিনিতে নারিল গো,
অনুমানে কহে কানুদাস॥*

সার্ব্বভৌম শ্যামকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, নাচিয়া উঠিলেন, আর তখনি "অনুমানে" বুঝা গেল যে তাঁহার হৃদয়ে শ্যামকে আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন!

ভক্তগণ তখন সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই বৃদ্ধ দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ, সেই গর্ব্বিত দণ্ডীদিগের গুরু, সেই জ্ঞানের প্রস্রবণ, সেই নদীয়া-বিজয়ী পণ্ডিতের নৃত্য, ইহাও যেরূপ অদ্ভূত, পশ্চিমে সূর্য্য উদয়ও সেইরূপ অদ্ভুত। ভক্তগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, প্রেমের নৃত্য ক্রমে প্রস্ফুটিত ও মধুর হয়। প্রথম

* এ ছড়াটী অতি অপূর্ব্ব সুরে শ্রীবদন অধিকারী গাইতেন।

দিনকার নৃত্যে মাধুর্য্যের সঙ্গে একটু হাস্য-উদ্দীপকও থাকে। যে ব্যক্তি কখন নৃত্য করে নাই, যাহার করিবার সম্ভাবনা ও নাই, যে যদি নৃত্য আরম্ভ করে, তবে তাহার নৃত্য প্রথম প্রথম কতকটা হস্তীর কি গণ্ডারের নৃত্যের ন্যায় হয়। সার্ব্বভৌম সেইরূপ হেলিয়া কত ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহাতে—

ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ।—চরিতামৃত।

গোপীনাথ বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য কর কি? তোমার পড়ুয়াগণ কি বলিবে? ত্রিভুবন কি বলিবে? বলিবে যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পাগল হয়েছে। ছি! সম্বরণ কর। তোমার নৃত্য করিতে লজ্জা করিতেছে না?"

তখন সার্ব্বভৌম এই অপরূপ শ্লোকটী রচনা করিয়া বলিলেন। যথা—

পরিবদতু জনো যথা তথায়ং,
নন্থ মুখরোঽয়ং ন বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা,
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥

অয়ে! মুখর লোকে যেখানে সেখানে নিন্দা করে করুক, কিন্তু আমরা বিচার করিব না, হরিরস মদিরায় অতিশয় মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠন করিব, নৃত্য করিব ও পতিত হইব।

তাহার পরে সকলে ধরিয়া সার্ব্বভৌমকে শান্ত করিলেন। প্রভুও ভক্তগণ সঙ্গে বাসায় আসিলেন।

একটু পরে সার্ব্বভৌমও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা চন্দ্রোদয়ে—

প্রভু দরশনে তবে চলে শীঘ্রগতি।
পাছে এক ভৃত্য তাঁর চলিল সংহতি॥

জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি।
প্রভুর বাসার কাছে যান ত্বরা করি॥
তাঁর ভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তাঁরে কয়।
জগন্নাথ মন্দিরের পথ এই নয়॥

সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া ভৃত্যের এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। সার্ব্বভৌমের ভৃত্যগণ, তখন সকলে বুঝিয়াছে যে, তিনি আর এখন ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি যে একটু পূর্ব্বে ঘরের পিড়ায় অচেতন হইয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানিয়াছে, কেহ বা দেখিয়াছে। সে সম্বন্ধে তাহাদের মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছে; নবীন সন্ন্যাসী তাঁহাকে পাগল করিয়াছেন, এ কথাও উঠিয়াছে। সার্ব্বভৌম ঢুলিতে ঢুলিতে চলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ ঐরূপ সময়ে শ্রীঠাকুর দর্শন করিতে গমন করেন। সে দিবস তাহা না করিয়া মন্দিরের পথ ছাড়িয়া, অন্যপথে চলিলেন। কাজেই ভৃত্য ভাবিল, ভট্টাচার্য্যের এখনও চৈতন্য হয় নাই। তাই বলিল, "ঠাকুর ও পথে নয়, ও পথে নয়!"

তাহার পরে শ্রবণ করুন। সার্ব্বভৌম আসিতেছেন, আর—

—ভট্টাচার্য্য মনে মনে কথা কয়।
গোপীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয়॥
সত্য গৌর ভগবান সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
সে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর॥
এই মনে ভাবি শীঘ্র দেখিতে চলিল।
আপন মাসীর পুরদ্বারে উত্তরিল॥
গোপীনাথ আচার্য্য ভট্টাচার্য্যেরে দেখিয়া।
অগ্রসরি তথা হইতে আইল উঠিয়া॥

গোপীনাথ দেখি সার্ব্বভৌম সুখী মর্ম্মে।
জিজ্ঞাসিল মহাপ্রভু আছেন কিবা কর্ম্মে॥
গোপীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া।
এসো এসো প্রভু চরণ দেখি গিয়া॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

সার্ব্বভৌম অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া প্রথমে প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এ প্রণাম আর এক প্রকার, পূর্ব্বকার "রোগী যেন নিম খায় নয়ন মুদিয়া," মত নয়। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দুই কর যুড়িয়া অগ্রে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌমের প্রেমধারা পড়িতেছে, ও তিনি গদগদ হইয়া এই দুইটী শ্লোক উপস্থিত মত রচনা করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। যথা, চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

নানালীলারসবশতয়া কুর্ব্বতো লোকলীলাং
সাক্ষাৎ করোঽপি চ ভগবতো নৈব তত্ত্ববোধঃ।
জ্ঞাতুং শক্নোত্যহ ন পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তিতরাং লোহমাত্রং ন হেম॥

অপিচ স্বজনহৃদয়সদ্মা নাথ পদ্মাধিনাথো
ভুবি চরসি যতীন্দ্রচ্ছদ্মনা পদ্মনাভঃ।
কথমিহ পশুকল্পাস্ত্বামনল্পানুভাবং
প্রকটমনুভবামো হন্ত বামো বিধির্নঃ॥

সার্ব্বভৌম পরে করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু! গোপীনাথ আমাকে তোমার পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তর্কনিষ্ঠ মনে তাহা বিশ্বাস হইল না। আমি তাই তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। প্রভু! তবু আমার অপরাধ কি? তুমি নানা লীলা কর। এখন মনুষ্যরূপ ধরিয়া কপট সন্ন্যাসী হইয়া আমার অগ্রে আসিয়াছ। আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব? তোমার যদি ইচ্ছা হয় যে তুমি গোপন থাকিবে,

তবে আমি কিরূপে তোমার সে রহস্য ভেদ করিব? আমি তর্কনিষ্ঠ, তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা পাইলাম না, কাজেই তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি কৃপালু। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিলে। আমার তর্কনিষ্ঠ মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে। স্পর্শমণিকে কেহ চিনিতে পারে না, চেনাইতে হইলে উহা দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়। প্রভু! আমি তর্ক করিয়া যে লৌহপিণ্ড হইয়াছিলাম, আমাকে স্পর্শন দ্বারা যখন দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি স্পর্শমণি।

সার্ব্বভৌমের আর দম্ভ নাই। তিনি তখন বিনয়ী, দীনহীন, কাঙ্গাল। তখন তাঁহার সর্ব্ব বচন ও সর্ব্ব অঙ্গ মধুময় হইয়াছে। তাঁহার বাক্য শুনিয়া ও ভঙ্গি দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন। কিন্তু প্রভু কি করিলেন? তিনি সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ দর্শন করাইয়াছেন, সার্ব্বভৌমকে প্রসাদান্ন ভোজন দ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কিছু মনে নাই। অন্ততঃ সে সমুদায় তাঁহার মনে আছে, কি কস্মিন্‌কালে অবগত ছিলেন, তাঁহার কথায় ও ভঙ্গিতে তাহা কিছুমাত্র বোধ হইল না। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিয়া স্তব করিতেছেন শুনিয়া তিনি প্রথমে যেন বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন, শেষে আর শুনিতে পারিলেন না, তাই—

দুই হস্তে ভগবান, আচ্ছাদিল দুই কাণ,
সার্ব্বভৌমে কহেন বচন।
শুন ভট্টাচার্য্য তুমি, তোমার বালক আমি,
মোরে কোথা করিবে বাৎসল্য।

তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমনে যে কথা কও,
লোক উপহাসের প্রাবল্য ॥”—(চন্দ্রোদয়।)

সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিতেছেন, “আমি তোমার বালক, তুমি আমাকে কেন লজ্জা দিতেছ?” গোপীনাথ তখন আর থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, “ভট্টাচার্য্য! কেমন বলেছিলাম, এখন ঠিক হ’লো?” ভট্টাচার্য্য গোপীনাথের পানে চাহিলেন। আর দ্বন্দ্বের ইচ্ছা নাই, বিদ্রূপের শক্তি নাই। সার্ব্বভৌম কৃতজ্ঞ চক্ষে গোপীনাথকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “গোপীনাথ! আমার এই সম্পত্তি কেবল তোমা হতে। আমি প্রভুর কৃপা পাইবার কিছু করি নাই, কোন মতে উপযুক্তও নহি। তবে তুমি প্রভুর ভক্ত, আর আমার দুরবস্থায় তোমার বড় দুঃখ হইতেছিল। প্রভু তোমার দুঃখ দেখিতে পারিলেন না, তাই তোমার নিমিত্ত আমাকে উদ্ধার করিলেন।”

এ কথা শুনিয়া প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন মহাপ্রীতিতে দুইজনে বসিয়া ভক্তিতত্ত্ব কথা কহিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম তখন বেদ ও নানা শাস্ত্র হইতে, শ্রীভগবানের ভক্তিই যে জীবের পুরুষার্থ, তাহা প্রমাণ করিলেন। প্রভু মহাসুখে শুনিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, আমি এখন কি করিব? আমাকে উপদেশ করুন।” প্রভু বলিলেন, “কেন? শাস্ত্র ত উপদেশ করিয়াছেন, হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর গতি নাই।” ইহা বলিয়া প্রভু “হরের্ণামৈব কেবলং” শ্লোক পাঠ করিলেন। এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য এ শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিলেন।

প্রভু আবিষ্ট হইয়া অর্থ করিলেন। এই এক সামান্য শ্লোকের দ্বারা প্রভু জীবের কি ধর্ম্ম তাহা বিস্তার করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্ব্বভৌম

শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। এ শ্লোকের মধ্যে যে এত নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহা তিনি কস্মিন্‌কালেও জানিতেন না।

প্রভু এই শ্লোকের অর্থ দুই তিন স্থানে করিয়াছেন। কিরূপ অর্থ করেন, তাহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়, তাহা আমি প্রথম খণ্ডে দিয়াছি।

সার্ব্বভৌম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও যাইবার সময় জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তাহার পরে—

উত্তম উত্তম প্রসাদ তাহাই আনিল।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিল॥
নিজ দুই শ্লোক লেখি এক তালপাতে।
প্রভুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ হাতে॥—শ্রীচরিতামৃত।

এই দুই শ্লোক ও প্রসাদ লইয়া চারিজনে প্রভুর নিকট আসিলেন। মুকুন্দ, জগদানন্দের হাতে তালপাত দেখিয়া, উহা লইয়া শ্লোক পাঠ করিলেন। তিনি বুদ্ধির কার্য্য করিয়া ঐ দুই শ্লোক ঘরের প্রাচীরে লিখিয়া রাখিলেন। জগদানন্দ সেই পত্র প্রভুর হাতে দিলেন, প্রভু পড়িয়া অমনি চিরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতে শ্লোক নষ্ট হইল না, যেহেতু মুকুন্দ পূর্ব্বে উহা প্রাচীরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠমণি হার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যকার॥—শ্রীচরিতামৃত।

সে দুই শ্লোক এই—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগঃ, শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥১॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥২॥

সার্ব্বভৌম প্রথমে এই দুই শ্লোকে পরিচয় দিলেন যে, প্রভু তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইয়াছেন। এই দুই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, "সেই পুরাণ পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীভগবান, দেখিলেন যে তাঁহাতে যে ভক্তি ইহা ক্রমে নষ্ট হইতেছে, অতএব জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধরিয়া যিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্ম আমার চিত্ত-ভৃঙ্গ গাঢ়রূপে প্রাপ্ত হউক।"

সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে আর গোটা দুই কথা বলিতে বাকি আছে। সার্ব্বভৌমের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

সার্ব্বভৌম হইল প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥

কিন্তু সার্ব্বভৌমের মনের কি ভাব হইল তাহার অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। তিনি স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে স্তুতি করিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম শ্লোকচ্ছন্দে প্রভুর রূপ ধ্যান প্রভৃতি বর্ণনা করিতেন। পাঠক মহাশয়! আমি সেই গ্রন্থ হইতে গোটা কয়েক শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

উজ্জ্বল বরং গৌরবর দেহং, বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহং।
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
অরুণাম্বর ধর সুচারু কপোলং, ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং।
জল্পিত নিজ গুণ নাম বিনোদং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥

বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, ভূষণ নব রস ভাব বিকারং।
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
চঞ্চল চারু চরণগতি রুচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
ভূষণ ভূরজ অলকাবলিতং, কম্পিত বিম্বাধর বর রুচিরং।
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
নিন্দিত অরুণ কমলদল নয়নং, আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলং।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তক বেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
নব গৌরবরং নব পুষ্পশরং, নব ভাবধরং নবোল্লাস্যপরং।
নব হাস্যকরং নব হেমবরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নব প্রেমযুতং নবনীতশুচং, নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং।
নবধা বিলাসং সদা প্রেমময়ং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
হরিভক্তি পরং হরিনাম ধরং করজপ্য করং হরিনাম পরং।
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
নিজভক্তি করং, প্রিয় চারুতরং, নট নর্ত্তন নাগরী রাজকুলং।
কুলকামিনী মানসোল্লাস্যকরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
করতাল বলং নীলকণ্ঠ করং, মৃদঙ্গ রবাব সুবীণা মধুরং।
নিজভক্তি গুণাবৃত নাট্যকরং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
যুগধর্ম্মযুতং পুন নন্দসুতং, ধরণী সুচিত্রং ভবভাবোচিতং।
তনু ধ্যান চিত্রং নিজবাস যুতং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
অরুণনয়নং চরণবসনং, বদনে স্খলিত স্বনাম মধুরং।
কুরুতে সুরসং জগতো জীবনং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥

এই শ্লোকগুলি সার্ব্বভৌমের। তিনি চর্ম্মচক্ষে ও দিব্যচক্ষে প্রভুকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা উপ শ্লোকগুলি দ্বারা বুঝা যাইবে।

শ্রীনিমাইয়ের কি রূপ, কি গুণ, কি প্রকৃতি ছিল, ভারতবর্ষের তখনকার সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত এই শ্লোকগুলি দ্বারা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন।

ভক্তগণ এই শ্লোকগুলি দ্বারা প্রভুর রূপ, গুণ ও ধ্যান হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লউন।

সার্ব্বভৌম উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু এখন বাকি রহিলেন, রূপ, সনাতন, রামানন্দ রায়, বৌদ্ধাচার্য্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। প্রভুর কার্য্য করিতে বড় বড় যে সকল বাধা ছিল, সে সমুদায় আপনি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত করিতেছেন। যে কার্য্য ভক্তের দ্বারা সম্ভব, তাহা ভক্তের দ্বারা করাইতেছেন; যাহা ভক্তের দ্বারা সম্ভব নয় তাহা আপনি করিতেছেন। প্রভুর প্রথম বাধা নবদ্বীপের কোটাল জগাই মাধাই। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় বাধা চাঁদকাজী, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। তৃতীয় বাধা অধ্যাপক পণ্ডিত ও নৈয়ায়িকগণ। ইহাদের আদিস্থান শ্রীনবদ্বীপ, আর এ সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদীসম্মত রাজা শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম। প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। এখন বাকী রহিলেন কয়েকজন; তাঁহাদের ও অন্য সকলের কথা ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখন একটু বলি।

নবদ্বীপ যেরূপ ন্যায়, তন্ত্র, স্মৃতি ও পূরাণের স্থান, কাশী সেইরূপ বেদের স্থান। বেদ পড়িতে কাশীতে যাইতে হয়, সেখানকার উপাস্য দেবতা শঙ্করাচার্য্য, সেখানে তখনকার তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন্দ সরস্বতী। এই প্রকাশানন্দ দশ সহস্র শিষ্য লইয়া কাশীতে বিরাজ করেন। ইনি সার্ব্বভৌমের ন্যায় ভারতবিখ্যাত। সার্ব্বভৌম যেরূপ নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ, প্রকাশানন্দ ঐরূপ কাশীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ। শঙ্করাচার্য্যের মত ও প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মত ঠিক বিপরীত। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "আমি তিনি, তিনি আমি।"

প্রভু বলেন, "আমি তাঁর, তিনি আমার।" শঙ্করাচার্য্যের মত যদি ঠিক হয়, তবে প্রভুর মত বাতুলামি। যদি প্রভুর মত সত্য হয়, তবে শঙ্করের মত কর্ত্তব্যে নাস্তিকতা।

শঙ্করের মতে অনেকে আকৃষ্ট হয়েন, তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ বড় হইতে সকলের সাধ, আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড়লোকের দ্রব্য। জ্ঞানীলোকে ভক্তের ভাবকালি দেখিয়া হাসিবেন, আর ভক্তের ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ জ্ঞানীর এমন কিছু নাই যাহা ভক্তগণের বিদ্রূপের সামগ্রী হইতে পারে। জ্ঞানীলোকে বলিবেন, "স্ত্রীলোকে রোদন করে, তুমি রোদন কর কেন? নৃত্য কর তোমার লজ্জা করে না? এই মাটীতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া ঢলিয়া পড়, এই কি মনুষ্যত্ব?" এই সমুদায় জ্ঞানীলোকের বিদ্রূপবাণের তীক্ষ্ণ আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার ভক্তের কোন কবচ নাই। এ সমুদায় কথা শুনিয়া ভক্তের পরাজিত হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কাজেই সাধারণের ধারণা যে, শঙ্করের ধর্ম্ম বড় লোকের ধর্ম্ম, আর ভক্তের ধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। কাজেই লোকে স্বভাবতঃ শঙ্করের ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চায়।

দ্বিতীয়তঃ শঙ্করের ধর্ম্মযাজন অপেক্ষাকৃত সহজ। শঙ্করের ধর্ম্মপালন করিতে আরাম আছে। "আমি তিনি, তিনি আমি" এই বলিয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার আর কোন ভজনের কাজ রহিল না, কেবল খাও আর আমোদ কর। পিতা যত্ন করিয়া পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করান। বিদ্যাভ্যাস করিলে তাঁহার পুত্রের মানসিকবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে ও পরকালে ভাল হইবে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পুত্রের নিকট এ শাসন ভাল লাগে না। বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট। এ ভুবনে পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই লাভ হয় না। কিন্তু পুত্রের এ কষ্ট সহ্য হয় না। পিতা

মরিয়া গেলেন, তখন পুত্র ভাবিল, "বাঁচিলাম, আর পড়িতে হইবে না।" এইরূপে, ভজন নাই এরূপ ধর্ম্মযাজন প্রথম সুলভ, তাই অনেকে উহাতে আকৃষ্ট হয়েন। তাঁহারা জানেন না যে, ভজনের ন্যায় সুখ ত্রিভুবনে আর নাই। তাহা জানিলে, আর ভজনকে একটি কষ্টকর দণ্ড বলিয়া ভাবিতেন না।

ভক্তের ধারণা যে, শ্রীভগবদ্ভক্তি সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ কাজ শ্রীভগবানের ভজন। মোটামুটি, ভক্ত হওয়া অপেক্ষা কর্ত্তব্যে নাস্তিক হওয়ায় আপাততঃ অনেক সুবিধা আছে।

কিন্তু ভক্তিধর্ম্মের আবার একটী শক্তি আছে, সে অনির্ব্বচনীয় ও অনিবার্য্য। একটী গল্প এখানে বলিব। বৈদ্যনাথ দেওঘরে একজন তেজস্কর সন্ন্যাসী আমাকে দর্শন দিতে আসিলেন। তিনি বাঙ্গালী, ইংরাজী জানেন, সবল, ৫৫ বৎসর বয়স্ক। দেখিলাম, লোকটি সাধু বটে। আমি প্রণাম করিয়া আদর করিয়া বসাইলাম। কিন্তু মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম, যেহেতু আমি তখন বিরলে কিঞ্চিৎ ভজন করিতে যাইতেছিলাম। ভাবিলাম, অগত্যা আজ এই সন্ন্যাসীকে লইয়াই ভজন করিতে হইল; দেখি, যাহা আমার কপালে থাকে।

আমি বলিলাম, "ঠাকুর! তুমি কি কর, তোমার এ ব্রতের উদ্দেশ্য কি?" সন্ন্যাসী তখন নানা কথা বলিলেন। দেখিলাম, তিনি একপ্রকার উদ্দেশ্যশূন্য। বলিতে কি, জীবমাত্রেই প্রায় উদ্দেশ্যশূন্য! যে কোন সাধু হউন, যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি যে এই কষ্ট করিতেছ, ইহা কি নিমিত্ত? তবে দেখিবে যে, অনেক সময়ে তিনি নিজের কি উদ্দেশ্য তাহা ভাল করিয়া জানেন না।

ঠাকুরের মনের ভাব এই যে, তিনি একটি ভাল কাজ করিতেছেন; কিন্তু সে ভাল কাজ কি, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। আমি

লাম, "ঠাকুর! তুমি যে সমুদায় বড় বড় কথা বলিতেছ, উহার অধিকারী আমি নই। তুমি কৃপা করিয়া অধমের বাড়ী পদধূলি দিয়াছ, আমি তোমাকে দুই একটী গীত শুনাইব।" ইহা বলিয়া আমি স্বরে স্বরে মিলাইয়া, একটি বিখ্যাত মহাজনের পদ গাইতে লাগিলাম। সে পদটির প্রথম চরণ এই, যথা—

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদমুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি, (সজনী গো!)।

এ পদটি কেন গাইলাম বলিতেছি। আমি শ্রীভগবানের ভজন করিতে যাইতেছিলাম; যাইতে পারিলাম না, তাহাতে আমি একটু দুঃখ পাইলাম। মনের মধ্যে এই ভাব ছিল বলিয়া উপরিউক্ত পদটি আমার মুখে আসিল।

এই প্রথম চরণ গাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, ঠাকুরের বদন ভক্তিতে লাবণ্যময় হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তাহার পরে দ্বিতীয় চরণ গাইলাম, যথা—

দুই ভুজ-লতা দিয়া, হৃদিমাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তারে রাখি, (সজনী গো)

তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর অত্যন্ত অধীর হইলেন। তাঁহার সুন্দর বদন বাহিয়া অতি পরিসর ধারা পড়িতে লাগিল।

একটু পরে সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্ত হইলেন। কাঁদিয়া ঠাকুরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, বদন অতি কমনীয় হইয়াছে। বলিতেছেন, "এই ঠিক, আমি ইহাই চাই। আমি এ সম্পত্তি কিরূপে পাইব, তাহারই নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

যাহা স্বাভাবিক মিষ্ট তাহা প্রমাণ করিতে কষ্ট নাই। সদ্যোজাত শিশুর মুখে এক বিন্দু তিক্ত দিলে সে কান্দিয়া উঠিবে,—এক বিন্দু মধু

দিলে চাটিতে থাকিবে! তাহাকে আর একথা বুঝাইতে হয় না যে, এ বস্তু তিত, এ বস্তু মিঠা। আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কখনই বুঝাইতে পারিতাম না যে, ভক্তি-ধর্ম্ম বলিয়া একটি সামগ্রী আছে, যাহা অতি মধুর, অতি সরল ও অতি তেজস্কর। তাহা করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিত। তবে আমি করিলাম কি, না, তাঁহার বদনে, আস্বাদ করিতে, ভক্তিধর্ম্মরূপ মধু এক বিন্দু দিলাম। তিনি চাকিলেন, আর বেশ! বেশ! বলিয়া আনন্দে অধীর হইলেন।

শ্রীভগবানের সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আম্র দেখিতে সুন্দর, শুঁকিতে সুন্দর, আস্বাদিতে সুন্দর। সেইরূপ ভক্তিধর্ম্ম যাজন যে জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার কয়েকটি সহজ লক্ষণ একে একে বলিতেছি।

শ্রীভগবান আছেন, অর্থাৎ একজন যে কর্ত্তা আছেন, ইহা মনুষ্যমাত্রের মনের অটল ভাব। যাঁহারা মুখে বলেন, শ্রীভগবান নাই; তাঁহারা মুখে মুখে বলেন, মনে বলিতে পারেন না। কারণ, যেমন মস্তক না থাকিলে জীবন থাকে না, সেইরূপ ভগবান নাই, এরূপ বিশ্বাস মনুষ্যের না থাকিলে, তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্বই থাকে না। সার কথা, যখন শ্রীভগবান আছেন, মনুষ্যমাত্রকে স্বভাব এই ভাব দিয়াছেন, তখন অবশ্য শ্রীভগবান আছেন।

দ্বিতীয়তঃ, জীব দিবানিশি নিরাশ্রয়ে ভাসিতেছে। সেই নিমিত্ত জীবের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়িলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। যখন আপনি নিবারণ করিতে না পারে তখন কান্দিয়া বলে, "শ্রীভগবান রক্ষা কর।" যদি শ্রীভগবান রক্ষা-কর্ত্তা না হইতেন, তবে স্বভাব মনুষ্যকে "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং" এ ভাব দিতেন না। ইহাতে কি বুঝিলাম, না—"হে শ্রীভগবান! তুমি আমার আশ্রয়।

আমি দুর্ব্বল জীব, বিপন্ন, আমাকে রক্ষা কর।” এই যে ভাব ইহা স্বভাবসিদ্ধ।

আর, ভাবকেই ভক্তিধর্ম্ম বলে; অতএব ভক্তি-ধর্ম্ম স্বাভাবিক। লোকে যাহাকে শঙ্করাচার্য্যের মত বলিয়া থাকেন, ইহা তাহার বিপরীত। অতএব ভক্তি বলিয়া একটী মানসিক বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তি আলোচনা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কাজেই উহা আলোচনায় সুখ আছে। লোকে তাই ভক্তির সামগ্রী খুঁজিয়া বেড়ায়, পাইলে কৃতার্থ হয়। এইরূপে কেহ স্বামীকে, কেহ গুরুকে, কেহ রাজাকে, আপনার ভক্তিটুকু দিয়া সুখ ভোগ করেন।

ত্রিপুরার মহারাজা সিংহাসনে বসিয়া। সরস্বতীর কৃপা-পাত্র যদুভট্ট তাম্বুরা লইয়া তাঁহার নিজ কৃত গীত দ্বারা মহারাজের সম্মুখে বসিয়া স্তুতি করিতেছেন। সুস্বরে তান লয় মিল করিয়া, তিলোক-কামোদ রাগিণীতে নিজ-কৃত এই গীত গাইতেছেন, যথা—

জয়তি ত্রিপুরেশ্বর দয়াল বীরচন্দ্র,
গুণী-জন প্রতিপালন,
তোমা সমান দাতা কই নাহি রাজা।

এই গীত শুনিয়া মহারাজের হৃদয় দ্রব হইল; গাইতে গাইতে যদুভট্টের হৃদয় আরো দ্রব হইল। উভয়ে উভয়ের রসে পরিপ্লুত হইলেন। মহারাজ ভক্তিরূপ সুধা গ্রহণ ও ভট্ট উহা প্রদান করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। উপরে ভক্তির একটি ছবি দিলাম। সিংহাসনে সামান্য রাজাকে না বসাইয়া যদি রাজার রাজাকে বসাও, আর যদুভট্টের স্থানে একজন ভক্তকে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে বিশুদ্ধ ভক্তির একটি নিদর্শন পাইবে। প্রথমতঃ

ভক্তি-ভজন কিরূপ মধুর বুঝিবে, তবে ভক্তি হইতে প্রেম-সাধন আরো মধুর লাগিবে।

কিন্তু এই ভক্তি আলোচনার সুখে একটী বাধা আছে। ভক্তির পাত্র-মাত্রেই মলিন ও স্বার্থপর। এইরূপে পতিব্রতা স্ত্রী পতির মলিনতা ও স্বার্থপরতা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পায়েন, আর এইরূপে শিষ্য গুরুর মলিনতা দেখিয়া ক্লেশ পায়েন। সুতরাং ভক্তি হইতে তখনই অখণ্ড সুখোৎপত্তি হয়, যখন উহা শ্রীভগবানে অর্পিত হয়, যেহেতু তিনি দোষশূন্য ও গুণময়। অতএব হে মূর্খ-জীব! শ্রীভগবান না থাকিলে স্বভাব কি কখন ভগবদ্ভক্তি দিতেন? স্বভাব জীবকে ভগবদ্ভক্তি দিয়াছেন; ইহাতে প্রমাণ করিতেছে যে, শ্রীভগবান আছেন। জীবের আনন্দের একটী প্রস্রবণ প্রেম, আর একটী প্রস্রবণ ভক্তি। তাই শ্রীভগবান জীবকে কৃপা করিয়া "ত্রাহি মাং রক্ষ মাং," কি "তুমি কৃপাময় ও পবিত্র ইত্যাদি," কি "তুমি নয়নানন্দ" বলিয়া পূজা করিয়া আনন্দভোগ করিবার নিমিত্ত ভক্তি ও প্রেম দিয়াছেন।

তাহার পরে ভক্তি-ধর্ম্ম চর্চ্চা যে মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহার আরো কারণ বলিতেছি। ভক্তি-ধর্ম্ম আম্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। গোপীগণ কি আয়োজনে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, দ্বিতীয় খণ্ডের মঙ্গলাচরণে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তি-ধর্ম্ম যাজন করিবার উপকরণগুলি একবার স্মরণ করুন। যথা, পূর্ণিমানিশি, বৃন্দাবন, কুসুম-কানন, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি। ইহা যাজন করিলে বাহ্য-সৌন্দর্য্য হয়, প্রতি অঙ্গ লাবণ্যময় হয়। যিনি যাজন করেন, তাঁহার নয়ন মনোহর, গলার সুর মধুর ও হৃদয় কোমল হয়। সুতরাং তাহাতে তাঁহার জ্ঞানরূপ বীজ

সহজে ফলবতী হয়। তাঁহার প্রকৃতি মধুর হয়, আর তাঁহার দশদিক সুখময় বোধ হয়।

উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রধান বিরোধী শঙ্করাচার্য্য। অন্ততঃ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য জ্ঞানী সন্ন্যাসীগণ যেরূপে ব্যাখ্যা করেন, উহা ভক্তি-ধর্ম্ম বিরোধী। তাঁহার তখনকার প্রধান পাণ্ডা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, আর প্রভুর তখন প্রকাশানন্দকে উদ্ধার কার্য্য বাকী রহিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে এই প্রধান কার্য্য সমাধা হয়।*

চতুর্থ অধ্যায়

তোরা আয়রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সঙ্কীর্ত্তন।
তোদের ভবের মেলা ধূলা খেলা, হারাস্‌নে জীবন রতন।
তোদের গোলোকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন।

মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস লইয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিলেন। চৈত্র মাস আসিয়াছে, প্রভু ভক্তগণ লইয়া সার্ব্বভৌমের মাসীর বাড়ীতে বাসা করিয়া আছেন। গোবিন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর ভিক্ষা করেন, আর প্রায়ই সার্ব্বভৌম ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করেন। প্রভু অতি গোপনে বাস করিতেছেন। ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা থাকেন, কেহ নিকটে আসিতে পারে না। প্রভুর মহিমা কাজেই নীলাচলবাসীরা ভাল করিয়া জানিতে পারিলেন না।

* যাঁহারা প্রকাশানন্দের উদ্ধার বিবরণ জানিতে উৎসুক, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার কৃত "প্রবোধানন্দ ও গোপালভট্ট" পড়িবেন।

তবে অবশ্য কিছু কিছু জানিতে পারিলেন। সার্ব্বভৌম ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন। কথায় আছে, গুপ্তপ্রেম গুপ্ত থাকে না। সার্ব্বভৌম আপনার দশা গোপন করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পূর্ব্বে তাঁহার এক ভাব, এখন আর এক ভাব। পূর্ব্বে দাম্ভিক, এখন অতি বিনয়ী। পূর্ব্বে নীরস গভীর কঠিন, এখন সর্ব্বদা তরল চঞ্চল প্রফুল্ল মধুর ও পরোপকারী। কথায় কথায় নয়নে জল আসিয়া, তাঁহার গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করে। পড়ুয়াগণ ইহা জানিল; আর ইহাও জানিল যে, এ সব নবীন সন্ন্যাসীর কার্য্য। সুতরাং এ কথা নীলাচলময় ব্যক্ত হইল যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এখন বড় ভক্ত হইয়াছেন। আর তাঁহার পরিবর্ত্তনের কারণ, একজন অতি সুন্দর নবীন-বয়স্ক সন্ন্যাসী। কিন্তু তবু নীলাচলবাসী কেহ প্রভুকে দেখিতে আসিলেন না। তাহার নানা কারণ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, পুরী তখন সাধু ও সন্ন্যাসীতে পরিপূরিত, কে কাহার তল্লাস করে?

প্রভু নীলাচলে দোল দেখিলেন, সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন; পরে এক দিবস ভক্তগণকে লইয়া যুক্তি করিতে বসিলেন। সকলে প্রভুকে ঘেরিয়া বসিলেন। প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হস্ত ধরিয়া ও অন্যান্য ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার চিরদিনের বান্ধব; তোমাদের ঋণ শোধ দিব, এমন আমার কিছু নাই। তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে নীলাচলচন্দ্র দেখাইলে, এখন আমাকে সেইরূপ কৃপা করিয়া অনুমতি কর, আমি দক্ষিণ-দেশ যাইব।"

শ্রীনিত্যানন্দ দক্ষিণ যাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আরও

বলিলেন, "তুমি নীলাচলে বাস করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, এখন আবার নীলাচল পরিত্যাগ কিরূপে করিবে?"

প্রভু বলিলেন, "আমার দাদা প্রায় বিংশতি বৎসর অনুদ্দেশ হইয়া দক্ষিণদেশে গমন করেন। আমি এতদিন তোমাদের ও জননীর গাঢ় অনুরাগে তাঁহার তল্লাস লইতে পারি নাই। এখন আমি তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছি। অতএব আমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহার তল্লাস করা।"

এখন এখানে একটি নিগূঢ় রহস্য বলি। বিশ্বরূপ পুনানগরের নিকট পাণ্ডুপুরে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে, অদর্শন হয়েন। শিবানন্দ সেন উহা জানিতে পান। তাঁহার পুত্র কবিকর্ণপুর পিতার মুখে সেই ঘটনা শুনিয়া তাঁহার কৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যথা—

যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ
নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ।
ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মা
ভবন সদা বৈষ্ণববর্গ মধ্যে।
জজ্জাল তিগ্মাংশু সহস্রতেজা
ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত॥

তথা ভক্তমাল গ্রন্থে—

শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥

নিত্যানন্দ-প্রভুতে এক শক্তি সঞ্চারিল।
ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজঃ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥

অতএব বিশ্বরূপ দেহ ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার ছোট ভাই নিমাইকে ত্যাগ করেন নাই। বিশ্বরূপ প্রথমে ঈশ্বরপুরীর দেহে প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে মন্ত্রদান করেন। দাদা ব্যতীত আর কাহার নিকট শ্রীভগবান মন্ত্র কেন লইবেন? তাহা হইলে যে তাঁহার মর্য্যাদায় ব্যাঘাত হয়? আবার ঈশ্বরপুরী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বিশ্বরূপ-শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন, করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে একদৌড়ে শ্রীনবদ্বীপে চলিয়া আইসেন। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশে দক্ষিণদেশে গমন করিব!

এখন শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে বিশ্বরূপ, এ কথার অর্থ কি? আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই অতি আশ্চর্য্য সুখপ্রদ কথাটীর বহুতর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি। হে পাঠক! পুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রবণ করুন।

মহাভারতে দেখিবেন, যুধিষ্ঠির বনবাসী বিদুরের পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলে, তিনি তাঁহার পানে ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়া আপন দেহ ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আমাদের শাস্ত্রে পরকায়া প্রবেশ শক্তির কথা সর্ব্বস্থানে উক্ত আছে। সে কথার অর্থ এই। এই দেহটী একটী গৃহ মাত্র, আর অভ্যন্তরে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা বাস করেন। পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা প্রাণ পান, আর দেহ দ্বারা তিনি অর্থাৎ জীবাত্মা জড়জগতের সহিত পরিচয় করেন। জীবাত্মা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শ্রবণদর্শনাদি

করিয়া জড়জগত হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একটি স্বতন্ত্র জীব সৃষ্ট হয়েন। এই পৃথকীকৃত জীবটী, তাহার দেহরূপ গৃহ ভঙ্গ হইলে, অন্য স্থানে গমন করেন। সে স্থান তাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কিন্তু জীবাত্মার গোচর ; এই গেল সর্ব্বসাধারণ নিয়ম।

কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, কোন পৃথকীকৃত জীবাত্মার এ জগতের কোন কর্ম্ম করিতে বাকি আছে, কি ইচ্ছা আছে। তখন তিনি কি করিবেন ? তাঁহার দেহ নাই, সুতরাং জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। তখন তাঁহার অন্যের দেহের সাহায্য লইতে হয়। ইহাকে বলে "ভূতে পাওয়া," কি সাধু ভাষায় "আবেশ"। এইরূপে সুরাসক্ত ব্যক্তি পরকালে মদ্য না পাইয়া, অথচ মদ্যের লোভে অভিভূত হইয়া, তাহার পিপাসা কথঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি করিবার নিমিত্ত, মদ্যপায়ীর দেহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এইরূপে দেহশূন্য-জীবে তাহার শোকাকুল নিজজনকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করে। "চেষ্টা করে" এ কথা উপরে বারম্বার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, চেষ্টা করে, কিন্তু সহজে কি সর্ব্বদা পারে না। যদি দেহশূন্য জীব মনে করিলেই মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিতে পারিত, তবে আর লোকের এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। অতএব দেহশূন্য জীবে মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সর্ব্বদা পারে না, কখন কখন পারে।

কি অবস্থায় পারে, কি অবস্থায় পারে না, তাহা লইয়া অধিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি উদাহরণ বলিতেছি। তুমি তোমার ঘরে বাস করিতেছ। সেখানে যদি কেহ প্রবেশ করিতে চাহে, তবে, তোমার সম্মতি লইয়া কি জোর করিয়া, কি তোমার নিদ্রিত অবস্থায় তোমাকে লুকাইয়া, তাহার যাইতে হইবে। কোন দেহশূন্য

জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিবেন, করিয়া তোমাকে এক কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আপনি তোমার দেহটী লইয়া আমোদ করিবেন, এরূপ বন্দোবস্তে তুমি কখন সম্মত হইতে পার না। অতএব যদি তোমার দেহে, কোন দেহশূন্য জীব প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে, তুমি জান না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার বিরোধী হইয়া থাক, আর তাই তোমার দেহে কেহ সহজে অধিকার করিতে পারে না।

কিন্তু কখন কখন তোমার এরূপ অবস্থা হয় যে, তুমি সচেতন থাক না। তাহা হইলে কেহ অনায়াসে চুপে-চুপে তোমার দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তাই নিদ্রিত অবস্থায় অনেক সময় দেহশূন্য জীবের সহিত পরিচয় হয়। কখন বা তুমি ইচ্ছা করিয়া আপনার দেহে দেহশূন্য জীবকে আসিতে আহ্বান কর। এইরূপে জীবে ইচ্ছামত আবিষ্ট হইয়া থাকে, যেমন বসিয়া প্রেত-সাধন কি স্প্রিচুয়াল সার্কেল করা। কখন বা তুমি অন্যমনস্ক, কি অসাবধান আছ; এমন সময়, ফাঁক পাইয়া, তোমার শরীরে দেহশূন্য জীব প্রবেশ করিল।

স্ত্রীলোকের যে ভূতাবেশ হয়, তাহা প্রায় এই শেষোক্ত রূপে। স্ত্রীলোকের বিরোধ-শক্তি অল্প। কোন একটী দেহশূন্য জীবে হঠাৎ তাহার দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া আর ছাড়িল না। সেই দেহশূন্য জীবের প্রেতভূমি ভাল লাগে নাই; তাহার সেখানে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছা। এখন সে একটী দেহ পাইয়া এ জগতে আবার বাঁচিয়া উঠিল। সে যে দেহ আশ্রয় করিয়াছে, উহা কেন ছাড়িবে? অতএব তাহাকে নানা উপায়ে দেহ হইতে বিতাড়িত করিতে হয়। তাহাকে বলে ভূত-ছাড়ান।

আবার কেহ কেহ শক্তি-সম্পন্ন। তাঁহারা বাহুবলে তোমার গৃহে

প্রবেশ করিতে পারেন, তুমি নিবারণ করিতে পার না। তাঁহারা বড় লোক। তাঁহারা ইচ্ছা কবিলেই তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল জীবের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন। তবে তাঁহারা তাহা বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত করেন না। কারণ তাঁহারা মহৎ লোক। স্বার্থের নিমিত্ত অন্য দেহে বল করিয়া প্রবেশরূপ কুকর্ম্ম তাঁহারা কেন করিবেন ?

যখন দেহ ভঙ্গ হয়, তখন জীব দেহশূন্য হইয়া অন্যস্থানে গমন করে। কখন যোগ-সাধন শক্তিতে কেহ বা দেহ হইতে আপনার আত্মা বাহির করিতে, ও আবার উহা দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন। যখন তাঁহার আত্মা দেহ হইতে বাহির করেন, তখন তাঁহার দেহ মরিয়া পড়িয়া থাকে, আবার যখন তাঁহার আত্মা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সে দেহ বাঁচিয়া উঠে। এইরূপে যোগবলে কোন মনুষ্য, আপন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া, অন্য দেহে প্রবেশ করিতে পারে। ইহাকেই বলে পরাকায়া-প্রবেশ।

অতএব পরকায়া প্রবেশ দুইরূপ। দেহ-বিশিষ্ট মনুষ্যে যোগ-বলে পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন ও দেহশূন্য মনুষ্য, অর্থাৎ মনুষ্য মরিয়া গেলে, পরকায়া প্রবেশ করিতে পারেন।

দেহ-স্বামীর সহিত, দেহশূন্য আত্মা-অতিথির চারি প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে। প্রথম, কোন দেহশূন্য জীব অন্যের শরীরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিলেন; দেহ-স্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিলেন না; তিনি যে সেখানে আছেন তাহা তাহাকে জানিতেও দিলেন না। তিনি দেহ-স্বামীর দেহ-রূপ গৃহে বাস করেন বই ত নয়; দেহ-স্বামীর সহিত প্রত্যক্ষরূপে আর কোন সম্বন্ধ রাখেন না। যেমন বিদুর যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দেহ জীর্ণ হইয়াছিল, আর উহাতে

বাস করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ পৃথিবীতে আর কিছুকাল কোন কার্য্যের নিমিত্ত থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তাই বিদুর আপনার দেহ ফেলিয়া দিয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির জানিতে পারিলেন না যে, বিদুর তাঁহার দেহরূপ গৃহের এক কোণে বাস করিতেছেন।

এইরূপে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেহশূন্য জীব চুপে-চুপে অন্যের দেহে প্রবেশ করেন। সেখানে গোপনে বাস করেন, এত গোপনে যে দেহ-স্বামী পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থিতি জানিতে পারেন না। শিশুগণ, যাহাদের দৈবাৎ দেহ-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ জগতে তাহাদের যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা হয় নাই, তাহারা এইরূপে, তাহাদের ভ্রাতা, কি ভগ্নী, কি পিতা, কি মাতার দেহে চুপে চুপে বাস করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু দেহশূন্য জীব, দেহী-জীবের সহিত আর কয়েক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। এক প্রকার এইরূপ। যথা, দেহশূন্য জীব দেহ-স্বামীর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, করিয়া উহা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। কতক পারিতেছে, কতক পারিতেছে না। আর এক প্রকার এই, দেহশূন্য জীব দেহীর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। কখন সম্পূর্ণ অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া দিতেছে। আর এক প্রকার এই যে, আত্মা অন্যের দেহ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, করিয়া আর ছাড়িয়া দিতেছে না; যাহার দেহ, তাহাকে এক কোণে ঠেলিয়া ফেলিয়া, আপনি দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

এখন এই কয়েক প্রকার পরকায়া-প্রবেশের কথা পর-পর বিবরিয়া বলিতেছি।

প্রথম। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া চুপে-চুপে বাস করিতে লাগিল, দেহ-স্বামী তাহা জানিতে পারিল না।

দ্বিতীয়। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল, কিন্তু দেহটী সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিল না।

তৃতীয়। আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিল ও দেহটী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। এইরূপে ইচ্ছামত দেহটী অধিকার করে, ইচ্ছামত ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটী এইরূপ আবেশের ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত।

চতুর্থ। আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া দেহ-স্বামীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনি দেহটী অধিকার করিয়া বসিল, আর তাড়াইয়া না দিলে ঐ স্থান ছাড়িল না। ইহাকে 'ভূতে পাওয়া' বলে।

কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহা লেখা হইল, তিনি তাহার এক আখরও বিশ্বাস করেন না। আমরাও বলিতেছি যে, তর্ক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা আমরা করিব না। যেহেতু এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। তবে একটি কথা বলিয়া রাখি। তুমি পশু-জীবন না দেব-জীবন যাপন করিবে? অর্থাৎ পশুর মত খাইলাম, নিদ্রা গেলাম ও মরিয়া গেলাম, ইহাই করিবে, না পশুত্ব অপেক্ষা অন্য কোন সম্পত্তি আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করিবে? যদি তোমার পশু-জীবন ব্যতীত অন্যরূপ জীবনে স্পৃহা থাকে, তবে অগ্রে তোমার মলিন চিত্ত-দর্পণকে নির্ম্মল করিবার চেষ্টা কর। সাধন ভজন কর ও সাধুসঙ্গ কর। তাহা হইলে ক্রমে তোমার চিত্ত পরিষ্কৃত হইবে। তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা তুমি এখন দেখিতে পাইতেছ না। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি দেখিতে পাও না, তাই বলিয়া যাহারা

বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথা দম্ভের সহিত উড়াইয়া না দিয়া, স্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া, শ্রীভগবানের অপরূপ মনুষ্য-সৃষ্টি অনুশীলন ও অনুসন্ধান কর। তাহা হইলে সেই কারিগর-শিরোমণির অনেক কারিগরি দেখিতে পাইবে। তখন আর এ সমস্ত নিগূঢ় বিষয় সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না।

তবে তোমার যাহাতে উপরের কথা গুলিতে বিশ্বাস হয়, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত দুই একটী কথা বলিব। যে কথা সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত আছে, তাহা যে অমূলক হইতে পারে না, ইহা বিজ্ঞলোকের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই উপরে যে আবেশের কথা বলিলাম, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে, সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব সময়ে, কি অসভ্য বর্ব্বর কি সুসভ্য জাতির মধ্যে, দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের ভিত্তিভূমি এই আবেশ! বাইবেলে এই আবেশের কথা লেখা আছে; মহম্মদ স্বয়ং আবিষ্ট হইতেন; বুদ্ধদের ও হিন্দুদের ত কথাই নাই।

যখন উইরোপের মেস্মেরিজমের কথা প্রথমে শুনিলাম, তখন আমরা উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম; ভাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুঝাইয়া রোগ আরাম করা অসম্ভব। কিন্তু আমরা মেস্মেরিজমের প্রক্রিয়া দেখিলাম; দেখিলাম উহা ঠিক আমাদের মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ানের মত। অগ্রে মেস্মেরিজম মানিতাম না, মন্ত্রদ্বারা ঝাড়ানও মানিতাম না। এখন এই দুইরূপ প্রক্রিয়াই মানিতে বাধ্য হইলাম। দেখিলাম, মেস্মেরিজমে গাত্রে হস্ত বুলায়, ফুৎকার দেয়, আর রোগীকে বলে, "বল, নাই"। পূর্ব্বে ঝাড়ানতেও ঠিক এইরূপ দেখিয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম যে, ইহাতে প্রকৃতপক্ষে শক্তি না থাকিলে, এরূপ অদ্ভুত রোগ-আরোগ্যের পদ্ধতি দুই স্থানে দুই সময় অবলম্বিত হইত না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই পরকায়া-প্রবেশের কথা শাস্ত্রে দেখিতাম; শুধু আমাদের শাস্ত্রে নয়,—বৌদ্ধ শাস্ত্রে, খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে ও মুসলমান শাস্ত্রে ও বটে। পরে, ঠিক এই কথা, আমেরিকা কি অন্যান্য দেশেও উঠিল। তাহার পরে, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করিলাম; দেখিলাম, আমূল কেবল ঐ কথা। তখন বিস্মিত হইলাম। তখন ভাবিলাম, এই আবেশ প্রকৃত সত্য না হইলে এরূপ সর্ব্বদেশের মহাপুরুষগণ উহা মানিতেন না। তবে আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূতপ্রেত লইয়া, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কাণ্ড দেবদেবী, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান লইয়া।

বিবেচনা করুন, এই পরকালে যে বিশ্বাস, উহা সাধন-ভজনের ভিত্তিভূমি। পরকালে বিশ্বাস নাই বলিয়া লোকে নাস্তিক হয়, কুকর্ম্মান্বিত হয়, দুঃখে অভিভূত হয়। পরকালে বিশ্বাস হইলে, শ্রীভগবানে বিশ্বাস হয় আর জীব জগতের দুঃখে কাতর হয় না। পুত্র-শোক বড় দুঃখ; কিন্তু যদি পুত্রের সহিত আবার মিলন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে শোকে কাতর করিতে পারে না। এইরূপে মনুষ্যের যে কোন দুঃখ হউক, যদি পরকালে বিশ্বাস থাকে, তবে সে দুঃখ সহ্য করা সহজ হইয়া উঠে। পরকালে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার নিকট মৃত্যু অতি প্রিয়-সুহৃদ, আর দুঃখ তৃণের ন্যায় তাচ্ছিল্যের সামগ্রী। অতএব এই বিশ্বাসই মনুষ্যের সুখের ভিত্তিভূমি। তাই আমি এ কথা একটু বিস্তার করিয়া বিচার করিতেছি।

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় দেখিলাম যে, এই পরকায়া-প্রবেশের কথা সর্ব্বশাস্ত্রে যেরূপ আছে এবং আমেরিকায় যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে, তাহার প্রমাণ উহাতে রহিয়াছে। গৌরাঙ্গ-লীলার প্রমাণগুলি

দেখিলে সে গুলি যে সত্য, তাহা আপনা আপনি মনে বিশ্বাস হয়। এমন কি, আমেরিকার কাণ্ড গুলি যদিও এ কালের কথা, আর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার কথা চারি শত বর্ষ পূর্ব্বের কথা, তবু আমেরিকার প্রমাণ অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-ঘটিত প্রমাণগুলিই বলবৎ। কেন, তাহার কারণ বলা বাহুল্য। প্রথমতঃ, ঘটনাগুলি শুনিলেই বুঝা যায়, উহা কল্পনার কথা নয়। শুনিলেই, আপনা আপনি মনে বিশ্বাস হয়। কোন্ ঘটনা সত্য কি অসত্য, তাহার ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর নাই, যে, শুনিলেই মনে উহা বসিয়া যায়। আমেরিকায় এই আবেশ লইয়া কেবল ছাইপাঁসের আলোচনা হয়, কিন্তু গৌরলীলায় ইহা দ্বারা মনুষ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সাধু। তাঁহাদের নাম স্মরণে ভুবন্ পবিত্র হয়। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা ঐ লীলা লিখিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীপ্রভুকে স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা লিখিতে কখন সাহস পাইতেন না। তাঁহার লীলা লিখিতে, কোন অনুমানিক কথা লেখা যে মহাপাপ, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীকবিকর্ণপূর তাঁহার নিজের কাহিনী এইরূপ বলেন। তাঁহার বয়স তখন সাত বৎসর। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বাম-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বদনে করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তদ্দণ্ডে সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান ও কবিত্ব স্ফূর্ত্তি হয়। যদিও তিনি কিছুমাত্র সংস্কৃত জানিতেন না, তবু অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ মাত্র এক শ্লোক রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইয়াছিলেন।

কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরাঙ্গ-লীলা ঘটিত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নামক অপরূপ নাটক সমাপ্ত করিয়া বলিতেছেন, যথা—

যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী,
বাগ্দেব্যা যঃ কৃতার্থীকৃত ইহ সময়োৎকীর্ত্য তস্যাবতারম্।
যং কর্ত্তব্যং ময়ৈতৎকৃতমিহ সুধিয়ো থেঽনুরজ্যন্তি তেঽমী,
শৃণ্বন্ত্বন্যান্নমামশ্চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্তু॥

উপরের শ্লোকের প্রেমদাসের অনুবাদ—

যদুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রৌঢ়িমা হইল চিতে,
ইচ্ছা হইল কাব্য রচিবারে।
বাগ্দেবী বসিয়া মুখে, গৌরলীলা বর্ণে সুখে,
দ্বার মাত্র করিয়া আমারে॥
আমার কর্ত্তব্য যেই, তা আমি করিল এই,
সুবুদ্ধি হয়েন যেই জন।
ইথে অনুরাগ তার, গৌরলীলামৃত সার,
নিরবধি করুন শ্রবণ॥
গৌরলীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিচারিনু,
সত্য এই না কহি কল্পন।
ইথে রতি নাহি যার, দূরে তারে নমস্কার,
তার মুখ না দেখি কখন॥

শ্লোকঃ।

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাবর্ণিতং,
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎ প্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যেকশেষং গতে,
কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্॥

প্রেমদাসের অনুবাদ—

শ্রীচৈতন্য-কথামৃত, দেখিনু শুনিনু যত,
কোটী গ্রন্থে না যায় বর্ণন।
অজ্ঞান বালক হঞা, আমি তার কৃপা পাঞা,
কিছু মাত্র করিল লিখন॥
গৌরপ্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল,
স্মৃতি পথে গেল তারা সব।
পুস্তকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা,
অন্য কেবা জানিব শুনিব॥
অতএব কৃষ্ণ তুমি সর্ব্বজ্ঞেয় শিরোমণি,
অন্তর্ব্বাহ্য তোমাতে গোচর।
যদি সত্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হঞা তুমি,
প্রীতি হবে আমার উপর॥

হিন্দুগণ কখন শপথ করিতে ইচ্ছুক নহেন, ইংরাজ অধিবাসিগণ তাহা বেশ জানেন। কেন চাহেন না, পাছে ভুলক্রমে মুখ দিয়া একটী মিথ্যাকথা বাহির হয়। কবিকর্ণপুর পরমভাগবত, হিন্দু হইয়া ও কৃষ্ণের নাম লইয়া, এইরূপ কঠোর শপথ করিয়া, তাঁহার গ্রন্থ সমাপন করিতেছেন যে, "যদি তিনি সত্য বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইবেন।" অর্থাৎ যদি মিথ্যা লিখেন, তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিমাই যে কৃষ্ণযাত্রা-লীলা, অর্থাৎ দানলীলা, করিলেন, সেই লীলা বর্ণনা করিতে কর্ণপুর বলিতেছেন যে, রঙ্গভুমিতে উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের শরীরে ব্রজের পরিকর একে একে প্রবেশ করিলেন। যথা, শ্রীঅদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধিকা, শ্রীগদাধরের দেহে ললিতা ও শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই বুড়ী। অদ্বৈত পঞ্চাশ-বর্ষ বয়স্ক, কিন্তু তখন তাঁহাকে পঞ্চদশ-বর্ষ বয়স্ক নবীন যুবক

বলিয়া বোধ হইতেছে; এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের মত। কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে, শুদ্ধ বেশে যে অদ্বৈতকে ওরূপ দেখা যাইতেছিল, এরূপ নয়, কারণ শুদ্ধ বেশে ওরূপ আমূল, আন্তরিক ও বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হয় না। তবে অদ্বৈত ঠিক কৃষ্ণরূপে যে প্রকাশ পাইলেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করিয়াছিলেন।

যথা—প্রেমদাসের চন্দ্রোদয়-নাটকের অনুবাদ—

এহো ত অদ্বৈত নহে বুঝিনু নিশ্চয়।
বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয়?
কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আসি কৈল আবির্ভাব।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের, দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই কৃষ্ণ-যাত্রা বর্ণিত আছে। পাঠক মহাশয় কৃপা করিয়া এই দানলীলা পাঠ করিয়া দেখিবেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে যখন আকর্ষণ করিলেন, তখন, তাহার পরে কি লীলা হইল, তাহা আর নরলোককে দেখিতে দিবেন না বলিয়া, সমুদায় ব্রজের পরিকর অন্তর্ধান করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধা, শ্রীললিতা, শ্রীবড়াই বুড়ী, সকলেই চলিয়া গেলেন। রহিলেন কে?—না, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাই, শ্রীগদাধর ও শ্রীনিতাই।

এখানে চন্দ্রোদয়-নাটক হইতে কিছু অনুবাদ করিতেছি। মৈত্রী ও প্রেম-ভক্তিতে কথা হইতেছে। মৈত্রী প্রভুর এই দান-লীলার কথা শুনিতেছেন, প্রেমভক্তি বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রীমতী রাধা, শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই বুড়ী প্রবেশ করিয়া দান-লীলা করিতেছেন।

প্রেমভক্তি। যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলেন, তখন বড়াই বুড়ী কোপাবিষ্ট হইয়া রাধাকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন।

বড়াই বুড়ী রাধাকে লইয়া এইরূপে অন্তর্ধান করিলে নিত্যানন্দ নিজরূপ ধরিলেন, ধরিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মৈত্রী। সে কি? বড়াই বুড়ী কোথা গেলেন, শ্রীনিত্যানন্দই বা কিরূপে আইলেন?

প্রেমভক্তি। বড়াই বুড়ী নিত্যানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি শেষলীলা আর মনুষ্যকে দেখাইবেন না বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন, কাজেই নিত্যানন্দ রহিলেন। সে কিরূপ বলিতেছি। যেমন জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা তপ্ত হয়, আবার তাপ চলিয়া গেলে উহা পূর্ব্বকার মত শীতল হয়। সেইরূপ যখন বড়াই নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ করেন, তখন একরূপ হইয়াছিলেন, আবার বড়াই চলিয়া গেলে, তিনি পূর্ব্বকার ন্যায় সহজ নিত্যানন্দ হইলেন।

এই ঘটনাটীদ্বারা পরকায়া-প্রবেশরূপ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং প্রকারান্তরে পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

এখন বাছিয়া বাছিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা হইতে আর দুই চারিটি ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ শ্রীভগবানের, অতএব উহাতে ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ হইতে পারেন। আর সেই দেহে অক্রুর, ব্রহ্মা, মহাদেব, প্রভৃতি সকলি প্রকাশ হইতেন। যে দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারির দেবগৃহে নর-বরাহ আকার ধারণ করেন, সে দিন দেবগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রভু আপনা আপনি বলিতেছেন, "একি দেখি? ইনি যে প্রকাণ্ড শুকরাকৃতি? ইনি যে আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিতে আসিতেছেন।" ইহা বলিতে বলিতে যেন বরাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হঠিতে লাগিলেন, হঠিতে হঠিতে অচেতন হইলেন, হইয়া নরবরাহাকৃতি হইয়া বিশাল গর্জ্জন

করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বলরাম-রূপে প্রকাশ থাকেন, সে কাহিনীটি পাঠক মহাশয় কৃপা করিয়া এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় পড়িয়া দেখিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অমানুষিক বল ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণ বুঝিতে পারিতেছেন না, প্রভু তখন কাহার প্রকাশ-রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাই তাঁহার মাতৃ-স্বস্পতি চন্দ্রশেখর তাঁহাকে একটু সচেতন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপ তোমার একি ভাব? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" প্রভু করিতেছেন কি না. যখন একটু চেতন পাইতেছেন তখনি বলিতেছেন, "অস্থ আমার প্রাণ যায়।" এই চেতন অবস্থায় প্রভুকে চন্দ্রশেখর উপরি উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু প্রকারান্তরে এইরূপে তাঁহার তখনকার পরিচয় দিলেন, যথা—

"হলায়ুধ (বলরাম) মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল।"—চৈতন্যভাগবত।

এখন অনেক এমন আছেন, যাঁহাদের হিন্দু-দেবদেবীর উপর বিশ্বাস নাই। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বলরাম, কি মহাদেব, কি ব্রহ্মা, বলিয়া যত দেবগণের নাম উল্লেখ আছে, ইহা কেবল রূপক বর্ণনা, ইঁহারা প্রকৃত কেহ ছিলেন না, অতএব ইঁহাদের অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এরূপ বলিলে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোন দোষ পড়িতেছে না। যদি ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি শ্রীভগবানের রূপক-বর্ণনাই হয়েন, তবে শ্রীভগবান সেই রূপক-রূপেই অন্য দেহে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। শ্রীহরিদাসের দেহে শ্রীব্রহ্মার প্রকাশ হইত। যদি পাঠক অবিশ্বাসী হন, ব্রহ্মার পৃথক অস্তিত্ব না মানেন, এবং বলেন যে, ব্রহ্মা শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ, আমরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইলাম। শ্রীহরিদাসের যেরূপ দেহ, উহা শ্রীভগবানের এই ব্রহ্মা-রূপ আংশিক প্রকাশের উপযোগী, তাই হরিদাসের দেহে ব্রহ্মারূপে

প্রকাশ পাইয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মাকে রূপক-সৃষ্টি বলিলেও পরকায়া প্রবেশ সম্বন্ধে কোন দোষ হইতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের উদ্দেশ্য, এক কথায় বলা যাইতে পারে। সে উদ্দেশ্য কি,—না, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে জীবের যে প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্মের উপদেশ আছে, উহা কি, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া।

কেহ কেহ এমন আছেন, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্রীকৃষ্ণলীলা উহা রূপক বর্ণনা মনে করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত তাঁহার কৃত শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়, এই রূপক বর্ণনা কি, তাহা বিবরিয়া বলিয়াছেন। এই লীলা যাঁহারা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা উত্তমাধিকারী, যাঁহারা রূপক বর্ণনা বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা অধম-অধিকারী। যাঁহারা শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বড়াই বুড়ী, কি বৃন্দাদেবী, কি ললিতা, ইঁহারা প্রকৃত কোন বস্তু নহেন, রূপক-বর্ণনা মাত্র। তবে ইঁহারা কোথা হইতে আসিলেন, আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রার দিবসে, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর প্রভৃতিতে প্রবেশ করিলেন? দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের বিশ্বাস কিছু মৃদু, তাঁহারা ইহা মনে করিতে পারেন যে, শ্রীভগবান সেই রূপক অবলম্বন করিয়া, নবদ্বীপবাসী ও জগতের জীবগণকে ব্রজের নিগূঢ় রস কি, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনে ভাব, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক একখানি নাটক আছে, তাহাতে যে সমুদায় ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে ;—যথা, বিবেক, অধর্ম্ম, বিদ্যা ও উপনিষদ,—উহা মনঃকল্পিত, তাহা সকলে জানেন। এই নাটক খানির উদ্দেশ্য জীবকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া। মনে ভাব, তোমরা জন কয়েক সাজিয়া, কেহ দয়া হইলে, কেহ ধর্ম্ম হইলে, হইয়া সেই নাটক অভিনয় করিলে; করিয়া সেই জ্ঞানপূর্ণ অভিনয় সভ্যগণকে দর্শন করাইয়া, পরে আবার যে স্বাভাবিক আকার

তাহাই ধারণ করিলে। যে সকল ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা রূপক মনে করেন, তাঁহারা ঐরূপ ভাবিতে পারেন যে, শ্রীভগবান সেই ব্রজের নিগূঢ়-রস বুঝাইবার নিমিত্ত, তাঁহার ভক্তের মধ্যে যাঁহার দেহ যেরূপ উপযোগী, তাঁহার দেহে সেইরূপে প্রকাশ পাইলেন। বিবেচনা কর, তাঁহারা দেখিলেন, গদাধরের দেহে ললিতারূপ রাধার প্রধান সখীর প্রকাশ পাইলে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে, অতএব তাঁহার দেহে সেইরূপে প্রকাশ হইলেন। কি ইহাও হইতে পারে যে, কোন গোলকবাসী শ্রীভগবানের ভক্তের প্রকৃতি শ্রীললিতার ন্যায়। আবার গদাধরের প্রকৃতিও ললিতার ন্যায়। পূর্ব্বোক্ত জন তাই ব্রজের নিগূঢ়রস বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগদাধরের দেহে ললিতারূপে প্রবেশ করিলেন।

এখানে আবার বলি, যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ রসাস্বাদন করিতে পারিবেন, যাঁহারা জ্ঞানী, অতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না, অর্থাৎ সে লীলাকে রূপক বর্ণনা ভাবেন, তাঁহারা তাঁহার এক কণাও আনন্দ-রস ভোগ করিতে পারেন না। জ্ঞানী পাঠক মহাশয়! তুমি করযোড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিও, যে তুমি জ্ঞানরূপ কণ্টকাকীর্ণ স্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া, বিশ্বাস-রূপ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে পার। ইহা যিনি পারেন, আমি তাঁহার চরণধূলী দ্বারা মস্তক ভূষিত করি। যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা রূপক বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহার অধিক পারেন না, তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক ভজন করুন, ব্রজের পরিকরগণ তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উদয় হইবেন। ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেখা আছে।

শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহার পিতা মাতা,—জগন্নাথ ও শচী,—অতি শোকাকুল আছেন। কেবল শিশু নিমাই কোলে

করিয়া কথঞ্চিৎ মন সান্ত্বনা করিতেছেন। এক দিবস নিমাই, তখন তাঁহার বয়ক্রম ছয় হইতে আটের মধ্যে হইবে, নৈবেদ্যের একটি তাম্বুল খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। এখন এ সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃত কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন, যথা—

একদিন নৈবেদ্যের তাম্বুল খাইয়া।
ভূমেতে পড়িল প্রভু অচেতন হইয়া॥
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিল পাণি।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এথা হইতে বিশ্বরূপ লয়ে গেল মোরে।
সন্ন্যাস করহ তুমি কহিল আমারে॥
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা।
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ মাতৃ সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হয়েন লক্ষ্মীনারায়ণ॥
তবে বিশ্বরূপ এথা পাঠাইল মোরে।
মাতা পিতাকে কহিল কোটী নমস্কারে॥

বিশ্বরূপ ষোড়শবর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়সে পাণ্ডুপুরে অদর্শন হয়েন। যখন উপরি উক্ত ঘটনা হয়, তখন, হয় তিনি এ জড়জগতে ছিলেন, কি তাঁহার দেহ ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে অবস্থাই থাকুন, উপরের লিখিত ঘটনায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে, তিনি ছিলেন ও তিনি তাঁহার দেহের সাহায্য না লইয়া কনিষ্ঠের নিকট আসিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আর যখন তিনি নিমাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন, তখন অখণ্ডরূপে তিনি সেই বিশ্বরূপই ছিলেন, অর্থাৎ

সেই জ্ঞান ও সেই পিতা মাতা ও ভ্রাতাতে তাঁহার স্নেহ সম্পূর্ণরূপে সজীব ছিল।

অতএব দেহ ও আত্মা পৃথক্, এবং আত্মা দেহের সহায়তা ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে; কেবল তাহা নয়, অখণ্ডরূপে জীবিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ দেহ গেলেও, পূর্ব্বে তাহার যাহা যাহা ছিল, সমুদায় থাকে। ইহাতে অপরিস্ফুট আত্মার কখন কখন একটু ক্লেশ হয়। এরূপ জীবের জড়-জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতা যায় না, অথচ দেহ ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া উহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারে না। তাই সাধুগণ ভজন সাধনের দ্বারা বিষয়-লোভ হইতে অপসৃত হয়েন। যাহাদের জড়-জগতের প্রতি লোভ অতি প্রবল, তাহারা আবার এই সংসারে উহার শান্তির নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে।

এখন উপরি উক্ত ঘটনাটী যদি সত্য হয়, তবে পরকালের বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বরূপ অখণ্ডরূপে দেহ ব্যতীতও ছিলেন, অতএব দেহ ব্যতীতও জীব অখণ্ডরূপে থাকিতে পারে। তবে কথা হইতেছে, ঘটনাটী সত্য কি না? কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখুন, এটী কল্পনা করিবার কথা নয়। লোকে যে যে কারণে কল্পনা করেন, তাহার একটীও ইহাতে পাওয়া যায় না। ঘটনা শুনিলেই, ইহা সত্য বলিয়া আপনা আপনি বিশ্বাস হয়। সত্য না হইলে কল্পনা করিয়া ঐরূপ ঘটনা লিখিত হইত না।

ইহা অপেক্ষা আরো অদ্ভুত কথা বলিতেছি। মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে এখানে কয়েক চরণ উদ্ধৃত করিব। মুরারি গুপ্তের কড়চায় দেখিতে পাই যে, প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ২৮ বৎসর, তখনি ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। মুরারি, প্রভুর বড়, এমন কি, ছোটকালে তাঁহাকে কোলে করিয়াছেন। মুরারি প্রভুর পিতার বন্ধু ও এক দেশস্থ। নবদ্বীপেও এক

স্থানে বাস করেন। মুরারি প্রভুর সমুদায় আদিলীলা অবগত ছিলেন। এখন তাঁহার কড়চায় কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন।

নবম বর্ষ বয়সে শ্রীনিমাইয়ের উপবীত হইল। তিনি নিয়মানুসারে গোপনীয় স্থানে বসিয়া আছেন। তাহার পর ইহাই ঘটিল, যথা, (কড়চায় প্রথম প্রক্রম, ৭ম সর্গ ১৮ হইতে ২৪ শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত শ্রীল প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদ সহিত)—

ততঃ কদাচিন্নিবসন্ স্ব মন্দিরে
সমুদ্যদাদিত্য করাতিলোহিতঃ।
স্বতেজসাপূরিতদেহ আবভৌ-
উবাচ মাতর্ব্বচনং কুরুষ মে॥ ১৮॥

তাহার পরে নিজ মন্দিরে বাস করিতে করিতে কোন দিন শ্রীমহাপ্রভু সমুদিত সূর্য্যকর অপেক্ষা অতি লোহিত বর্ণ হইলেন ও নিজ তেজঃ দ্বারা পরিপূরত দেহ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই সময় জননীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে মাতঃ! আমার একটী কথা প্রতিপালন কর।"

তথা জলন্তং স্বসুতং স্বতেজসা
বিলোক্য ভীতা তমুবাচ বিস্মিতা।
যদুচ্যতে তাত করোমি তত্ত্বয়া
বদস্ব যত্তে মনসি স্থিতং স্বয়ম্॥ ১৯॥

সেই সময় স্বীয় ঐশ্বরিক তেজোযুক্ত নিজ পুত্রকে বিলোকন করিয়া শ্রীশচীদেবী ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "হে তাত! তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা করিব, তোমার মনে যাহা আছে, তাহা তুমি স্বয়ং বল।"

তদিত্থমাকর্ণ্যবচোঽমৃতং পুন-
স্তাং প্রাহ মাতর্ন হরেস্তিথৌ ত্বয়া।
ভোক্তব্য মাকর্ণ্য বচঃ সুতস্য সা
তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহৃষ্টবৎ ॥ ২০ ॥

শ্রীমহাপ্রভু নিজ জননীর এই প্রকার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া পুনরপি কহিলেন, "হে মাতঃ! তুমি আর শ্রীহরিবাসরে ভোজন করিও না।" শ্রীশচীদেবী প্রহৃষ্টবৎ "তাহাই করিব" বলিয়া এই বাক্য গ্রহণ করিলেন।

নিবেদিতং পূগ ফলাদিকং যৎ
দ্বিজেন ভুক্ত্বা পুনরব্রবীত্তাম্।
ব্রজামি দেহং পরিপালয়স্ব
সুতস্য নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণার্দ্ধম্ ॥ ২১ ॥

তাহার পরে এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিবেদিত পূগ ফলাদি (গুবাক ফলাদি) ভোজন করিয়া, পুনরায় মাতাকে কহিলেন, "হে মাতঃ! আমি চলিলাম, তোমার পুত্রের নিশ্চেষ্টগত দেহ প্রতিপালন কর।"

ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চা পদন্‌ভুবি।
বিশ্বম্ভরং গতং দৃষ্টা মাতা দুঃখসমন্বিতা ॥ ২২ ॥

এই কথা বলিয়া সহসা উঠিয়া দণ্ডবৎ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। জননী পুত্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া দুঃখ সমন্বিত হইলেন।

স্নাপয়ামাস গাঙ্গেয়ৈস্তোয়ৈরমৃতকল্পকৈঃ।
ততঃ প্রবুদ্ধঃ সুস্থোঽসৌ ভূত্বা স ন্যবসৎ সুখী ॥ ২৩ ॥

তাহার পর অমৃততুল্য গঙ্গাজলে স্নান করাইতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্য লাভ করিয়া সুস্থ হইয়া স্বাভাবিক তেজঃযুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

তেজসা সহজেনৈব তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতোঽভবৎ।
জগন্নাথোঽব্রবীচ্চেনাং দৈবীং মায়াং ন বিদ্মহে॥ ২৪ ॥

তাহা শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীশচীদেবীকে বলিয়াছিলেন, "দৈবমায়া বুঝিতে পারিলাম না।"

স্ত্রীলোকের যে ভূতে পাওয়া কাহিনী শুনা যায়,—কেহ কেহ এরূপ ঘটনা দর্শনও করিয়া থাকিবেন,—উপরের কথাটী ঠিক সেইরূপ। ভূতগ্রস্ত স্ত্রীলোকে হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হয়, হইয়া অন্যের ন্যায় কথা বলিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমি অমুক। তাহার পরে তাহাকে ছাড়ান হয়, কি সে ভূত আপনি ছাড়িয়া যায়। যখন সেই ভূত স্ত্রীলোককে ত্যাগ করে, সেই সময় স্ত্রীলোক অচেতন হইয়া পড়ে। তখন সকলে তাহার মুখে ও কপালে শীতল জলের আঘাত করে, ও তাহাকে ডাকিতে থাকে। সে একটু পরে চেতন পায়, চেতন পাইয়া পূর্ব্বকার ন্যায় সহজ অবস্থা পায়।

শ্রীমুরারির কাহিনী অনুসারে নিমাইয়ের আমূল ঠিক তাহাই হইয়াছিল। ভগবান প্রকট হইবার পরও শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈত এইরূপ ভূতগ্রস্ত ভাবিতেন, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

অদ্বৈত বলেন ভূত আবেশ যে করে।
তাতে আর কৃষ্ণাবেশ সব ভাব ধরে॥

আপনারা দেখিবেন যে, মনুষ্য যদি কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করে, তবে উহা অনেক সময়ে পরস্পরে বিরোধী হয়। রাজা প্রজা-শাসনের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম করিলেন, কিন্তু যে কর্ম্মচারিগণ এই শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা শাসন করিতে গিয়া দেখেন যে, নিয়মগুলি মাঝে মাঝে পরস্পরে বিরোধী। কিন্তু ভগবানের নিয়ম সেরূপ হয় না, সমুদায় নিয়মে পরস্পরে সামঞ্জস্য আছে। এমন কি, এই নিয়ম গুলি একটু

মনোযোগ করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন, তিনি একজন বই দুইজন নয়, আর তিনি জ্ঞানময়। তাঁহার নিয়মের এরূপ সামঞ্জস্য যে একটি প্রক্রিয়া দেখিলে অন্য প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়। একটী গ্রহের গতি দেখিলেই বুঝা যায় যে, অন্য গ্রহের গতি কিরূপ হইবে। একটী জীবের সন্তানোৎপত্তি পদ্ধতি দেখিলেই জানা যায়, অন্য জীবের সন্তানোৎপত্তি নিয়ম কিরূপ। ফল কথা, শ্রীভগবানের নিয়ম অকাট্য, তাহাতে জটিলতা মাত্র নাই। আর নিয়মাবলীতে পরস্পরে অসামঞ্জস্য হইতে পারে না।

এখন মনে ভাবুন, ভূতে পাওয়া প্রক্রিয়াটী সত্য, অর্থাৎ প্রকৃতই পরকালের কোন মলিন জীব, এ জগতের কোন জীবের দেহে প্রবেশ করিয়া, এ জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে শ্রীভগবানের নিয়মানুসারে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র, তাঁহারাও অপেক্ষাকৃত পবিত্র দেহে অবশ্য প্রবেশ করিতে পারিবেন। এমন কি, অতি পবিত্র দেহ পাইলে, অতি পবিত্র আত্মা, এমন কি যিনি শ্রীভগবানের পার্ষদ, তিনি পর্য্যন্ত সেই দেহে আশ্রয় করিয়া জড় জগতের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে পারেন।

অতএব শ্রীল নারদ কি শ্রীবেদব্যাস এইরূপে ইচ্ছা করিলে, প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত, এই জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন।

এখন আর একটু উপরে উঠুন। এইরূপে শ্রীভগবান্ উপযুক্ত দেহ পাইলে, জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শক্তি ধরেন। শ্রীভগবান সম্বন্ধে “করিতে শক্তি ধরেন,” এরূপ কথা বলা এক প্রকার অন্যায়, এক প্রকার অন্যায়ও নয়। যেহেতু যদিও তিনি সমুদায় পারেন, তবু তিনি চঞ্চল রাজার ন্যায়, আপনার নিয়ম আপনি ভঙ্গ

করেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে, অসংখ্য উপায়ে জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তবু তিনি তাহা না করিয়া, চিন্ময়দেহধারী আত্মাগণ সম্বন্ধে যে যে উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও চিন্ময় বলিয়া, সেই উপায় অবলম্বনে জড়জগতের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উহার বিপরীত কার্য্য করিয়া তাঁহার নিজের নিয়ম নিজে কখন ভঙ্গ করেন না।

পাঠক, এখন অবতার কিরূপে হয়, তাহা বুঝিয়া লউন। যাঁহারা সন্দিগ্ধ চিত্ত, তাঁহারা এখন দেখুন যে, অবতার ঘটনা শুধু অসম্ভব নয়, বরং অতি স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ এই জড়জগতের সহিত আংশিক রূপে যে সে দেহের দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হইতে হইলে শ্রীমতী রাধার দেহের প্রয়োজন। ত্রিজগতে রাধারাণী ব্যতীত এরূপ আর কেহ নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ের উপর আপাদ মস্তক স্থান দিতে পারেন।

যদি বল রাধা ইনি কে? রাধা শ্রীভগবানের প্রকৃতি। এই জগত শ্রীভগবানের প্রকাশ। ইহারা, কি জড়পদার্থ, কি জীবগণ, সমুদায় পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত। অতএব শ্রীভগবানেরও পুরুষ প্রকৃতি ভাব আছে। তাঁহার প্রকাশ যে জগত, তাহা যদি পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বারা জড়ীভূত হইল, তবে তিনিও তাহাই। সে যাহা হউক, যদি পারি তবে রাধার তত্ত্ব উপযুক্ত স্থানে ব্যক্ত করিব।

অতএব যিনি যীশু, তিনি শ্রীভগবানের একজন পরকালের উচ্চ বস্তু। তিনি আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাই তিনি ভগবানকে দাস্য-ভক্তি দ্বারা ভজন করেন। অর্থাৎ তিনি এই জগতের একটী উপযোগী দেহ লইয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন। যিনি মহাম্মদ, তিনিও একজন উচ্চ বস্তু, তিনি

শ্রীভগবানের সখা বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীভগবানকে সখ্য-ভক্তি দ্বারা তিনি ভজনা করেন। অর্থাৎ জীবের নিকট সেইরূপ ভজনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি একটী উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া এই ধর্ম্মজগতে প্রচার করেন। এখানে শ্রীগীতার শ্লোক স্মরণ করুন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ॥
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

সেইরূপ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীভগবান তাঁহার উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া জীবের নিকট ব্রজের নিগূঢ় রস, যাহা পূর্ব্বে জীবের "অনর্পিত," তাহা প্রকাশ করিলেন।

যীশু, কি মহম্মদ, কি গৌরাঙ্গ, যেই হউন, মিথ্যা কহিবার লোক নহেন। ইঁহারা স্পষ্ট করিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যীশু আপনাকে ভগবান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মহম্মদ ঐরূপ আপনাকে সখা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐরূপ শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া আপনাকে শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, সেই পরব্রহ্মের পূজা লইয়াছেন।

রহস্য এই যে, যীশু এক দেশে শিক্ষা দিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আর এক দেশে শিক্ষা দিলেন। উভয়ে যে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহা অতি সূক্ষ্ম। অথচ পরস্পরের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য; এমন কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের এক শাখা বলিলেও হয়। তবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অতি মোটা, আর বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম, তাহা যে সে বুঝিতে পারিবেন। এই যে যীশুর ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামঞ্জস্য, ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ যে, উভয়েই সত্য বস্তু।

তবে উপরে উপবীত কালে শ্রীগৌরাঙ্গের যে কাহিনী বলিলাম, সে সম্বন্ধে একটা কথা বলিব। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সে কাহিনীটী যে সত্য, তাহার অকাট্য প্রমাণ কি? তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই, ও এ সমুদায় বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যিনি অকাট্য প্রমাণ চাহেন, তিনি সাধন ভজন করুন, আপনা আপনি অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। তবু গোটা কয়েক কথা বলিব। মুরারি গুপ্তের বাড়ী প্রভুর বাড়ীর নিকট। এক দেশস্থ বলিয়া তাঁহার সহিত শচী জগন্নাথের অতি আত্মীয়তা ছিল। মুরারি নিমাইকে ছোট বেলা কোলে করিয়া বেড়াইয়াছেন। মুরারি বৈদ্য, চিকিৎসা করিয়া সংসার চালাইতেন। প্রভু বরাহরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশ হইলে, তিনি তাঁহাকে শ্রীভগবান জ্ঞানে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিলেন। প্রভু পাছে তাঁহাকে ফেলিয়া গোলোকে চলিয়া যান, এই ভয়ে প্রভুর অগ্রে মরিবেন ইচ্ছা করিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। এ কাহিনী পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে নদেবাসীরা তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলেন। সেই সঙ্গে মুরারিও গমন করিলেন। নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে তখন দামোদর পণ্ডিত গিয়াছিলেন, তাহাও পাঠকগণ জানেন। মুরারি নীলাচলে গমন করিলে দামোদর পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে বৈদ্যরাজ! হরিকথা কি জীবে জানিতে পাইবে না? শ্রীগৌরহরির আদিলীলা কেবল তুমিই উত্তমরূপে অবগত আছ, তুমি এই সময়ে তাঁহার আদিলীলা জীবের উপকারের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ।" মুরারি স্বীকার করিলেন। কথা হইল যে, মুরারি মুখে প্রভুর লীলা কাহিনী বলিবেন, দামোদর উহা সংক্ষেপে

শ্লোকে আবদ্ধ করিবেন। দুইজনে তাহাই করিলেন। এই হইল মুরারির কড়্চা।

প্রভুর বয়ঃক্রম তখন ২৮ বৎসর। অতএব প্রভুর বাসার এক কোণে প্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল, আর এক কোণে কিঞ্চিৎ দূরে মুরারি ও দামোদর বসিয়া, তাঁহার লীলাকথা লিখিতেছেন।

অতএব এই গ্রন্থের মধ্যে কোন জ্ঞানতঃ অলীক কথা থাকিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আবার, যে ধর্ম্মের যত প্রমাণ থাকুক, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার সম্বন্ধে মুরারির কড়্চা যেরূপ প্রমাণ, এরূপ প্রমাণ বুদ্ধ, কি মহম্মদ, কি খ্রীষ্ট, কি অপর কোন ধর্ম্মের সম্বন্ধে নাই।

অপর মুরারি যাহা বলিলেন, ইহা নূতন কথা নহে, পৃথিবীর তাবদ্দেশে, সকল সময়ে, এই আবেশের কথা লেখা আছে। মুরারি মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। মুরারি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলিয়া জানেন, সুতরাং তিনি প্রভুর সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিবেন, ইহা হইতেই পারে না। মুরারির ওরূপ কাহিনী কল্পনা করার কোন স্বার্থ নাই, বরং স্বার্থের হানি আছে। সে কিরূপ পরে বলিতেছি। প্রথম দেখুন, প্রভু তখনি "গুপারি খাইলেন," এ অদ্ভুত কাহিনীর মধ্যে এরূপ অসংলগ্ন কথা কেন ? এ ঘটনা কিরূপে হইয়াছিল বলিতেছি। শ্রীজগন্নাথ বাড়ীতে নাই, নিমাই উপবীত লইয়া গুপ্তভাবে আছেন, এমন সময়ে তিনি জননীকে ডাকিলেন। জননী আসিয়া দেখেন যে, পুত্রের শরীর দিয়া লোহিত সূর্য্যের আলো বাহির হইতেছে, আর উহাতে সে স্থান আলোকিত হইয়াছে। শচী ইহা দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইলেন। নিমাই শচীকে একটী আদেশ করিলেন। অমনি তিনি ভয়ে তদ্দণ্ডে তাহা স্বীকার করিবেন। পরে নিমাই বলিলেন, "আমি চলিলাম। আমি গমন করিলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, তুমি তাঁহাকে শুশ্রূষা

করিও।" ইহাই বলিয়া যেন প্রণাম করিতে গেলেন। শচী তাহাই ভাবিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন শ্রীভগবান লুকাইলেন; আর ভূতাবেশ ছাড়িলে যেমন সামান্য জীব ঢলিয়া পড়ে, নিমাইয়ের দেহ তেমনি স্বভাবের নিয়মানুসারে ঢলিয়া পড়িল।

শচী তখন মহাব্যস্ত হইলেন, বিশেষতঃ বাড়ীতে কর্ত্তা নাই। তখন মুরারিকে ডাকাইলেন, যেহেতু তিনি চিকিৎসক, তাঁহাদের আত্মীয় ও নিকটে বাস করেন। মুরারিকে ডাকাইলেন, এ কথা কেন বলি? মুরারি সেখানে না আসিলে তিনি শুপারি ভক্ষণের কথা বলিতেন না। আর একথাও লিখিতেন না যে, শ্রীভগবান শচীকে বলিলেন, "আমি গমন করিলে তোমার পুত্রের দেহ অচেতন হইবে। অতএব তুমি তাহাতে ভয় পাইও না, তাহাকে শুশ্রূষা করিও, করিলে তাঁহার অচেতন ভাব ছাড়িয়া যাইবে।

মুরারি আসিবার পূর্ব্বেই শচী পুত্রকে স্নান করান, মুখে জলের ছাটী মারা, নাম ধরিয়া ডাকা, প্রভৃতি চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। মুরারি আসিয়া সমুদায় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা—

মুরারি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার পুত্র কি কিছু খেয়ে ছিল।"

শচী। আর কিছু নয়, একটী শুপারি।

মুরারি। এ কিরূপে হইল বল দেখি?

তাই, শচী যেরূপ আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, মুরারিও তাহাই দামোদরকে বলিলেন, এবং দামোদরও সংক্ষেপে তাহা সূত্রে বদ্ধ করিলেন। তাহার পরে জগন্নাথ মিশ্র গৃহে আসিলেন। তিনি সমুদায় শুনিয়া বলিলেন, "এ দেবতাগণের কাণ্ড আমি বুঝিতে পারিলাম না।" নিমাই তাঁহার ভগবান-ভাব তাঁহার পিতাকে কখন দেখিতে দেন নাই।

তাহার পরে আবার বিচার করুন। এ ঘটনা কল্পনা হইলে, কিম্বা মুরারির মনে কিছুমাত্র কল্পনার সন্দেহ থাকিলে, তিনি উহা উক্ত করিতেন না। যেহেতু এ ঘটনাতে প্রকারান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বায় দোষ পড়িতেছে। যদি কেহ শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বলিয়া মানিতেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান একজন মুরারি। তিনি যে কাহিনী বলিলেন, তাহাতে ভিন্ন-লোকে, এমন কি, নিজ-জনেও সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ এক জন সামান্য মনুষ্য, তবে শ্রীভগবান তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে অতি স্বাভাবিক, তাহা মুরারির গ্রন্থের পরের শ্লোকেই প্রকাশ। মুরারি যেরূপ গৌরাঙ্গভক্ত, গৌরাঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবী মানিতেন না, দামোদরও তাহাই। মুরারি উপরি উক্ত কাহিনী বলিলে দামোদর চমকিয়া গেলেন, একটু কষ্টও পাইলেন। উপরে ৭ প্রক্রমের ২৪ শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। এখন ২৫ শ্লোক হইতে শ্রবণ করুন—

ইতি শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং প্রাহ দামোদরো দ্বিজঃ।
কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণ জগদ্‌গুরুঃ ॥ ২৫ ॥
জাতঃ কথং ব্রজামীতি পালয়স্ব সুতং শুভে।
ইতি মাত্রে কথং প্রাহ হেতন্মে সংশয়ো মহান্ ॥ ২৬ ॥
কিং মায়া জগদীশস্য তদ্বক্তুং ত্বমিহার্হসি।
হরেশ্চরিত্রমেবাত্র হিতায় জগতাং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

এই দিব্য কথা শুনিয়া সন্দিহান হইয়া শ্রীদামোদর দ্বিজ শ্রীমুরারি গুপ্তকে কহিলেন, "হে ভদ্র! তুমি এ কি কহিলে? ইহাতে আমার মহা সন্দেহ হইল। জগৎ-পিতা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কিরূপে মাতাকে কহিলেন, "হে শুভে!

আমি চলিলাম; তুমি তোমার পুত্রের দেহ পালন কর। হে ভদ্র মুরারি গুপ্ত! ইহা কি জগদীশ্বরের মায়া?"

অর্থাৎ দামোদর বলিতেছেন, "মুরারি! তুমি বল কি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংই শ্রীভগবান, তবে তিনি কিরূপে বলিলেন, তোমার পুত্রের দেহ সন্তর্পণ কর, আমি চলিলাম?"

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য চিন্তয়িত্বা বিচার্য্য চ।
নত্বা হরিং পুনঃ প্রাহ শৃণুষ্ব সুসমাহিতং॥ ১॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীদামোদর পণ্ডিতের এই বচন শ্রবণ করতঃ চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীহরিকে প্রণতিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "হে দামোদর পণ্ডিত! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি।
হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ॥ ২॥

শ্রীভগবদ্ধ্যান, কীর্ত্তন ও শ্রবণ হেতু সুমহাত্মা জনের হৃদয়ে শ্রীহরি প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।

তস্যানুকারং চক্রে স তত্তেজস্তং পরাক্রমম্।
দধাতি পুরুষো নিত্যমাত্মদেহাদিবিস্মৃতিঃ॥ ৩॥

শ্রীভগবান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মনুষ্য ভগবানের অনুকরণ করে এবং ভগবত্তেজ ও ভগবৎ পরাক্রম ধারণ করে এবং আত্মদেহাদি বিস্মৃত হয়।

ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্বাহ্যো ভবেত্ততঃ।
করোতি সহজং কর্ম্ম প্রহ্লাদস্য যথা পুরা॥ ৪॥
তাদাত্ম্যোঽভূত্তোয়নিধৌ পুনর্দ্দেহস্মৃতিস্তটে।

তাহার পরে, পুনরায় বাহ্য হইয়া থাকে ও বাহ্য হইলে সহজ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বকার প্রহ্লাদের সমুদ্র মধ্যে

তদাত্ম্য ও তটে বাহ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে প্রহ্লাদ যখন নিক্ষিপ্ত হন, তখন শ্রীভগবন্ময় হইয়াছিলেন, আর তটে আপনার সহজ অবস্থা পাইয়াছিলেন।

ঈশ্বরস্তস্য সংশিক্ষাং দর্শয়ং স্তচ্চকার হ।
লোকস্য কৃষ্ণভক্তস্য ভবেদেতৎ স্বরূপতা ॥ ৬ ॥
যথাত্র নাবি মুহ্যন্তি জনা ইত্যভ্যশিক্ষয়ন্।

ঈশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহা শিখাইবার জন্য আপনি করিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত-জনের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা হয়, ইহাতে লোক সকল যাহাতে ভ্রান্ত না হয়, তাহাও শিখাইবার জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন।

ভক্তদেহ ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

ভক্তদেহ ভগবানের আত্মা ইহাতে সংশয় নাই।

কৃষ্ণঃ কেশীবধং কৃত্বা নারদায়াত্মনো যশঃ।
তেজশ্চ দর্শয়ামাস ততো মুনিবরো ভুবি ॥ ৮ ॥
পপাত দণ্ডবত্তস্মিন্ স্থানে শতগুণাধিকম্।
ফলমাপ্নোতি গত্বা তু বৈষ্ণবো মথুরাং পুরীং ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কেশী বধ করিয়া শ্রীনারদকে আপনার রূপ ও তেজ দর্শন করাইয়াছিলেন। তাহার পরে মুনিবর শ্রীনারদ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়াছিলেন। মনুষ্য মথুরাপুরী গমন করিয়া সেই স্থানে (কেশী-তীর্থ) শত গুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

এবং রামো জগদ্‌যোনি বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।
শিবায় পুনরেবাসৌ মানুষীমকরোৎ ক্রিয়াম্ ॥ ১০ ॥

এই প্রকার ভগবান রামচন্দ্র শ্রীশিবকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, পুনরায় মানুষী ক্রিয়া করিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত উপরে কি বলিলেন, পাঠক অনুভব করিয়া দেখুন। তিনি বলিলেন যে, ভক্তজনে কীর্ত্তনাদির দ্বারা হৃদয় এরূপ নির্ম্মল করিতে পারেন যে, স্বয়ং ভগবান উহাতে কখন কখন প্রবেশ করিয়া থাকেন। তিনি ভক্ত-হৃদয়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। তখন সেই ভক্ত আত্মবিস্মৃত হন, হইয়া ভগাবানের ন্যায় কথা বলেন। এমন কি, ক্ষমতা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। তাহার পরে শ্রীভগবান তাঁহার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, সেই ভক্ত আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন। এই মুরারির কথা।

তাহার পরে মুরারি বলিতেছেন, "শ্রীভগবান জীব-শিক্ষার নিমিত্ত শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি কখন ভক্ত-ভাব, কখন ভগবান-ভাব অবলম্বন করিতেন। ভক্ত হইয়া ভক্তি কি বস্তু তাহা জীবগণকে শিখাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই লীলা দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, আর যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন সে ভগবান-ভাব প্রাপ্ত হয়, তাই দেখিয়া যেন কেহ তাঁহাকে ভগবান বলিয়া পূজা না করে।"

মুরারি উপরি উক্ত ঘটনার যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া কোন সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক হাস্য করিয়া বলিতে পারেন, "বৈদ্যরাজ! তাই যদি হইল, তবে তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন ভক্ত বল না? তিনি ভক্ত-শিরোমণি ছিলেন, তাই শ্রীভগবান তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ক্ষণিক মাত্র ভগবত্ত্ব অর্পণ করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের ন্যায় একজন মনুষ্য বই আর কিছু নয়।"

যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিয়া ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভুর ভগবত্তায় দোষ পড়িল বটে, কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহা প্রমাণিত

হইল, অর্থাৎ শ্রীভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ সেবনই জীবের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম।

কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে যে, মুরারি যে সিদ্ধান্ত করিলেন, উহা ভক্তগণের নিমিত্ত, বহিরঙ্গ লোকের জন্য নয়। বহিরঙ্গ লোকে উপরের ঐ প্রশ্ন করিলে মুরারি এই উত্তর দিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীভগবান, তিনি তাহার শত সহস্র প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি তাঁহার বরাহ প্রভৃতি রূপ দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহাপ্রকাশ দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার শত শত বার অন্যান্য প্রকাশ দর্শন করিয়াছেন। তিনি শত শত বার তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছেন যে, তিনিই সেই পূর্ণব্রহ্ম, তিনিই সকলের আদি। তিনি যে শচীনন্দন হইতে পৃথক বস্তু তাহা কখনও বলেন নাই। শচীর উদরে তাঁহার যে দেহ উৎপত্তি সেই তাঁহার নিজ দেহ, তাহা বারম্বার বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করিতে চাহেন, তখন তাঁহাকে বলেন, "এই গৌর-রূপই আমার প্রকৃত রূপ, আর এই রূপ অদ্বৈতের প্রিয়" জগদানন্দকে নিজহস্তে আপনার গৌরগোবিন্দ বিগ্রহের পূজা করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে গৌর-মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুরারি কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিতেছেন বলিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। হৃদয় নির্ম্মল হইলে শ্রীভগবান স্বয়ং প্রবেশ করিয়া প্রকাশ হয়েন, হইয়া ভক্ত ঠিক ভগবানের ন্যায় হয়েন, এ কথা মুরারি বলিতে পারেন না। এরূপ যে কোথা হয়েছে তাহারও প্রমাণ নাই। প্রহ্লাদের ক্ষণিক অধিরূঢ় অর্থাৎ তিনিই ভগবান এ ভাব আর শ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া শ্রীপদ বাড়াইয়া গঙ্গাজল, চন্দন ও তুলসীর দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা গ্রহণ, এই দুই ভাব

বহু পৃথক্। অবশ্য ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ হইলে ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। কেহ গোপাল আবেশে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যেন মুরলী বাদন করিতেছেন, কেহ বা বাল-গোপাল আবেশে জানু-গতিতে চলিতেছেন। প্রেমে ভক্তগণ এরূপ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসের ন্যায় ভক্ত ত্রিভুবনে আর হয় নাই। তাঁহারা অনেকে প্রহ্লাদ অপেক্ষাও বড়। কই তাঁহারা কবে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক আবেশিত হইয়া শ্রীভগবানের ন্যায় কথা কহিয়াছিলেন, কি ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, কি পা বাড়াইয়া দিয়া শ্রীভগবানের পূজা লইয়াছিলেন ?

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার আমূল তাই। শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া শ্রীনিমাই প্রফুল্ল বদনে ভক্তগণ সঙ্গে বিহার করিতেছেন। অঙ্গের আলোতে গৃহ বৈদ্যুতিক আলো অপেক্ষা কোটি গুণ আলোকিত হইয়াছে, অঙ্গ-গন্ধে দিগ্ আমোদিত হইয়াছে। কথা কহিতেছেন, আর যেন সুধা উগরাইতেছেন; আর বলিতেছেন কি না, "আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমিই তোমাদের, তোমরা আমার।"

আর কি বলিতেছেন, না, "আমি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া ভক্তগণের আকর্ষণে জীবকে আশ্বাস দিতে ও ভক্তি-ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছি। কই, কবে এরূপ কে বলিয়াছেন কি করিয়াছেন ? কোন শাস্ত্রে, কোন দেশে এরূপ নাই।

বুদ্ধ, যীশু, মহাম্মদ, নানক প্রভৃতি বহুতর অবতার জগতে প্রকাশ হইয়াছেন। কিন্তু কবে কোন্ অবতার শ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া, শ্রীভগবানের তেজ প্রকাশ করিয়া, শ্রীভগবান বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া, "বর মাগো" বলিয়া জীবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন ? এরূপ ঘটনা কেহ কখন শুনেন নাই, অনুভবও করেন নাই।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়, জড়-পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট নয়। শ্রীভগবানকে চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করা যায় না; দর্শন করিতে হইলে তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষু-গোচর দেহ ধারণ করিতে হয়। মনুষ্যের ধ্যান স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত এরূপ দেহ প্রয়োজন, তাই শ্রীভগবান চর্ম্মচক্ষু-গোচর রূপ ধরিয়া থাকেন। আকাশ-ধ্যান যে ভক্তের নিকট নিস্ফল তাহা ভক্তমাত্রেই জানেন; আর যিনি ইহা বিশ্বাস না করেন, তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, ভক্তের ধ্যান জীবন্ত সামগ্রী।

তাহার পর, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ শ্রীভগবানের দেহ,—শুধু আধার নয়। মুরারিকে শ্রীগৌরাঙ্গ আলিঙ্গন করিলে তিনি ১০ম স্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক পড়িয়া শ্রীভগবানকে স্তুতি করিলেন। সে শ্লোকের অর্থ এই যে, "কোথা আমি দীন, আর কোথা তুমি শ্রীভগবান্; তুমি আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে!" মুরারির এই বাক্য শুনিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র কি বলিলেন, শ্রবণ করুন। যথা, চৈতন্য-চরিত ৭ম সর্গ,—

শ্রুত্বা স ইত্থমুদিতং ভগবাংস্তদৈব
স্বৈশ্বর্য্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথঃ।
রম্যাসনোপরি পরিষ্ঠিত উদ্ভটেন
তেজশ্চয়েন দিননাথ সহস্রতুল্যঃ ॥১০১॥

ভগবান্ গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিয়া তাৎকালীন ঐশ্বর্য্য লাভ করতঃ, অত্যুদ্ভট তেজের দ্বারা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া, শোভন আসনোপরি অধিষ্ঠানানন্তর পরম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১০১॥

ইদং শরীরং পরমং মনোজ্ঞং সচ্চিদ্ঘনানন্দময়ং মমৈব।
জানীত যুয়ং ন হি কিঞ্চিদন্যদ্বিনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে ॥ ১০২ ॥

এবং কহিলেন, আমার এই শরীর পরম মনোজ্ঞ নিত্য চিদ্ঘন ও

আনন্দময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শরীর ব্যতিরেকে এই ভূমণ্ডলে আর কিছুই নাই ॥ ১০২ ॥

তাহার পরে যদি শচীনন্দন শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্তু হইতেন, আর তাঁহার দেহটী শ্রীভগবানের না হইয়া একজন মনুষ্যের হইত, তবে শ্রীভগবান্ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, কুলবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেন না যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," অর্থাৎ "আমাকে তোমরা স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর।" আবার তাহা হইলে শ্রীভগবান সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, সেই দেহের পদ, তাঁহার দেহ-ধারী বৃদ্ধা জননীর মস্তকে দিতেন না। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এরূপ মূঢ়তার কার্য্য সম্ভব হয় না। শ্রীঅদ্বৈত দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, জগন্নাথ-সুত যদি "তিনি" হয়েন, তবেই কেবল তাঁহার মস্তকে চরণ দিতে সক্ষম হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাই করিলেন, আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত স্বীকার করিলেন যে, প্রভু স্বয়ং আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মস্তকে পা দিয়া, শ্রীভগবান ইহাই প্রমাণ করিলেন যে, তিনি আর শচীনন্দন পৃথক্ বস্তু নন, আর শচীনন্দনের যে দেহ, উহা তাঁহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্য সম্পর্কে শচী তাঁহার জননী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শচীর পিতা। আরো দেখাইলেন যে, যদিও শচী অতি বৃদ্ধা, কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

পঞ্চম অধ্যায়।

গৌরাঙ্গ কল্পতরু অদ্বৈতাদি শাখা চারু,
কীর্ত্তনে কুসুম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ, মধু লোভে অনুক্ষণ,
আনন্দেতে ফিরে চারু পাশ॥
হরিনাম পত্র শোভে স্নিগ্ধ সুমধুর ভাবে,
কিবা সুশীতল তার ছায়া।
কলি-দগ্ধ জীব যত, পাপ তাপে সন্তাপিত,
তার তলে আসিয়া জুড়ায়॥
অকৈতব প্রেমফল, রসভরে টলমল,
খাইতে বড়ই মিঠে লাগে।
গল-লগ্নকৃত বাস, হইয়ে উদ্ধব দাস,
কাতরেতে সেই ফল মাগে॥

শ্রীবিশ্বরূপ নিত্যানন্দের দেহে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন। এমন কি, শচীর কখন কখন ভ্রম হইত যেন নিত্যানন্দ তাঁহার সেই হারাণ পুত্র বিশ্বরূপ। সেই নিত্যানন্দের নিকট প্রভু বলিতেছেন যে, তিনি অনুমতি পাইলে তাঁহার দাদা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইবেন।

এখন বিশ্বরূপ যে জগতে নাই, তাহা কি শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন না? তাঁহাকে যাই ভাব, এ কথা তাঁহার না জানিবার কোন কারণ ছিল না, কারণ শচী ব্যতীত পৃথিবী সমেত সকলেই এ কথা জানিতেন যে, বিশ্বরূপ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে গাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতএব প্রভুও ইহা

জানিতেন। তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন? শ্রীচরিতামৃত এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, যথা—

বিশ্বরূপ অদর্শন জানেন সকল।
দাক্ষিণাত্য উদ্ধারিতে পাতেন এই ছল॥

অর্থাৎ জীব উদ্ধার ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার, প্রভুর একটী প্রধান কার্য্য। কিন্তু তাহা তিনি সহজ অবস্থায় মুখে বলিতেন না; এমন কি, বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণ দেশে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য, ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং দক্ষিণদেশে গমন করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির সংকল্প, তাই অনুমতি চাহিতেছেন। এ কথা বলিতে পারিতেন যে, শ্রীপাদ আমাকে অনুমতি কর, আমি দক্ষিণ দেশে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে যাইব। কিন্তু প্রভু দৈন্যের অবতার। সহজ অবস্থায় যিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া দিবানিশি বলিতেছেন, "তোমরা ভক্ত, আমাকে কৃপা করিয়া বল, আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।" তিনি কি মুখাগ্রে এই দম্ভের কথা আনিতে পারেন যে, "আমি দেশ উদ্ধার করিতে যাইব?" অথচ দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিতে যাইতেই হইবে। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন; তাহাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন, এই "ছল পাতিলেন"।

প্রকৃত পক্ষে তাঁহার দক্ষিণ-ভ্রমণের মধ্যে বিশ্বরূপের অনুসন্ধান বড় একটা দেখা যায় না, কেবল ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারই দেখা যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন যে, "উত্তম কথা, আমরাও যাইব।" কিন্তু প্রভু বলিলেন, "তাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব।"

তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, "কেন, আমাদের অপরাধ?" প্রভু

বলিলেন, "তোমাদের গাঢ় অনুরাগ আমার প্রধান কণ্টক; আমি ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। আমার মনোমত কার্য্য করিতে গেলে, তোমাদের মনে দুঃখ দিতে হয়, তাহা আমি পারি না। ইহা বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাইব সংকল্প করিলাম, তুমি ভুলাইয়া আমাকে শান্তিপুরে আনিলে। দেখ, তুমি মধ্যবর্ত্তী না হইলে, আজি আমি কোথা থাকিতাম, আর এখন কোথা আছি? তাহার পরে, সন্ন্যাসীর প্রধান সহায় দণ্ড; তুমি ইচ্ছা করিলে, আর আমার দণ্ডখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলে। এখন আমি অঙ্গহীন সন্ন্যাসী হইলাম, তোমরা আমাকে ভালবাসিয়া এই সব কর, কিন্তু আমার কার্য্য নষ্ট হয়।"

শ্রীনিত্যানন্দ ভালমানুষ, ছোট ভাইয়ের দাস। তিনি উত্তর করিতে না পারিয়া ঘাড় হেঁট করিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, "আমার অপরাধ কি?" প্রভু বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সন্ন্যাসী। পদে আমি তোমা অপেক্ষা বড়, কিন্তু আমি সন্ন্যাসের কি কি নিয়ম, তাহা সব জানি না, স্মরণ রাখিতেও পারি না; অনেক সময় আবার শ্রীকৃষ্ণের বিরহে, সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতেও পারি না। কিন্তু তুমি সমুদায় বিধি অবগত আছ ও পালন করিয়া থাক, এবং সর্ব্বদা আমাকে সাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। এই বিধি সমুদায় পালন করিতে গিয়া,—আমি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত যে একটু রোদন করিব,তাহাও পারি না।"

জগদানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু, সকলের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেছেন, আমাকে ভুলিবেন না। আমার কি অপরাধ শুনিয়া রাখি।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি ত নাটের গুরু। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম

আশ্রয় করিয়াছি, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার দিবানিশি একমাত্র চেষ্টা কিসে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। তোমার ইচ্ছা আমি উদর পূর্ণ করিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া ভোজন করি, অতি উত্তম শয্যায় শয়ন করি, উত্তম তৈল মাখিয়া স্নান করি, এবং এইরূপ বিষয়-সুখ সমুদায় ভোগ করি। কিন্তু এ সমুদায় আমি করিতে পারি না। আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি, এ সমুদায় বিষয়ে সুখ করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিবে না, শুনিবে না; আমার সম্মুখে বিষয়-সুখ রাখিযা, উহা আমি ভোগ করি. তাহার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা দেখাইবা। কিন্তু আমি তোমার অনুরোধ রাখিতে পারি না, আর তুমি রাগ করিয়া আমার সহিত কথা বন্ধ কর। তখন তোমাকে কথা কহাইবার নিমিত্ত আমার বহু সাধ্যসাধনা করিতে হয়।”

প্রভু তাহার পরে আবার বলিতেছেন, “সকলের কথা যখন বলিলাম, তখন মুকুন্দের কথাও বলি। মুকুন্দ এই প্রথম সংসারের বাহির হইয়াছেন. তাই তাঁহার হৃদয় অদ্যাপি নিতান্ত কোমল রহিয়াছে। তিনি পরের দুঃখ একেবারে সহিতে পারেন না, আমার দুঃখ কিরূপে সহিবেন? শীতে তিন বার স্নান করিতাম, মুকুন্দ ইহা দেখিয়া বড় কষ্ট পাইতেন। আমি মৃত্তিকায় শয়ন করি, মুকুন্দ ইহা সহিতে পারেন না। সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালনের জন্য আমার অন্যান্য দুঃখ সহ্য করিতে হয়, ইহাতে মুকুন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এ সমুদায় কথা সাহস করিয়া মুকুন্দ আমাকে বলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারি। আমি যে নিয়ম পালন করি, উহাতে আমার কিছু দুঃখ হয় না, কিন্তু আমি দুঃখ পাইতেছি, ইহা অনুমান করিয়া মুকুন্দের যে দুঃখ তাই দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; এমন কি, আমি মুকুন্দের মুখপানে চাহিতে পারি না।

প্রভু এই বলিয়া যাঁহার যে গুণ তাহা সমুদায় দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসাদি কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দের কিছুমাত্র আস্থা নাই। তাই তিনি প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন, আর প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যান। তাঁহার মতে প্রভুর এ সমুদায় কাচ ফেলিয়া দিয়া নদিয়ায় জননীর নিকট যাওয়াই উচিত। জগদানন্দের ও দামোদরের ঠিক বিপরীত ভাব। দামোদরের সর্ব্বদা ভয়, পাছে প্রভুর ধর্ম্ম-পালন ঠিক নিয়ম মত না হয়; আর জগদানন্দের ভয় পাছে প্রভুর পেট না ভরে, কি ভাল নিদ্রা না হয়। মুকুন্দের ভজন সাধন, প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান, প্রভুর রূপ দর্শন ও প্রভুর চরণ সেবন। তিনি প্রভুর সোণার অঙ্গে কৌপীন, কি মৃত্তিকায় শয়ন, কিরূপে দেখিবেন?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। যত দিবস তাঁহারা প্রভুকে ঘিরিয়া ছিলেন, তত দিবস তাঁহারা ও নদেবাসীগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। নদেবাসীগণ নদের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁহারা নিজেও তাঁহাদের প্রাণ মন বুদ্ধি সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে দিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এখন বলিতেছেন যে, তিনি দক্ষিণদেশে যাইবেন, এবং একা যাইবেন কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না! যিনি বলিতেছেন, তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করেন পরে প্রস্তাব করেন। আর যে প্রস্তাব করেন, তাহা ত্রিভুবন যদি তাঁহার বিরোধী হয়, তাহাও শুনেন না। কাজেই ভক্তগণ বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "শতবার দেহ ত্যাগ করা যায়, তবু তোমাদের সঙ্গ

ত্যাগ করা যায় না। তোমরা আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচলচন্দ্র দর্শন করাইলে। এ দেহ সম্পূর্ণরূপে তোমাদের, আমাকে যেখানে সেখানে বিক্রয় করিতে পার। আমি একবার দক্ষিণদেশে যাব, একাকী যাব। যাইয়া সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত দ্রুত-গতিতে গমন করিয়া ফিরিয়া আসিব। তোমরা এখানেই থাক, আমি যে যাইব, সেই আসিব।"

শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু নিতান্তই যাইবেন, আর আমরা কি বলিব? তবে একাকী যাইবেন, ইহা আমরা সহিতে পারিব না। প্রথমতঃ নামজপ করিতে তোমার হস্ত আবদ্ধ। সঙ্গে তোমার কৌপীন, বহির্ব্বাস ও জল-পাত্র যাইবে। কিন্তু উহা কে বহন করিবে? যদি তুমি স্বয়ং বহন কর, তবে নাম জপিবে কিরূপে? তাহার পরে তুমি পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কে তোমাকে সন্তর্পণ করিবে? কে তোমার জন্য ভিক্ষা করিবে, করিয়া প্রসাদ তুঞ্জাইয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিবে? তুমি স্বেচ্ছাময়, তুমি আমাদের যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহা আমাদের করিতেই হইবে। কিন্তু তোমাকে এরূপে বিদায় দিতে আমরা প্রাণ থাকিতে কিরূপে পারি?"

প্রভুর মন একটু শিথিল হইল, তাহা ভক্তগণ বুঝিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, "তাহার পরে সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথের নিকটে চলুন, এবং এ কথা শুনিয়া তাঁহারা কি বলেন শ্রবণ করুন।" শ্রীনিত্যানন্দ ভাবিলেন যে, প্রভু সার্ব্বভৌমকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। যদি প্রভুর কিছু মন ফিরাইতে হয়, তবে উহা সার্ব্বভৌম দ্বারা করাইতে হইবে।

প্রভু বলিলেন, "ভাল, তবে চল সার্ব্বভৌমের নিকট যাই।"

ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট সকলে গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম সর্ব্ব সুমঙ্গল উপস্থিত দেখিয়া, মহাহর্ষে উঠিয়া পাদ্য-অর্ঘ দিয়া প্রভুকে ও শ্রীনিতাইকে পূজা করিলেন। সার্ব্বভৌম জানেন না যে, প্রভু তাঁহার গলায় ছুরি দিতে আসিয়াছেন। দুই একবার কৃষ্ণ কথার পরে প্রভু তাঁহার দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সার্ব্বভৌম মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীভগবদ্দত্ত মনুষ্য হৃদয়ের যে মধুর ভাবগুলি তাহা তিনি কখন ইচ্ছা করিয়া উৎকর্ষ করেন নাই, বরং চেষ্টা করিয়া দলন করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবন পোড়াইয়া ছাই করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ভস্মাবৃত স্থান প্রথমতঃ আর্দ্র করিয়া, পরে কর্ষণ করিয়া, শ্রীপ্রভু যত্ন করিয়া সেখানে প্রেমের বীজ রোপণ করিলেন। এই বীজ এখন অঙ্কুরিত হইয়াছে! প্রভু তাই এখন ভাঙ্গিতে চাহিলেন, তিনি তাহা সহিবেন কিরূপে? প্রভু যাইবেন শুনিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "প্রভু! তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য কবিতে হইবে জানিতাম না। তুমি স্বেচ্ছাময়, যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, কাহার সাধ্য উহা হইতে তোমাকে বিরত করে। তবে তুমি গমন করিলে তোমার বিরহে আমাদের জীবন থাকিবে না তাহা বুঝিতেছি। সার্ব্বভৌম বলিতেছেন—

কথং সমাভূন্নহি পুত্রশোকঃ
কথং মমাভুন্নহি দেহপাতঃ।
বিলোক্য যুষ্মচ্চরণাব্জযুগ্মং
সোঢ়ুংন শক্তোঽস্মি ভবদ্বিয়োগং॥ ৯॥
বত কেন গন্তাসি পথাস্থ কেন
কথং পথক্লেশসহোঽথ ভাবী।—চৈতন্য চরিত।

প্রভো! আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাত কেন না হইল, আপনার পাদপদ্ম-যুগল দর্শন না করিয়া আপনার বিয়োগ কিরূপে সহ্য করিব?

প্রভো! আপনি কোন্ পথে যাইবেন? এবং কিরূপেই বা পথের ক্লেশ সহ্য করিবেন? হা কষ্ট!

আবার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

শুনি সার্ব্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর॥
বহুজন্মের পুণ্য ফলে পাই তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহনে না যায়॥

এই প্রবলপ্রতাপান্বিত শ্রীবৃহস্পতি-অবতার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর অপেক্ষা বহুগুণে প্রিয় হইয়াছেন। যখন শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন,—শ্রীনন্দনন্দন গোপ-গোপীগণের নিকট এত প্রিয় হইলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে আপন পুত্র হইতেও অধিক প্রীতি করিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতাবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে? এ যে একেবারে অস্বাভাবিক। তাহাতে শুকদেব বলিলেন, এরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; যেহেতু যিনি যত নিকট-সম্পর্কীয় হউন, শ্রীভগবানের মত নিকট-সম্পর্কীয় কেহই নহেন, কারণ তিনি জীবের প্রাণের প্রাণ। সুতরাং সার্ব্বভৌম যে বলিলেন, পুত্র মরিয়া যায় ইহাও সহ্য করা যায়, তবু প্রভুর বিরহ সহ্য করা যায় না,

তাহার বিচিত্র কি? শ্রীগৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইলেন; বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? আমি সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইব, যে যাইব সেই আসিব, আর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সত্বরই ফিরিয়া আসিব।"

এই যে শ্রীপ্রভু বলিলেন, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, ইহাতে সকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তাঁহারা জানেন প্রভুর বাক্য অব্যর্থ। সার্ব্বভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রভুকে তাঁহার ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত করিবার যত্ন করিলেন না। ভাবিলেন, পরে সুবিধা মত উহা করিবেন। তবে বলিবেন, "প্রভু! তুমি স্বেচ্ছাময়, তোমাকে আমরা রোধ করিতে পারিব না। তবে যদি যাইবেন, আর কিছু দিন থাকুন, প্রাণ ভরিয়া চরণ দর্শন করি।" প্রভু এ কথা শুনিয়া তখনি স্বীকার করিলেন।

সার্ব্বভৌম তখন প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিয়া মনের সাধে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী (যাঁহাকে ষাঠীর মাতা বলিতেন, যেহেতু তাঁহার কন্যার নাম ষাঠী) রন্ধন করেন, আর সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করেন। সার্ব্বভৌম ও ভক্তগণ প্রভুকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। প্রভু যাইবেন ইহা সাব্যস্ত হইল, তবে একজন ভৃত্য সঙ্গে লইবেন, সকলের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমের অনুরোধে পঞ্চ দিবস রহিলেন।

ষষ্ঠ দিবস প্রভাতে প্রভু বলিতেছেন, "তবে আমি চলিলাম।" এই কথায় সকলের মুখ মলিন হইয়া গেল। মনোদুঃখে ও নীরবে সকলে প্রভুর সহিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করিলেন। প্রভু করযোড়ে, সর্ব্বসমক্ষে, শ্রীজগন্নাথের নিকট দক্ষিণ ভ্রমণের আজ্ঞা মাগিলেন। পূজারি তখনই আজ্ঞা-মালা ও চন্দন আনিয়া

দিলেন। প্রভুও মহা আনন্দিত হইয়া মালা গ্রহণ করিলেন। তখন সকলে একত্র হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন, করিয়া সমুদ্র-পথ ধরিলেন। সঙ্গে সমুদায় ভক্তগণ চলিলেন এবং গোপীনাথ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রসাদান্ন আর প্রভুর ভৃত্য দ্বারা চারিখানি কৌপীন ও বহির্ব্বাস সেই সঙ্গে লইলেন।

একটু গমন করিয়া প্রভু দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া সার্ব্বভৌমকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, আমার একটী নিবেদন আছে। গোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরের অধিকারী শ্রীরামানন্দ রায় আছেন। সে দেশ গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধিকার। সেই রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ও বিষয়ীর কার্য্য করেন। আমার ইচ্ছা যে, আপনি তাঁহাকে তাই বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার ন্যায় ভক্ত ও রসজ্ঞ পৃথিবীতে আর নাই। তাঁহার কথা কিছু না বুঝিতে পারিয়া, বৃথা বিদ্যা-মদে আমি চিরদিন তাঁহাকে উপহাস করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনার কৃপাবলে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছি। অতএব তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না।" প্রভু বলিলেন, "তাই হইবে।"

প্রভু সার্ব্বভৌমকে আর সঙ্গে যাইতে দিবেন না। বলিলেন, "তুমি গৃহে যাও, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিও, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে ফিরিয়া আসিব।" ইহাই বলিয়া সার্ব্বভৌমকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া অতি প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন দিলেন। সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন দিয়া প্রভু চলিলেন। ভট্টাচার্য্য একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, পরে কাঁপিতে লাগিলেন এবং "প্রভু!" বলিয়া মৃত্তিকায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ আর ফিরিয়া চাহিলেন না, চলিতে লাগিলেন; তবে

একটু আস্তে আস্তে। প্রভু কি বলিয়া ফিরিয়া চাহিবেন? কি দেখিবেন? আর, দেখিয়া সহিবেনইবা কিরূপে? কিন্তু ভক্তগণ অমনি সার্ব্বভৌমকে ঘিরিয়া বসিলেন, বসিয়া তাঁহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম চেতন পাইলেন, আর ভক্তগণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন; পরে লোক দ্বারা তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম বাণাহত মৃগের ন্যায় ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু ভক্তগণ সহ সমুদ্র-পথে, সমুদ্রের ধারে ধারে আলালনাথে গিয়া উপস্থিত লইলেন।

প্রভু আলালনাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর সৌন্দর্য্য, হাব ভাব প্রভৃতি, বসন ও বয়স দেখিয়া লোকে চমকিত হইল। চারিদিক হইতে এত লোক আসিল যে, প্রভুকে রক্ষা করা ভক্তগণের কঠিন হইল। যাহারা প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছে তাহারাও উন্মত্ত হইয়াছে, গৃহ ভুলিয়াছে এবং হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। এই মহা কলরবের মধ্যে প্রভুর ভিক্ষা সমাধান হওয়া দুর্ঘট হইল। তখন ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া মন্দিরের দ্বারে কপাট দিলেন। এবং গোপীনাথ যে প্রসাদান্ন আনিয়াছিলেন তাহা প্রথমে নিতাই গৌরকে ভুঞ্জাইলেন, ও শেষে সেই প্রসাদ সকলে বাঁটিয়া খাইলেন। এদিকে লোকের ভিড় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হরিধ্বনিতে গগন যেন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সকলের প্রার্থনা, "প্রভু, একবার দর্শন দাও।" কিন্তু ভক্তভণ ভয়ে দ্বার খুলিলেন না, যেহেতু লোকের ভিড় এত যে তাঁহারা দ্বার খুলিতে সাহস পাইতেছেন না। কিন্তু প্রভু লোকের আর্ত্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে দর্শন করিল, আর "জয় কৃষ্ণচৈতন্য," "জয় সচল জগন্নাথ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

এ রহস্য যেন স্মরণ থাকে যে, প্রভু একজন সন্ন্যাসী বই নয়, অথচ দর্শনমাত্র লোকে তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইল। সারানিশি এইরূপ নৃত্যে ও হরিনামের কোলাহলে যাপিত হইল।

নিত্যানন্দ অন্যান্য ভক্তগণকে বলিতেছেন, "তোমরা এখন প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিলে ত? এইরূপ গ্রামে গ্রামে হইবে।"

প্রভাত হইল, সকলে প্রাতঃস্নান করিলেন। তখন প্রভু বিদায় মাগিলেন। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। প্রভু সকলকে ধরিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন, আর সকলে একে একে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পড়িয়া থাকিলেন; কিন্তু তাঁহারা যেরূপ সার্ব্বভৌমকে ধরিয়া উঠাইয়াছিলেন, সেরূপ করিয়া তাঁহাদের আর কে উঠাইবে? তখন প্রভু কি করিলেন? যথা চরিতামৃতে— "বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হৈয়া।" আর পশ্চাতে জলপাত্র ও বহির্ব্বাস বহন করিয়া ভৃত্য চলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমায় ধর নিতাই ॥ ধ্রু ॥
জীবকে হরিনাম বিলাতে,
লাগ্‌ল সে ঢেউ প্রেম-নদীতে,
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই ॥
যে দুঃখ আমার অন্তরে,
ব্যথিত কেবা কব কারে,
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ অতি ব্যাকুল হৃদয়ে ভৃত্যের সহিত চলিলেন। ভক্তগণ পড়িয়া রহিলেন। এইরূপে সারা দিবস ও রজনী গেল। পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে রোদন করিতে করিতে নীলাচল অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। ভক্তগণকে পশ্চাৎ করিয়া প্রভু একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুই বাহু তুলিয়া অতি মধুর নৃত্য ও অতি গম্ভীর স্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। যথা, প্রভুর শ্রীমুখের কীর্ত্তন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌ ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্‌ ॥

সেই সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া যেন ত্রিভুবন সুশীতল ও আশ্বাসিত হইতে লাগিল। প্রভুর বয়স তখন সবে পঞ্চবিংশতি, সর্ব্বাঙ্গ মনোহর ও দেহ অতি দীর্ঘ। তাঁহার পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস। দুই হস্ত উর্দ্ধদিকে, তাহাতে জপের মালা, সেই মালা ভক্তিপূর্ব্বক মস্তকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু সুমধুর স্বরে "কৃষ্ণ পাহি মাম্" বলিয়া গীত গাইতেছেন, আর পদ্ম-চক্ষু দিয়া শত সহস্র ধারা পড়িতেছে। প্রভু যাইতেছেন কেন, না পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে! আমার বোধ হয় দেবগণ তখন অন্তরীক্ষে দাঁড়াইয়া প্রভুর অপরূপ শোভা দর্শন ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, কাহার সহিত কথাও নাই। ভৃত্যও নীরবে পশ্চাৎ যাইতেছেন। প্রভুর গতি-ভঙ্গ নাই, এক মনে চলিয়াছেন, তাঁহার মন তিনিই জানেন। এমন সময় প্রভু হঠাৎ স্থির হইলেন, দাঁড়াইলেন, পরে বসিলেন। কেন বসিলেন তাহা কে বলিবে? কিন্তু একটু পরে বুঝা গেল তিনি কেন বসিলেন। যেমন পুষ্প ফুটিলে মধুকর আপনি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ প্রভু বসিলে ক্রমে ক্রমে এক দুই করিয়া বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া "হরি" "হরি" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। প্রভু একটু পরে আপনি উঠিলেন, উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রেমের তরঙ্গ উঠিল। প্রভু তাঁহার মধ্যে দুই একজনকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহার পর আবার চলিলেন। কখন বা প্রভু চলিতেছেন, আর পথের লোক তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ চলিতেছে। প্রভু বলিলেন, "বল হরিবোল।" তাহারা হরি হরি বলিতে বলিতে চলিল। এইরূপ কতক দূর গমন করিলে তাহার মধ্যে যাহার মন নির্ম্মল হইল, তাহার হৃদয়ক্ষেত্র আর্দ্র ও কর্ষিত হইল, এবং

সে প্রেমরূপ বীজ অঙ্কুরিত করিতে শক্তি পাইল। অমনি প্রভু দাঁড়াইলেন, ফিরিলেন ও সেই ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন। সে অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিল, প্রভু চলিয়া গেলেন। এই যে প্রভুকে লোকে একবার দর্শন করিল, কি এই যে দুই একজন প্রভুর আলিঙ্গন পাইল, উহাতে সে দেশ উদ্ধার হইয়া গেল। ইহা কিরূপে হইল বলিতেছি।

প্রভু দক্ষিণ দেশে যে শক্তিতে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা অননুভবনীয়। সেইরূপ শক্তির কথা কোথাও কোন কালে শুনা যায় নাই। শ্রীচরিতামৃত এই অচিন্ত্যনীয় শক্তির এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা—

এই শ্লোক পথে পড়ি চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভু-পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তিসঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ-নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তার দর্শন কৃপায় হয় তাহারি মতন॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামে আসি তারে দেখি বৈষ্ণব হয়॥

সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈলা সব দক্ষিণ দেশ॥
এই মত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করে যার ঘরে।
সেই গ্রামে যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর দর্শনে হয় মহা ভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিল জগত॥
এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বলোক বৈষ্ণব হৈলা প্রভুর সম্বন্ধে॥

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমুদায় লোকে শুধু "হরি" কি "কৃষ্ণ" এই শব্দ বলিতে শিখিল, কি বলিতে লাগিল, কি উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল, তাহা নহে। প্রভুর ধর্ম্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব তাহা যাহার যতদুর অধিকার তাহার মনে সেই মূহূর্ত্তের মধ্যে ততটা স্ফূর্ত্তি হইল। স্ফূর্ত্তি হইল বলিলে ঠিক বলা হইল না, সেই মূহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে সেই সমুদায় তত্ত্বের বীজ রোপিত হইল।

মহাজনগণ, যাঁহারা প্রভুর পার্ষদ ও লীলা-লেখক, তাঁহাদের এই শক্তি-সঞ্চার প্রক্রিয়া বর্ণনায় একটী বড় রহস্য অবগত হওয়া যায়। সেটী এই যে, প্রভু যেন প্রক্রিয়াটী বেশ বুঝিতেন ও বেশ জানিতেন। যেমন কর্দ্দম কুম্ভকারের নিকট, সেইরূপ কোন জীব (যাঁহাকে প্রভু কৃপা করিবেন) তাঁহার নিকট। প্রভু কাহাকে স্পর্শ করিলেন; কাহাকে উহা করিলেন না,—তাহাকে বলিলেন "হরি বল"। ফল কিন্তু উভয় স্থলেই সমান হইল, উভয়েই "হরি" বলিয়া উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কেন এক জনকে শ্রীমুখের বাক্যে দ্বারা, এবং অন্য

জনকে স্পর্শ করিয়া, শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। যদি বল প্রভু বিচার করিয়া কোন বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেন না,—তিনি যে পদ্ধতিই অবলম্বন করিতেন তাহার ফল একই হইত। অর্থাৎ যাহাকে স্পর্শ করিয়া উদ্ধার করিতেন, তাহাকে তাহা না করিয়া যদি বলিতেন, "হরি বল", তাহা হইলেও সেই সমান ফল হইত। কিন্তু আমাদের প্রভুর লীলা চিন্তা করিয়া তাহা বোধ হয় না। ইহার যে একটী শাস্ত্র আছে তাহার সন্দেহ নাই; সাধুগণ উহার নিয়ম কিছু কিছু জানেন, কিন্তু প্রভু ছিলেন ইহার অধ্যাপক।

প্রভু এইরূপে প্রথমে একজনকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, কিন্তু তখন তাহাতে কোন তত্ত্ব স্ফূরিত হইল না। কেবল যন্ত্রের ন্যায় সে বিবশ হইয়া মুখে হরি বলিতে ও নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাতে তাহার নানাবিধ ভাব হইতে লাগিল, যথা নয়ন দিয়া জল ও মুখ হইতে লালা পড়িতে লাগিল ও তাহার ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। এ পরিশ্রমের ঘর্ম্ম নয়, এ ঘর্ম্ম আর একরূপ। ক্রমে তাহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল; ইহাতে হইল কি না, তাহার হৃদয় নূতন আকৃতি ধারণ করিল। প্রায় জীব মাত্রের হৃদয় কিরূপ, না স্বর্ণ খনির এক খণ্ড মৃত্তিকার ন্যায় এই মৃত্তিকাবৃত স্বর্ণ উদ্ধার করিতে হইলে নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। প্রভু যখন শক্তিসঞ্চার করিলেন, তখন হৃদয়ে সেই সমুদায় প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। হৃদয় দ্রব হইল, আর তাহার মধ্যস্থিত সাধুভাব মলিন আবরণ হইতে পৃথক্ হইতে লাগিল। এখন বিবেচনা করুন, স্বর্ণ এইরূপে দ্রবীভূত হইলে, ছাঁচে ঢালা হয়। সেইরূপ যখন হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তখন প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন। সেই ব্যক্তি পূর্ব্বে একজন সামান্য জীব ছিল,

এখন সে প্রভুর আলিঙ্গন-রূপ ছাঁচে পড়িয়া ব্রজের একজন পরিকর হইল। এখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উপরে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই চরণটী বিচার করুন, যথা—

"কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গয়ে।

এখানে "কতক্ষণ রহি" এই কয়েকটী কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার অর্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত হৃদয় সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হয়, ততক্ষণ প্রভু অপেক্ষা করেন। স্বর্ণকার স্বর্ণ উত্তাপে দিয়া "কতক্ষণ" বসিয়া থাকে; কেননা সুবর্ণ দ্রবীভূত হইতে খানিক সময় লাগে। ইহাও সেইরূপ।

একটু পূর্ব্বে বলিলাম যে, প্রভুর এই আলিঙ্গন পাইয়া কৃপা-পাত্র শুধু ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল না, বৈষ্ণবধর্ম্মের সমুদায় নিগূঢ়-তত্ত্ব ক্রমে তাহার হৃদয়ে স্ফুরিত হইল। তদ্দণ্ডে না, ক্রমে ক্রমে, অর্থাৎ প্রভু আলিঙ্গন দিয়া তাহার হৃদয়ে এই নিগূঢ় তত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়া দিলেন। প্রভু চলিয়া গেলেন, আর বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তবে সকলের হৃদয় সমান স্ফূরিত হইল না, যেহেতু ক্ষেত্র অর্থাৎ অধিকার সকলের সমান নহে।

মনে ভাবুন, কোন নিবিড় জঙ্গলে, যেখানে আম্র বৃক্ষ নাই, সেখানে কোন ব্যক্তি একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া, উহা কর্ষণ ও জল দ্বারা সিঞ্চিত করিয়া, একটী আম্র বীজ রোপণ করিল ও বীজটী বেড়া দিয়া সে চলিয়া গেল। মনে ভাবুন, ত্রিশ বৎসর পরে সেই ব্যক্তি আবার সেখানে আসিল। আসিয়া সে কি দেখিবে? সে দেখিবে যে, সেখানে একটী আম্রের বাগান হইয়াছে; যে বৃক্ষগুলি হইয়াছে, সেগুলি ঠিক আম্র বৃক্ষের মত, তাহাতে যে ফল হইতেছে তাহাও ঠিক আম্রের মত,—সেইরূপ আস্বাদ, সেই গন্ধ, সেই আকার। এই শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়া, বিশেষ

বিশেষ ঘটনা লইয়া পরে আরো বিচার করিতে হইবে, তখন এই বিষয় আরো পরিষ্কার হইবে। তাহাতে কতক বুঝা যাইবে যে, শ্রীভগবান্ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে কত কারিগরিই করিয়াছেন ও তাহাদিগকে কত প্রকার শক্তিই দিয়াছেন।

প্রভু কখন ধীরে, কখন বিদ্যুতের গতিতে গমন করিতেছেন। যখন দ্রুত যাইতেছেন, তখন ভৃত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছেন না, তবু কোন গতিকে প্রভুকে নয়নের অগোচর হইতে দিতেছেন না। যখন প্রভু কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে ভারে উপহার আসিতেছে, ভৃত্য যাহা প্রয়োজন তাহা লইতেছেন, আর ফিরাইয়া দিতেছেন। যখন জনপদ দিয়া গমন করিতেছেন, তখন আহারীয় দ্রব্য কোন না কোন প্রকারে মিলিতেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে পথে জঙ্গল, জঙ্গল নয় নিবিড় অরণ্য,—১০।১৫ দিনের পথ-মধ্যে কিছু পাওয়া যায় না। ভৃত্য এই সংবাদ জানিয়া কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, করিয়া ঐ বিস্তীর্ণ জনশূন্য বনে প্রভুর পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন।

কিছুদিন পরে এই আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া গেল, ভৃত্য প্রভুকে ভিক্ষা দিতে পারিলেন না! সারাদিন উপবাসে গেল, রজনী আসিল। নিবিড় জঙ্গল আর যাইবার যো নাই, প্রভু সেই অন্ধকারে বৃক্ষতলে বসিলেন। ইহা দেখিয়া ভৃত্য প্রভুর পদতলে বসিলেন। প্রভু তখন বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহে—কখন নীরবে, কখন উচ্চৈঃস্বরে—রোদন করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য আপনি উপবাসী তাহাতে তাহার দুঃখ নাই, কিন্তু প্রভু উপবাসী রহিলেন, ইহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। একে তাহার এই দুঃখ, তাহার পরে প্রভুর করুণাস্বরে রোদন। ভৃত্য প্রভুর পদতলে, দুই জানুর মধ্যে মস্তক রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভুর নিদ্রা নাই, ক্ষুধা বোধ নাই, অন্য কোন দুঃখ নাই, কেবল দুঃখ—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ !

আবার এমনও হইল, হিংস্র পশুগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। প্রভু উহা শুনিলেন কি না ভৃত্য তাহা জানিতেও পারিলেন না, কিন্তু ভৃত্য ভয় পাইয়া প্রভুর পদতলের আরো নিকটে আসিলেন। এমন সময় ব্যাঘ্র সম্মুখে আসিল। ভৃত্য জীবধর্ম্ম বশতঃ বড় ভয় পাইলেন। ব্যাঘ্র তাহাদিগকে খানিক দেখিল, দেখিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ হিংস্র জন্তুর সহিত মুহুর্ম্মুহু দেখা হইতেছে, কিন্তু প্রভুকে দর্শন মাত্র তাহারা পশুভাব হারাইয়া অতি নম্র হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে, কখন বা সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিতেছে।

শচীর দুলাল নিমাই এখন উপবাসী রহিতে লাগিলেন। তিনি ভক্ত ভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তের দুঃখ ও সুখ আস্বাদ করিতেছেন। ভক্তের সময় সময় উপবাস করিতে হয়, কাজেই তাঁহা করিতে হইল। তাঁহার নিজের বেলা উপাদেয় সেবা আর ভক্তের বেলা উপবাস, এরূপ বিচার তিনি কখন করিতে পারেন না। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভু কাঙ্গাল বেশ ধরিলেন, বৃক্ষতলবাসী হইলেন, সুতরাং উপবাস করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু সেই শচীর স্তন্য-দুগ্ধে প্রতিপালিত এবং নবদ্বীপবাসীর আদরে বর্দ্ধিত, ভুবনমোহন "বরতনু" ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। প্রভুর সুন্দর, সুবলিত, প্রকাণ্ড ও রোগশূন্য দেহ হঠাৎ দুর্ব্বল হইবার কথা নয়। যতদিবস তাঁহার শরীরের দৌর্ব্বল্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় নাই ততদিন তাঁহার কাঙ্গাল বেশ অন্য লোকের নিকট তত প্রকটিত কি ক্লেশকর বোধ হয় নাই। কিন্তু প্রভু স্বইচ্ছায় স্বভাবের নিয়মের অধীনে আসিয়াছেন। সেই ভীষণ রৌদ্রের সময়, সেই উষ্ণ-প্রধান দেশে, অনবরত পথ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কৃষ্ণ-

বিরহ-রূপ "মহাজ্বর" তাঁহার হৃদয় ক্ষয় করিতেছে, উদারাগ্নি ও উপবাস তাঁহার সর্ব্বতনু ক্ষয় করিতেছে, সেখানে যে তিনি ক্রমে দুর্ব্বল হইবেন, তাহার বিচিত্র কি ?

প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত ; তবে নয়ন-জলের স্রোত শরীরের যে অংশ বহিয়া পড়িতেছে সে স্থান ধৌত হওয়াতে, দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য জলজল করিতেছে। প্রভুর পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস, তাহা আবার অতি মলিন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত কটিদেশে কেবল অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র এই মাত্র। প্রভুর মুখে শ্মশ্রুর আবির্ভাব হইয়াছে। কাটোয়ায় কেশ মুণ্ডন করেন, আবার কেশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কটিদেশ একগাছি দড়ি দ্বারা বেষ্টিত, উহাতে কৌপীন আবদ্ধ। দুই হস্ত উচ্চ করিয়া প্রভু মালা জপিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ডাকিতেছেন।

প্রভুর সেই বিশাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্থি দর্শন দিল। প্রভুকে তখন দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন. ভক্তিদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়া বেড়াইতেছেন। আর ইহাও বোধ হইতে লাগিল, ইহা দেখা অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে ভাল।

প্রভুর গার্হস্থ্য সুখ দেখিয়া নবদ্বীপের ষণ্ডাগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে চাহিয়াছিল। এখন যদি তাহারা সেই প্রভুকে দর্শন করিত, তবে কান্দিয়া আকুল হইত। তাহারা বলিত, "হে সুন্দর ! আমরা ভাল হইব, শ্রীহরিকে ভজনা করিব, আর তাঁহাকে ভুলিব না, তুমি যাহা বল তাহাই করিব। এ বেশ, এ ভাব ত্যাগ কর, আমরা আর সহিতে পারিতেছি না; এই রূপে প্রভুর অননুভবনীয় ক্লেশ জীব-উদ্ধারের কারণ হইল।

প্রভুকে দর্শন করিয়া বালকগণ তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিল। এক রাখাল অন্যকে ডাকিয়া বলিতেছে, "ওরে পাগল দেখে যা, এ হরিনামের

পাগল। হরিনাম বলিলে খেপিয়া উঠে।” এ কথা শুনিয়া রাখালগণ জুটিয়া গেল। সেই রাখাল বলিতেছে, “দেখ, এমনি বেশ যাইতেছে, কিন্তু হরিনামই শুনিলেই খেপিয়া উঠিবে। আয় আমরা পাগল খেপাই। সকলে তখন হরিবোল বলিয়া চীৎকার করিতে ও করতালি দিতে লাগিল।

প্রভু দ্রুত যাইতেছিলেন, হরিবোল শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। সেই রাখাল বলিতেছে, “দেখ্‌লি ত ? ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, আরো হরি বল। এই খ্যাপে আর কি ?” রাখালগণ আরো উৎসাহের সহিত হরি বলিতে লাগিল। তখন প্রভু বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া গাত্রে ধুলা মাখিতে লাগিলেন। রাখালগণ যত হরি বলে, প্রভু তাহাদের দিকে চাহিয়া, আহ্লাদে হাসিয়া গাত্রে তত ধুলা মাখেন। রাখাল বলিতেছে, “ঐ দেখ্‌ খেপিয়াছে।” কিন্তু ইহার মধ্যে রহস্য এই যে, প্রভু খেপুন আর না খেপুন, রাখালগণ প্রকৃতই খেপিল, তাহাদের মুখে চিরদিনের নিমিত্ত এই হরিনাম লাগিয়া গেল।

প্রভু যাইতেছেন, প্রভুর মহিমা অগ্রে অগ্রে যাইতেছে। সে মহিমা এই—শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, তিনি এখন সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া জীবগণকে হরিনাম বিলাইতেছেন। এ কথা প্রভুর অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। লোকে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, প্রভু যে শ্রীভগবান তাহা সাব্যস্ত করিয়া তাহারা তাঁহার প্রতীক্ষা করিঘেছে।

প্রভু কতদিন পরে কুর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুর্ম্মকে দেখিয়া প্রভু বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন।

যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণামে॥
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল।
দেখি সর্ব্বলোকে চিত্তে চমৎকার হৈল॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি।
প্রেমাবশে নাচে উর্দ্ধ বাহু করি॥
কৃষ্ণনাম লোক মুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
এই মত পরস্পর দেশ বৈষ্ণব হইল।
কৃষ্ণ নামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥

পর দিবস প্রাতে প্রভু সে স্থান ত্যাগ করিলেন। লোক সকল তাঁহার পশ্চাৎ চলিল, কিন্তু প্রভু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন ও বলিলেন, "ঘরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" প্রভু এক ক্রোশ পথ গমন করিলে, সেই কূর্ম্ম-স্থানে বাসুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন: তিনি পরম ভক্ত, কিন্তু কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই, যেহেতু শ্রীভগবানে তাঁহার গাঢ় ভক্তি। ভক্তের হৃদয়ে কি একটী আনন্দ স্রোত বহিতে থাকে, সুতরাং তাহাকে কোন দুঃখে কাতর করিতে পারে না। বাসুদেবের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়াছে, তাহাতে কীড়া হইয়াছে। সকলে ভাবে ঐ কীড়া তাঁহাকে বড় দুঃখ দিতেছে, কিন্তু বাসুদেব তাহা ভাবেন না। তিনি ভাবেন যে,

তাঁহার দেহ একেবারে জগতের ত্যজ্য সামগ্রী নহে, যেহেতু উহা সেই কীড়া গুলিকে আহার দিতেছে। তাই যদি কীড়াগুলির মধ্যে কোন একটা অঙ্গের ক্ষতস্থান হইতে মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়, তবে দুঃখ পাইবে বলিয়া উহা আবার সেই স্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন। যেমন মাতা পুত্রগণকে স্তন পান করাইয়া থাকেন, বাসুদেব সেইরূপ কীড়াগণকে আপন অঙ্গ দিয়া পালন করেন। তাহার আর এক বিশেষ কারণ এই যে, কীড়াগুলি ব্যতীত তাঁহার নিজ-জন আর কেহ ছিল না। তাঁহার অঙ্গের দুর্গন্ধে কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে পারিত না। সুতরাং কীড়াগুলি তাঁহার একমাত্র সঙ্গী, তাই তাহাদিগকে নিজ-জন ভাবিয়া যত্ন করিয়া পালন করিতেন। বাসুদেব রজনীতে শুনিলেন যে, শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া নগরে নগরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি তখন সন্ন্যাসীরূপী শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্তু চলৎশক্তি নাই, তাই আস্তে আস্তে, কখন বসিয়া, কখন উঠিয়া, কখন জানু গতিতে, যেরূপে পারেন, কূর্ম্মস্থানে যাইতে লাগিলেন। শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, সুতরাং অঙ্গে একটু বল হইয়াছে, আর সেই বলে প্রকৃতই কূর্ম্ম-স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন।

সেখানে যাইয়া শুনিলেন যে, প্রভু তাঁহার আগমনের একটু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন।

বাসুদেব বড় আশা করিয়া গিয়াছিলেন, সে আশা ভঙ্গ হইল, সেও সামান্য আশা নয়, কাজেই সামলাইতে পারিলেন না। "হা ভগবান্! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।"

যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেন, তখন

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, "হা হরি শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দাও" বলিয়া রোদন করিতে থাকিলে প্রভুর "গতি ভঙ্গ হয়", এখনও তাহাই হইল। "হা ভগবান! আমি তোমাকে দেখিতে পাইলমে না" বলিয়া যেইমাত্র বাসুদেব মূর্চ্ছিত হইলেন, তখনই শ্রীগৌরাঙ্গের "গতি ভঙ্গ" হইল। প্রভু চলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইলেন, আর যেন কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিলেন। তখন "এই যে আইলাম" অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে এই কথা বলিয়া ফিরিয়া কূর্ম্মস্থানের দিকে দৌড়িলেন। প্রভু তখন বাসুদেব হইতে এক ক্রোশ দূরে। এ এক ক্রোশ মূহূর্ত্তের মধ্যে অতিক্রম করিলেন, ভৃত্য প্রভুর পশ্চাৎ আসিতে পারিলেন না। তাহার পরে—

কুষ্ঠী বিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্দ্র।
চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু॥
দীর্ঘ দুই ভুজ প্রকাশিয়া দামোদরে।
গাঢ়তর আলিঙ্গন কৈল ব্রাহ্মণেরে॥
রক্ত রসা কৃমি দেখি ঘৃণা না করিল॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

বিদ্যুতের ন্যায় প্রভু আসিয়া বাসুদেবকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতে কি হইল শ্রবণ করুন, যথা, চৈতন্যচরিতে—

আগত্য দোর্ভ্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্ঠৈঃ সমং মোহমপাচকার।
সুচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রস্থালয়ন্তং ধৃতহর্ষশোকঃ॥

গৌরাঙ্গদেব আগমন করিয়া বিপ্রকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করত কুষ্ঠরোগের সহিত তাহার মোহকে বিনষ্ট করিলেন! অনন্তর বিপ্র চেতনা ও মনোহর শরীর প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ এবং শোকভরে প্রভুকে প্রণাম করিলেন।"

বাসুদের আলিঙ্গন পাইয়া চেতন প্রাপ্ত হইলেন, হইয়া দেখেন, অঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় হইয়াছে, কুষ্ঠ রোগের চিহ্নও নাই! তখন প্রভুকে

প্রভুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "হে দয়াময়! এ কি করিলে? তুমি সেই লক্ষ্মীর আবাস স্থান, তুমি আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে! জগতের জীব মাত্রে ঘৃণা করিয়া আমার নিকট আইসে না। তুমি যাহা করিলে এ কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়, কারণ তোমার কাছে উত্তম ও অধম সকলেই সমান, সকলেই তোমার সমান প্রিয়।"

আবার বলিতেছেন, "প্রভু! আমার সুখ হইতেছে না। আমি অস্পৃশ্য ছিলাম বলিয়া মনে আমার অভিমান আসিতে পারিত না, তাই তোমাকে পাইলাম। এই দেহ তুমি কৃপা করিয়া সুন্দর করিলে, এখন আর সে দীনতা থাকিবে না। আমার ভয় হইতেছে যে, আমার অভিমান সৃষ্টি হইলে, আমি তোমাকে হারাইব।"

মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥—চরিতামৃত।

এই কথা শুনিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হইল, প্রভুর চন্দ্রবদন নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল। প্রভু ভাবিতে লাগিলেন যে, বাসুদেব তাঁহাকে পরাজয় করিল।

প্রভু বলিলেন, "তোমার ন্যায় ভক্তের যদি অহঙ্কার হয়, তবে জীবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিবে কেন? তোমার অভিমান হইবে না, তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, আর জীবগণকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া উদ্ধার কর।"

চন্দ্রোদয় নাটক হইতে এই সম্বন্ধে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম; যথা, বাসুদেব বলিতেছেন—

কোথা আমি দরিদ্র পরম পাপী জন।
কোথা কৃষ্ণ ভগবান লক্ষ্মী-নিকেতন॥
নিন্দিত ব্রাহ্মণ মোরে ঘৃণা না করিলা।
বাহু পসারিয়া মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥
এই শ্লোক বিপ্রবর যখন পড়িল।
সেইক্ষণে আর এক অদ্ভূত দেখিল॥
রক্ত রসা কৃমি কুষ্ঠ সব কোথা গেল।
প্রকৃত সুন্দর দেহ অতি দীপ্ত হইল॥
দেখিয়া বাসুদেব কহিল প্রভুরে।
"এমন সুন্দর কেন কবিলে আমারে॥
তুমিত ইশ্বর পার সকল করিতে।
কিন্তু আমি ব্যাধি হঞা ছিনু সুস্থ চিত্তে॥
নিরুদ্বেগে সুখে ছিনু স্থির ছিল মন।
নিরন্তর স্মৃতি ছিল গোবিন্দ চরণ॥
সংপ্রতি সুন্দর কৈলে ভজিতে না পাব।
বিষয়ে আসক্ত মন নানা দিকে যাব॥
কৃষ্ণ-সুখ ছাড়াইয়া ইন্দ্রিয় সুখ দিলে।
ব্যাধি ঘুচাইয়া কেন এমন করিলে?"

প্রভু গদগদ চিত্তে উত্তর করিলেন—

তা শুনিয়া সদ্রব হইল প্রভুর মন।
কহিতে লাগিলা তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ॥
পুনর্ব্বার তোমার গোবিন্দ স্মৃতি বিনা।
না হবে ব্যাপার বাহ্যে মনে দুর্ব্বাসনা॥

অতএব মনে কিছু উদ্বেগ না কর।
ভক্তি সুখ আস্বাদন কর নিরন্তর॥

বাসুদেব এ কথা শুনিয়া আর উত্তর করিবার সুবিধা পাইলেন না, যেহেতু প্রভু উপরের কথাগুলি বলিতে বলিতে অন্তর্ধান করিলেন।

বাসুদেবের তাহাতে বিশেষ দুঃখ হইল না, কারণ প্রভু যেমন তাহার জড় চক্ষু হইতে অন্তর হইলেন, অমনি অভ্যন্তরের চির-নয়নের উদয় হইয়া তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এখানে একথা উঠিতে পারে যে, প্রভু যখন বসুদেবকে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে উদ্ধার করিলেন, তখন তাঁহাকে প্রথমে ফেলিয়া না গিয়া একটু অপেক্ষা করিলেই পারিতেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহার দুই ক্রোশ পথ ভ্রমণের শ্রম লইতে হইত না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানে ও জীবমাত্রে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, পরস্পর পরস্পরকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছেন। যখন সেই আকর্ষণ পূর্ণ মাত্রায় হয়, তখনি জীব ও ভগবানে মিলন হয়। বাসুদেবের একটু বাকী ছিল, কূর্ম্মস্থানে আসিয়া প্রভুকে না পাইয়া সেই টুকু পূরণ হইল, আর অমনি শ্রীভগবানের দর্শন পাইলেন। মহারাসের রজনীতে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া বহু রোদন করিতে করিতে যখন তাঁহাদের বিরহ অসহনীয় হইল, তখনি আবার শ্রীভগবানের শ্রীবদন দেখিতে পাইলেন।

প্রভুর কি নাম, বোথায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি কূর্ম্ম স্থানের লোকেরা জানিতে পারিয়াছিলেন কি না, ঠিক জানি না। দক্ষিণদেশে অনেক স্থানে এইরূপে তাঁহার পরিচয় কেহ যে পান নাই, তাহা জানি। কূর্ম্মস্থানের লোকেরা যাহা হউক, প্রভুকে একটী নাম দিল। সে নামটী “বাসুদেবামৃত পদ!”

তাহার পরে প্রভু জিয়ড় নৃসিংহের স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই ঠাকুর স্বয়ং প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত। সেই কথা মনে করিয়া প্রভু সেখানে অকথ্য প্রেম প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রভু সেখানে এক রাত্রি মাত্র বাস করিয়া প্রভাতে আবার চলিলেন। এইরূপে ক্রমে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গোদাবরী তীর জঙ্গলে পূর্ণ। প্রভু চিরকাল বন ভাল বাসেন, সেই বন দর্শন করিয়া প্রভুর বৃন্দাবন মনে পড়িল, ক্রমে গোদাবরীকে যমুনা ভ্রম হইতে লাগিল, প্রভু আনন্দে ডগমগ হইয়া চলিলেন। কবি-কর্ণপুর তাঁহার চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে গোদাবরী দর্শনে প্রভুর মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অতি সুন্দর বলিয়া এখানে দিলাম—

গোদাবরীতুঙ্গতরঙ্গ শীতৈ—
র্মরুদ্ভিরাশ্লিষ্টলতাসমূহৈঃ।
ইতস্ততো ভূরি সমেত মত্ত-
র্বনং বিলোক্যৈষ ননন্দ নাথঃ ॥১২২॥

কদম্ববীথীষু নদন্ম্যদঙ্কৈঃ
সমুল্লসত্তাণ্ডবসৎকলাপৈঃ।
বিশ্রব্ধমুগ্নেত্রযুগৈঃ কৃপালু—
র্ননন্দ ভূয়ো হরিণৈঃ সকান্তৈঃ ॥১২৩॥

নিষ্কূজশান্তাঃ ক্বচ চণ্ডশব্দ-
প্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ ক্বচাপি।
ক্বচ প্রসুপ্তোরুকরালসত্ত্ব-
শ্বাসাগ্নিদীপ্ত্যা বনভূমিভাগাঃ ॥১২৪॥

গোদাবরীবেগমহানিনাদা
ভীমা গিরিপ্রস্রবণা রবেণ।
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিতেনুরুচ্চৈঃ
সুকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্য্যং ॥১২৫॥
ক্ষণাৎ স্খলৎপাদবিকম্প্রপক্ষৈ-
শ্চঞ্চূপতদ্বীজচয়ৈঃ প্রপূর্ণৈঃ।
শুকৈর্দলদ্দাড়িমচুম্ববদ্ভি-
গোদাবরীতীরবনে স রেমে ॥১২৬॥
তাম্বূলবল্লীদলবৃন্দমুচ্চৈ-
র্ভিন্দাদ্ভিরুগ্রৈঃ ক্রকচৈরসদ্ভিঃ।
অজস্রদীর্ঘেণ বিমুগ্ধঝিল্লী-
ঝঙ্কাররাবেণ নিকামরম্যে ॥১২৭॥
জ্যোতির্গণাচুম্বিভিরম্বুদাভৈ-
স্তমালমালার্জ্জুনকোবিদারৈঃ।
নানাবিধৈঃ পত্ররথৈরসদ্ভি-
শ্চমূরবৃন্দৈশ্চমরৈশ্চ যুষ্টৈঃ ॥১২৮॥
অর্কপ্রভাপর্কবিহীনসান্দ্র-
স্নিগ্ধাতিসচ্ছীতলচারুভূমৌ।
অকৃত্রিমালেপনিপীতমূলে
বাপীতড়াগাদিনিরন্তরালে ॥১২৯॥

তৎপরে গোদাবরীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় সুশীতল বায়ু কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত লতাসমূহ দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২২॥

তৎপরে কদম্ববীথীতে শব্দিত মৃদঙ্গ এবং তৎশ্রবণে মেঘ আশঙ্কায়

সমুল্লাসযুক্ত, ময়ুরনৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ, তথা বিশ্বস্তভাবে উর্দ্ধ-নয়ন হরিণীগণের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া গৌরচন্দ্র পুনর্ব্বার অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥১২৩॥

যে অরণ্যের ভূভাগ সকল কোন স্থানে পশুপক্ষ্যাদির শব্দ শূন্য হওয়ায় শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক্ সকল গ্রস্তপ্রায় এবং কোথাও বা প্রসুপ্ত অতি ভয়ানক জন্তুসকলের নিশ্বাসরূপ অগ্নি দ্বারা বনভূভাগ সুদীপ্ত তথা গোদাবরীর জলবেগের মহানিনাদ ও ভয়ানক গিরিপ্রস্রবণ শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকে ধৈর্য্যশূন্য করিতে লাগিল ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥

যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পাদস্খলন হয় অর্থাৎ পা পিছলিয়া যায়, তাদৃশ মনোহর পক্ষিগণের পক্ষ ও চঞ্চু পতিত বীজসমূহ দ্বারা, তথা বিদাড়িত দাড়িমফলে চুম্বনকারী ও তাম্বূল লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে সশব্দে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, সুতরাং শব্দায়মান তীক্ষ্ণকরপত্র অর্থাৎ করাত সদৃশ প্রশস্ত চঞ্চুশালী শুকপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুগ্ধ ঝিল্লী (ঝিঁজিপোকা) সমূহের নিয়ত সুদীর্ঘ ঝঙ্কার রবে যাহা অতিশয় রমণীয়, তথা নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণ স্পর্শী অর্থাৎ সমধিক সমুন্নত অম্বুদ সদৃশ তমাল শ্রেণী, অর্জ্জুন বৃক্ষ, কোবিদার (রক্তকাঞ্চন) তথা নানাবিধ শব্দায়মান পক্ষিগণ, চমুর (মৃগ) ও চমর নামক পশুগণে যাহা সেবিত এবং প্রভাকরের প্রভাবিহীন সুতরাং নিবিড় ও সুস্নিগ্ধ, যাহার সুচারু ভূভাগ সুশীতল তথা নৈসর্গিক লেপন ক্রিয়ায় যাহার মূলদেশ পরিষ্কৃত ও দীর্ঘিকা তড়াগাদি দ্বারা যাহা নিয়ত ঘন সন্নিবিষ্ট অর্থাৎ আচ্ছন্ন, তাদৃশ গোদাবরী নদীর তীরস্থ বনমধ্যে গৌরচন্দ্রের মন অতীব পরিতৃপ্তি লাভ করিল ॥১২৬—১২৯॥

প্রভু গোদাবরী পার হইলেন, ঘাটে স্নান করিলেন, স্নান করিয়া ঘাটের একটু দূরে বসিয়া মালাজপ করিতে লাগিলেন। প্রভু রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই রামানন্দ রায়ের কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "প্রভু, বিষয়ী বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। প্রভু তাই সেখানে গিয়াছেন, প্রভু তাই ঘাটে বসিয়া রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছেন। রামানন্দ রায় কায়স্থ, উৎকল নিবাসী, বিদ্যানগরের অধিপতি। বিদ্যানগর প্রতাপরুদ্র গজপতির সাম্রাজ্যের অধীন, রামানন্দ উহার অধিকারী, অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের নামে সেই দেশ শাসন করেন। সুতরাং তাঁহার সমুদায় বিষয়কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু তবু তিনি বিষয় হইতে নির্লিপ্ত। যাঁহারা বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া শ্রীভগবান ভজনের নিমিত্ত বনে গমন করেন, তাঁহারা অবশ্য মহাপুরুষ এবং মহা-শক্তিধর; কিন্তু যাঁহারা বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ের সহিত খেলা করেন ও উহা হইতে অন্তরে থাকিয়া, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আপনার চিত্ত দিতে পারেন, তাঁহারা আরো শক্তিধর। রামানন্দ রায় সেইরূপ এক জন। রামানন্দ ভৃত্য দ্বারা পরিবেষ্টিত, উত্তম শয্যায় শয়ন করেন, আর যথাযোগ্য সমুদায় বিষয় ভোগ করেন, কিন্তু তবু হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে দিবানিশি টলমল করিতেছে। রামানন্দ রায় ইহার পূর্ব্বে "জগন্নাথবল্লভ নাটক" লিখিয়াছেন, লিখিয়া গজপতি মহারাজকে উহা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই নাটকের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীমতী রাধা। নাটকখানি মধু হইতে মধু, পাঠকগণ কৃপা করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ইহা এখন অনুবাদ সহিত মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত রামানন্দ একাকী ছিলেন। তিনি যে রস ভোগ করিতেন, তাহা ভোগ করিবার আর

সঙ্গী ছিল না। কাজেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিদ্রুপ করিতেন।

প্রভু ঘাটের একটু দূরে বসিয়া রামানন্দ রায়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কাজেই তাঁহার আসিতে হইল। তাঁহার হঠাৎ গোদাবরীতে স্নান করিবার ইচ্ছা হইল, তাই স্নান করিতে আসিলেন। তিনি স্নান করিতে যাইবেন, কাজেই সে বৃহৎ ব্যাপার হইল,—সঙ্গে বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণ, বহুতর ভৃত্য, সৈন্য, হস্তি, ঘোড়া চলিল; আর সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল! এই সজ্জায় রামানন্দ, প্রভু যে ঘাটের একটু দূরে নদীতীরে বসিয়া আছেন, সেই স্থানে স্নান করিতে আসিলেন। যে প্রভু বিষয়কে তৃণ হইতে লঘু ভাবেন, রামানন্দ এই সজ্জায় দর্শন দিতে তাঁহারই সন্মুখে উপস্থিত হইলেন।

প্রভু যে স্থানে বসিয়া রামানন্দ রায়কে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সে স্থান একটী তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সে স্থান নানা সজ্জায় সুসজ্জীভূত এবং অদ্যাপিও লোকে উহা দর্শন করিতে যাইয়া থাকে।

রামানন্দ স্নান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পূজা করিলেন। এই সব করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যে, নদীর তীরে একটু দূরে এক জন সন্ন্যাসী বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। সন্ন্যাসী তিনি অনেক দেখিয়া থাকেন, সচরাচর তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও বড় ছিল না, কিন্তু ইঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। রামরায় দেখিতেছেন যেন, সন্ন্যাসী বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার গাত্র দিয়া যে তেজ বাহির হইতেছে তাহা অমানুষিক। কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি যে শুধু বিস্মিত হইলেন তাহা নহে, অত্যন্ত আকৃষ্ট হইতেও লাগিলেন। সন্ন্যাসী যেন তাঁহার প্রাণ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুত গমনে সন্ন্যাসীর দিকে যাইতে লাগিলেন। এদিকে রামানন্দকে দেখিয়া, কি করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিবেন প্রভু তাহাই ভাবিতেছেন। যখন রামানন্দ তাঁহার দিকে আসিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বুকের মধ্যে আনয়ন করেন। যে প্রভু বিষয়ী হইতে বহু দূরে থাকেন, যে প্রভু গভীর অটল, তিনি অদ্য একটী অপরিচিত বিষয়-সংস্পৃষ্ট শূদ্রকে হৃদয়ে ধরিবার নিমিত্ত ধৈর্য্য হারাইলেন! যে প্রভু, কোন এক জন ভক্ত এক খণ্ড হরিতকী সঞ্চয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার অদ্যাপি সঞ্চয় বাসনা যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত থাকিতে পারিবে না;" সেই প্রভু অদ্য একজন ভোগী রাজাকে দেখিয়া, যিনি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করিতে গমন করেন, তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিবেন বলিয়া চঞ্চল হইলেন! কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিলেন। রামানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন, করিয়া শির লোটাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রভু অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া বলিলেন, "উঠ, কৃষ্ণ বল।" তাহার পরে বলিলেন, "তুমি না রামানন্দ?" রামানন্দ তখন করযোড়ে বলিলেন, "হাঁ, আমিই সেই পাপাত্মা শূদ্রাধম বটে।" প্রভু আর কিছু বলিলেন না,—যেন চিরদিনের হারাণ বন্ধু পাইলেন, এইভাবে বিভাবিত হইয়া অমনি আনন্দে হুঙ্কার করিলেন, এবং দুই দীর্ঘ ভুজ দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বুকের মাঝে করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে প্রণাম ইত্যাদি অভ্যর্থনা প্রশস্ত নহে। গৌরদাস জীবকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। প্রণাম জীবকে পৃথকীকৃত ও ছোট বড় করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবে জীবে গাঢ় সম্বন্ধ;

আর বলিতে কি, জীবের মধ্যে ছোট বড় নাই। সকলেরই এক উৎপত্তি স্থান, সকলেরই এক গতি। যাঁহারা এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের জীব মাত্রের প্রতি গাঢ় আকর্ষণ হয়, আর গাঢ় আকর্ষণ হইলে তাঁহাদের প্রণামরূপ অভ্যর্থনায় তৃপ্তি হয় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের এখন হীন দশা বলিয়া, প্রণামের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কপট দৈন্যের ঘটা কিছু অধিক হইয়াছে।

প্রভু যেন চিরসুহৃদ পাইলেন, পাইয়া রামরায়কে হৃদয়ে ধরিলেন ও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। রামানন্দও যেন চির আশ্রয়-স্থান পাইলেন, আর ইহাতে এত সুখের উদয় হইল যে, ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, তিনিও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন, সতী স্ত্রী ও মৃত পতি যেরূপ চিতায় শয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ উভয়ে পরস্পরের বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অচেতন অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিলেন।

রাজা রামানন্দ যখন সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে যে বহুতর লোক ছিল, তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলে প্রভুকে দেখিলেন, এবং তাঁহার ও তাহাদের রাজার কাণ্ড দেখিলেন; ইহা দেখিয়া তাহারা ভক্তিতে গদগদ হইয়া, যাহার যেরূপ রুচি তিনি সেইরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, এবং সকলে এক সঙ্গে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র লোক এক মুহূর্ত্তে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন।

প্রভু ও রামানন্দ এইরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া কিছুকাল পড়িয়া রহিলেন; কিন্তু তবু সঙ্গীগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের উভয়ের অঙ্গ পুলকে আপ্লুত হইয়াছে, আর প্রেমানন্দ ধারায় বদন ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার পরে উভয়ে উঠিলেন ও সুস্থ হইয়া বসিলেন। একটু চাওয়া চাহির পর, প্রভু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি যখন নীলাচল হইতে

দক্ষিণে আসি, তখন তথাকার বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমাকে বলেন যে, গোদাবরী তীরে ভাগবতোত্তম রামানন্দ রায়কে দর্শন করিও। সেই নিমিত্ত আমার এখানে আগমন। আমি বড় ভাগ্যবান, যেহেতু অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম।" ইহাতে—

রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য-জ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হইল মোর মনুষ্য-জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন॥
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাঁহা মুই রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয়॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ কর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন।
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোক—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥
"কৃষ্ণ" "হরি" নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥
আকৃত্যে প্রাকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥—চরিতামৃত।

প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আমাকে ওরূপ কথা কেন বলিতেছ? তুমি পরম ভক্ত, তোমার সঙ্গীগণের মুখে হরি কি কৃষ্ণ নাম, ইহার বিচিত্র কি? তোমার দর্শনে ইহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহার সাক্ষী দেখ। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তি কি পদার্থ তাহা আমি জানি না, কিন্তু তোমার স্পর্শে আমারও কিঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হইয়াছে। আমি এখন বুঝিলাম, সার্ব্বভৌম আমাকে কেন তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্ত তিনি তোমার আশ্রয়ে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

উভয় উভয়ের দর্শনে আনন্দে ভাসিয়া, উভয়ে উভয়ের স্তুতি করিতেছেন, এই সময় এক জন ব্রাহ্মণ করযোড়ে প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, প্রভুও স্বীকার করিলেন। তাহার পরে রামানন্দ রায়ের প্রতি মধুর হাসিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তোমার আবার দর্শন কামনা করি, যেহেতু তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে।" "তোমার আবার দর্শন কামনা করি" —এরূপ কথা, যাহা প্রভু বিষয়ে-জড়ীভূত সেই শূদ্রকে বলিলেন, ইহা তিনি কস্মিন্‌কালে কাহাকেও বলেন নাই। রামানন্দ বলিলেন, "স্বামিন্, যদি কৃপা করিয়া এই পামরকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তবে দিন কয়েক এখানে থাকিতে হইবে, কারণ আমার মন অতি

কঠিন ও মলিন। আপনি দিন কয়েক থাকিয়া একটু বিশেষ করিয়া আমার হৃদয় মার্জ্জিত না করিলে উহা শোধিত হইবে না।” রামানন্দ রায় ইহা বলিয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। দর্শন মাত্রে পরস্পর পরস্পরের প্রেমডোরে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছেন যে, এই ক্ষণিক বিদায়ের নিমিত্ত উভয়েই বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

তৎপরে প্রভু ব্রাহ্মণের গৃহে ও রামানন্দ নিজ ভবনে গমন করিলেন। পরস্পরের দর্শন লালসা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এবং সূর্য্য অস্ত গেলে রামানন্দ, সামান্য বেশ ধারণ করিয়া এবং একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, গোপনে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন; এবং রামরায় প্রভুকে প্রণাম ও প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে উভয়ে বসিলেন।

প্রভু বলিতেছেন, “বল রামরায়, জীবগণ কিরূপ সাধন ভজন করিলে উদ্ধার হইবে?”

এখন রামরায় প্রভুকে জানেন না; প্রভু কে, তাঁহার কি মত, তাহাও জানেন না। প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে স্তুতিবাক্য। সন্ন্যাসী মাত্রই “নারায়ণ” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। রায় কেবল এই মাত্র জানিয়াছেন যে, প্রভু একটী ধীশক্তিসম্পন্ন অতি বৃহৎ বস্তু ও কৃষ্ণভক্ত; এবং তাঁহার চিত্ত একেবারে হরণ করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। প্রভুর এই হঠাৎ প্রশ্নের কিরূপ উত্তর করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। আবার প্রভুর আজ্ঞা রাখিয়া যে, কথা কাটাকাটী করিবেন ও বলিবেন যে, “আগে আপনি বলুন,” ইহাও পারিলেন না, বলিতে সাধ্যও হইল না। কাজেই, আপনার মত গোপন করিয়া, সর্ব্বসাধারণোপযোগী যে মত, প্রথমে তাহাই বলিলেন; বলিলেন, “স্বামিন্! আমি সাধন ভজনের কথা কিছু

জানি না। তবে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাই এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আছে,—অর্থাৎ যাহার যে স্বধর্ম্ম, তিনি তাহা পালন করিলে, পরিণামে তাহার শ্রীভগবানে ভক্তি হয়।"

এই বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মের-ন্যায় উদার ধর্ম্ম জগতে আর নাই! খ্রীষ্টীয়ানগণ বলেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলে নরকে যাইবে। মুসলমানেরাও তাহাই বলেন। কিন্তু হিন্দুরা বলেন যে, সকলেই শুধু স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা ক্রমে উদ্ধার হইবেন। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে ক্রমে শ্রীভগবদ্ভক্তির উদয় হয়; সেই ভক্তি হইলে জীব উদ্ধার হইয়া যায়। তবে কি ধর্ম্মের ভাল মন্দ নাই? অবশ্য আছে। জীবের পরিবর্দ্ধনই গতি। জীব ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। যে ধর্ম্মে তোমার এখন ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে, তুমি একটু পরিবর্দ্ধিত হইলে তোমার উহা অপেক্ষা সারবান আহার প্রয়োজন হইবে। রামরায়ে ও প্রভুতে যে অদ্ভুত কথোপকথন হয়, ইহা দ্বারা জীব কিরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়াছে, তাহাই বিকসিত হইতেছে। এরূপ কথোপকথন জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

এই যে রামরায় উত্তর করিলেন, ইহার মধ্যে কয়েকটী কথা মানিয়া লইলেন, যথা শ্রীভগবান আছেন ও ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তবে তিনি যে উত্তর করিলেন, ইহাতে তাঁহার প্রকৃত মত কি, তাহা কিছুই বুঝা গেল না।

প্রভু এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রামরায়, এত তুমি মোটা কথা বলিলে। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যদি কিছু থাকে তবে বল।"

রামরায় তখন গীতার একটী শ্লোক পড়িয়া বলিলেন যে, গীতায় দেখিতে পাই শ্রীভগবান বলিতেছেন, "জীব যে কোন কর্ম্ম করে, উহা আমাকে সমর্পণ করিয়া করিলেই তাহার সাধন সিদ্ধ হয়।"

কিন্তু প্রভু ও কথা উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, রামরায় এ সমুদায় বাহ্য কথা। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ় যাহা জান তাহাই বল।"

হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাস হইতে পারে যে রামরায় গীতার যে কথা বলিলেন, উহা অতি বড় কথা। এমন কি, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে এ কথাটী সকল অপেক্ষা বড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু তাহাদের প্রধান প্রার্থনার মধ্যে—"প্রভু, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক"—এই নিবেদন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কিন্তু প্রভু এ কথা মানিলেন না, যেহেতু ইহাতে জীবে ও ভগবানে যে কোন ঘনিষ্টতা আছে, তাহা বুঝা যায় না।

রামরায় তাহা বুঝিয়া বলিলেন, "এ কথা যদি বাহ্য হইল, তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই প্রকৃত সাধক।" রামরায় এ কথারও প্রমাণ দিলেন। কিন্তু প্রভু এ কথাও উড়াইয়া দিলেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির শ্রীভগবানে এত অনুরাগ যে, তাঁহাকে পাইবেন এই লোভে, আপনার কুলধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্য শ্রীভগবানের প্রিয়। কিন্তু রামরায়ের কথায় ঠিক তাহা বুঝাইল না। মনে ভাবুন, সাহেবের বিবি বিবাহ করিবে বলিয়া যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান হয়, তবে কি সে বড় সাধক হইল ?

রামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয় যোগে যিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধক।

প্রভু এ কথাও মানিলেন না। বলিতে কি, ভক্তি ও জ্ঞান এক প্রকার বিরোধী। মনে ভাবুন যদি কোন জ্ঞানবতী স্ত্রী স্বামীকে ইহা বলিয়া ভক্তি করেন যে, স্বামী স্ত্রীলোকের পরম গুরু, অতএব

স্বামীকে ভক্তি না করিলে মহাপাপ হয়, কি তাঁহাকে ভক্তি না করিলে সংসার বিশৃঙ্খল হয় কি দুঃখের উৎপত্তি হয়, তবে তাহার যে ভক্তি সে ভক্তি নয়, উহা এক প্রকার স্বার্থপরতা। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি বলিতে মোটামুটি ইহা বুঝায় যে, শ্রীভগবান জীবন মরণের কর্ত্তা, অতএব তাঁহাকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য। না করিলে ক্ষতি, করিলে লাভ। এরূপ হিসাব কিতাব করিয়া যিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন, তিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন না, তিনি আপনার স্বার্থের পোষণ করেন।

রামরায় আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়।" ইহা বলিয়া শ্রীভাগবত হইতে শ্লোক পড়িলেন।

যখন রামরায় এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তির কথা বলিলেন, তখন প্রভু একটু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "এ ভাল কথা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা যদি আরো কিছু ভাল কথা থাকে তবে বল।"

জ্ঞানশূন্য ভক্তি কাহাকে বলি, না উদ্দেশ্যশূন্য ভক্তি। সম্রাটকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম, আর বলিলাম, "রাজন্! আমি তোমার দাসানুদাস।" কিন্তু মনে রহিল যে, রাজা আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, হইয়া আমার ভাল করিবেন। ইহাকে রাজভক্তি বলে না, ইহাকে বলে তোষামোদ। অতএব জ্ঞানশূন্য যে ভক্তি, ইহা দ্বারাই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম পাওয়া যায়, প্রভু ইহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রভু আরো গুহ্য কথা শুনিতে চাহিলেন, তখন রামরায় প্রেমের কথা উঠাইলেন।

এতক্ষণ রামরায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, এখন উহা ছাড়িয়া শ্রীমদ্ভাবগতের অধিকারে আসিলেন। ভক্তি ও ধর্ম্ম দুই রাজ্যে বিভক্ত,—

শ্রীগীতার রাজ্য ও শ্রীভাগবতের রাজ্য। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি গীতার শেষ সীমা। জ্ঞান-শূন্য ভক্তি শ্রীভাগবত রাজ্যের আরম্ভ। যে পর্য্যন্ত রামরায় গীতার রাজ্যে ছিলেন, সে পর্য্যন্ত প্রভু "ইহা বাহ্য" বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। যে মাত্র রামরায় জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা বলিলেন, অর্থাৎ শ্রীভাগবত-রাজ্যের সীমায় আইলেন, সেই প্রভু বলিলেন, "ইহা ভাল বটে, কিন্তু ইহার পরে আরও বল।"

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য শ্রীভগবানের এই দুই ভাব। তিনি সর্ব্ব-শক্তি-মান, এই গেল তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব। তিনি তাঁহার রূপ ও গুণে আকর্ষণ করেন, এই গেল তাঁহার মাধুর্য্য ভাব। গীতায় শ্রীভগবানকে ঐশ্বর্য্যভাবে ভজনার কথা লেখা, আর, শ্রীভাগবতে মাধুর্য্যভাবের ভজনা বিরচিত। গীতার রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম। এই কয়েক ধর্ম্মের সার কথা গীতায় উদ্ধৃত আছে। এই সমস্ত ধর্ম্মে যে যে কথা ছড়ান আছে, উহা গীতায় একত্রিত করা হইয়াছে ও পর পর সাজান হইয়াছে। মিঠাইকার তাহার দোকানে যেরূপ নানা রসের খাদ্যদ্রব্য নানা সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখে, গীতায় সেইরূপ জগতের যত ধর্ম্ম ও সে সমুদায়ে যত রস আছে, তাহা সুন্দর আকার দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। তাই গীতা জগতে আদরিত হইতেছে ও হইবে।

শ্রীভাগবত জ্ঞান-শূন্য ভক্তি হইতে আরম্ভ। শ্রীভগবান যে নিজ-জন, জ্ঞান থাকিলে, ইহা হৃদয়ে সম্যক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু বোধ অর্থাৎ আস্বাদ করা যায় না। শ্রীভাগবত গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান নিজ-জন, আর নিজ-জন রূপে তাঁহাকে যে ভজনা তাহা দ্বারাই "তাঁহাকে" পাওয়া যায়। নিজ-জন কাহাকে বলে? পিতা কি প্রভু, সখা কি ভাই, সন্তান কি পতি, ইহারাই নিজজন।

প্রভু কে না, যিনি ক্রীত-দাসের কর্ত্তা। ক্রীত-দাসের মরণ বাচনের কর্ত্তা ও প্রভু। ক্রীতদাসের নিজ-জন প্রভু ব্যতীত আর কেহ নাই, যেমন পুত্রের নিজ-জন পিতা বই আর নাই। আর নিজ-জন কে, না, বন্ধু বা ভাই ভগ্নী। আর কে, না, পতি বা পত্নী। এই সমুদায় নিজ-জন লইয়া সংসার।

সে কালে এ দেশে দাস রাখিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও কোন কোন দেশে আছে। এই দাস শব্দ হইতে দাস্য-ভক্তি কথাটী লওয়া হইয়াছে। তুমি একজন সংসারী। এখন দেখ, তোমার সংসার পাতাইতে কি কি লাগে। তুমি, তোমার সন্তান, তোমার জনক-জননী, তোমার অতি আত্মীয় ও তোমার ঘরণী।

এই যে কয়েকটী বস্তু লইয়া সংসার, ইহাদের পরস্পরে যে আকর্ষণ তাহাকে "প্রেম", কি রস, কি ভাব বলে। সন্তানের পিতার প্রতি যে ভাব, তাহাকে দাস্য-প্রেম বলে। যদি বল ক্রীত-দাসের আবার প্রভুর উপর প্রেম কি? কিন্তু ক্রীত-দাসের জগতে আর কেহ নাই; প্রভুর সহিত থাকিয়া থাকিয়া, প্রভুর নিজের ও তাহার গণের প্রতি সে আকর্ষিত হয়। এমন কি, শুনা যায় যে, ক্রীত-দাস প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্তও দিয়াছে। পুত্রের পিতার উপর যে প্রেম, ইহাকে শাস্ত্রকারেরা দাস্য-প্রেম বলেন। ফল কথা, শ্রীভগবানকে পিতা বলিয়া বোধ, ও প্রভু বলিয়া বোধ, এই দুই ভাবে বড় বিভিন্নতা নাই। দাসের প্রভুর প্রতি খানিক স্নেহ, খানিক ভক্তি, ও খানিক ভয় আছে। সন্তানেরও পিতার প্রতি তাহাই আছে।

তাহার পর, জীব মাত্রের অন্ততঃ একজন অতি আত্মীয় আছেন। তিনি যদিও সকল অবস্থায় এক সংসারে থাকেন না, কিন্তু সংসার পূর্ণমাত্রায় পাতাইতে একটী সখার প্রয়োজন। এইরূপ

আত্মীয়ের উপর এক প্রকার স্নেহ আছে, তাহাকে বলে সখ্যভাব। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে অবিশ্বাস নাই, তিনি সুখ দুঃখের সাথী, তাঁহাকে মনের বেদনা বলিতে কোন বাধা নাই। তিনি আর তুমি এক শ্রেণীর লোক। তুমিও বড় না, তিনিও বড় না। তিনি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা তোমার ন্যায় অতি পরিমিত। এইরূপ যে ভাব, সে গেল সখ্য-প্রেম। বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ব্যাখার প্রয়োজন নাই।

আমরা এইরূপে সংসার পাতাইয়া বাস করি। আমরা এই সংসার পাতাইয়া বাস করিব বলিয়া শ্রীভগবান তাহার উপযোগী সমুদায় দিয়াছেন। স্ত্রী দিয়াছেন, পুত্র দিয়াছেন, অতএব এই সংসার পাতানই আমাদের স্বাভাবিক গতি। এই সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমরা শ্রীভগবানরূপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতে আকর্ষণের প্রয়োজন। এই আকর্ষণ যদি না থাকে, চির দিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। যদি আকর্ষণের সহায়তা লইতে পার, তবে সেই কেন্দ্র অভিমুখে গমন করিতে পারিবে। এই আকর্ষণ হইতেছে কি না,—প্রেম। এই প্রেমে পরিবার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এই প্রেমে সর্ব্ব-পরিবার শ্রীভগবানে আবদ্ধ।

এই প্রেম চারি প্রকার যাহা উপরে বলিলাম, অর্থাৎ দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। আর বলিলাম যে, সংসার পাতাইয়া বাস করা জীবের স্বভাব। অতএব এই সংসার যে প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়াছে, শ্রীভগবানকে এই সংসারভুক্ত করিতে হইলে সেই প্রণালী ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। আর যে গতি নাই,

তাহার আর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না; ইহা স্বীকার করিলেই হইবে যে, সংসার পাতাইয়া বাস করা আমাদের স্বভাব।

অতএব এই সংসারের যে চারিটী বস্তু—পুত্র, সখা, পতি ও পিতা, ইহার মধ্যে শ্রীভগবানকে একজন কর। হয় তাঁহাকে পিতারূপে ভজনা কর, না হয় সখারূপে, না হয় পুত্ররূপে, না হয় পতিরূপে। তাহা না করিলে তাঁহাকে সংসারে স্থান দিতে পারিবে না, তিনি বাহিরের লোক হইবেন।

এই গেল শ্রীমদ্ভাগবতের সার-সংগ্রহ। এখন মনে ভাব, তুমি যেন শ্রীভগবানকে পিতারূপে ভজনা করিবে। তাহা হইলে সে ভজনার প্রণালী কিরূপ, তাহা তোমার শিখিতে আর কোথাও যাইতে হইবে না। ঠিক যেরূপ সরল সুবোধ শিশু পুত্র সর্ব্বগুণনিধি পিতাকে ভজনা করে, সেইরূপ করিলেই হইবে। শিশু পুত্র বলি কেন, না, তাঁহার নিকট সকলেই শিশু। এখন বিচার কর, এরূপ পুত্র পিতাকে কিরূপে ভজনা করে।

এই প্রভুকে, সখা, কি সন্তান, কি পতি ভাবে, দুইরূপে ভজনা করা যাইতে পারে,—সাক্ষাৎ ভাবে ও গোপীর অনুগত হইয়া। সাক্ষাৎ ভাবে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, তাহাই এখন বলিতেছি। প্রথমে ধ্যানে তোমার পিতাকে ভজনা করিতে থাক। যদি বল তিনি জীবিত আছেন। তবে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা কর। যদি তোমার কোন গুরু থাকেন, তবে তাঁহাকেও ঐরূপ করিলে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে প্রভুকে কিরূপে ভজনা করিতে হয়, জানিতে পারিবে। তখন সেই পিতার স্থানে শ্রীভগবানকে বসাইবে। এই যে তোমার মধুর প্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাভাবিক; এত স্বাভাবিক যে, সে ভাবের বস্তু না পাইলে তুমি অস্থির হইবে।

যাহার পুত্র নাই, সে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে। যাহার স্ত্রী নাই, সে আপনাকে অপূর্ণ ও তাহার সংসার শূন্য ভাবিবে। অতএব এই চারিভাব স্বাভাবিক, আর এই ভাবের বস্তুর নিমিত্ত লালসাও স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ক্ষা জীবের দ্বারা কতক পরিপূরিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হয় না। যেহেতু এই ভাবের বস্তুগুলি অপূর্ণ ও মলিন। পতিপ্রাণা সতী আপনার পতির নিমিত্ত প্রাণ দিবেন। কিন্তু তবু দেখিবে যে, তাঁহার পতি নির্ম্মল কি পূর্ণ নহেন। অতএব তাঁহার মধুরভাবের সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্তি সাধন হইতেছে না। এই ভাবের পিপাসা তখনই শান্তি হইবে, যখন ইহার বস্তু নির্ম্মল ও পূর্ণ হইবে। এমন বস্তু শ্রীভগবান্ বই আর নাই। অতএব এই ভাব গুলির দ্বারা যখন শ্রীভগবানকে ভজনা করা হয়, তখনি জীবের প্রকৃত প্রয়োজন সাধন হয়,—তখনি জীব প্রেমানন্দ তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিতে থাকে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতেছি, অর্থাৎ শ্রীপ্রভুতে ও রাম রায়ে যে বিচার তাহা এখন বর্ণনা করিব।

প্রভু স্বীকার করিলেন যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের ভজনা হয়। ইহা স্বীকার করিয়া তিনি বলিতেছেন, "রামরায়! আরো গূঢ় কথা বল।"

রামরায় বলিলেন, "সর্ব্বোত্তম সাধনা শ্রীভগবানকে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা ভজন করা।"

প্রভু এ কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, বলিতেছেন, "এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু, রাম রায়, যদি আরো কিছু নিগূঢ় থাকে, কৃপা করিয়া আমাকে বল।" রামরায় দেখিলেন যে, ক্রমে ক্রমে প্রেমের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রেমের রাজ্য তাঁহার নিজ দেশ। তখন তিনি ভক্তির কথা একেবারে ছাড়িয়া

দিলেন, দিয়া বলিতেছেন, "দাস্য-প্রেমের দ্বারা শ্রীভগবানকে সেবা করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভজন।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সাধু রামরায়! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও কি কিছু উত্তম আছে?"

রামরায় বলিলেন, "আছে, সে সখ্য-প্রেম। শ্রীভগবানকে প্রভু বলিয়া ভজন করায় যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষা সুহৃদ্ বলিয়া ভজন করায় অধিক আনন্দ।"

প্রভু বলিলেন, "আমি কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আরও যদি কিছু নিগূঢ় থাকে, তাহাও আমাকে বল, আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

রামরায় তখন এক প্রকার গ্রহগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি তখন যেন আর স্ববশে নাই। তিনি যেন তখন প্রভুর জিহ্বা-যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছেন। প্রভু যেন সাধন-তত্ত্ব তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রামরায় প্রভুর কথার উত্তরে বলিতেছেন যে, সখ্য-প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য-প্রেম আরো গাঢ়। অতএব শ্রীভগবানকে আপনার পুত্র ভাবিয়া যদি ভজন করা হয়, তবে উহা সাধনার এক প্রকার শেষ সীমা হয়।

প্রভু বলিলেন, "রামরায়, তুমি আমাকে একেবারে বিনামূল্যে ক্রয় করিলে, তবু আরও যদি গুহ্য থাকে তবে বল।"

রামরায় বলিলেন, "আছে। শ্রীভগবানকে কান্তভাবে ভজনা করা।" এখানে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এই কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে—দাস্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

প্রভু কহে—এহো হয়, কিছু আগে আর।
রায় কহে—সখ্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে—বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥
প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে—কান্ত-ভাব প্রেমসাধ্যসার॥

রামরায় এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রাজ্যের শেষ সীমায় আসিলেন। আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। এই উদ্দেশ্যে কান্তভাব কি, তাহাই বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "স্বামিন্! সাধনার উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে প্রাপ্তি। কিন্তু প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে—আংশিক ও পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু যাহারা সাধক তাঁহারা ইহাদের প্রভেদ বড় বুঝিতে পারেন না। যদি সমুদায় ব্যঞ্জন উত্তম হয়, তবে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেটী অগ্রে বদনে দেন সেইটী সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভাবিয়া থাকেন। শ্রীভগবানে এত মধু আছে যে, জীব যে অংশ পায় তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এমন কি, শ্রীভগবানকে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন, তাঁহার কাছে সেই ভাবই সর্ব্বোত্তম বলিয়া বোধ হয়। রামরায়ের কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন।

যাঁহারা দাস্যভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহারা বলেন, দাস্যভাব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শুধু তাঁহারাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে এমন ভক্ত আছেন যাঁহারা বলেন যে, দাস্যভাবই সর্ব্বোত্তম, এবং ইহা ভিন্ন কান্ত প্রভৃতি অন্য ভাবে ভজনা করা জীবের অধিকার নাই, অতএব ঐরূপ ভজনা করিতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

যখন গৌরাঙ্গ প্রকাশ হইয়াছেন, তখন পশ্চিম দেশে বল্লভাচার্য্যও

ঐরূপ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার মত এই যে, বাৎসল্য প্রেমই সর্ব্বোত্তম। এই মত তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম দেশে প্রচার করিতে করিতে নীলাচলে প্রভু গৌরাঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করেন। শ্রীধর স্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, উপরে রামরায় যাহা বলিলেন, অর্থাৎ কান্ত ভাবই সর্ব্বোত্তম, ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু বল্লভভট্ট, শ্রীধর স্বামীর টীকা উড়াইয়া দিয়া, আপনি শ্রীভাগবতের টীকা করিলেন; করিয়া বাৎসল্য প্রেমই যে সর্ব্বোত্তম তাহাই প্রমাণ করিলেন। এই তত্ত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি বৃহৎ গ্রন্থও লিখিলেন। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, এবং পশ্চিম-দক্ষিণ দেশে বহুতর লোক তাঁহার আশ্রয় লইল। এই বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত দেশে বড় প্রবল। এই শাখার উপাচার্য্যগণকে "গোকুলে গোঁসাই' বলে। ইহাদের শিষ্যগণ প্রায়ই বণিক, সুতরাং আচার্য্যগণের অনেকের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের গণ "করঙ্ককান্থাধারী"। কিন্তু গোকুলে গোস্বামীর মধ্যে অধিকাংশ লোক রাজরাজেশ্বর রূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ী আচার্য্যগণের মধ্যে, সেই দেখা দেখি, ঐশ্বর্য্য লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজরাজেশ্বরের ন্যায় বাস প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পার্ষদগণ কাঙ্গাল হইতেও কাঙ্গালরূপে অবস্থিতি করিয়া জীব উদ্ধার করিতেন। তাঁহাদের দীন-বেশ দেখিলে জীবের হৃদয় দ্রব হইত। এখনকার আচার্য্যদের মধ্যে কাহারও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জীবের হৃদয় দ্রব হয় না, বরং শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার উদয় হয়।

শ্রীবল্লভাচার্য্য নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, শেষে আপনি তাঁহার শরণাগত হইলেন। এমন কি, শেষে শ্রীগদাধর

গোস্বামীর নিকট যুগল মন্ত্র লইয়া কান্তভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা দেশে রহিলেন, তাঁহারা বল্লভাচার্য্যের পূর্ব্বকার মত পালন করিতে লাগিলেন ও এখনও করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে "বল্লভাচারী" বলে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল অর্থাৎ সন্তান ভাবে উপাসনা করেন।

রামরায় প্রভুকে বলিতেছেন, "যাহার যে ভাব তাহার কাছে সেই উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সব যে সমান তাহা নয়,—ভাল মন্দ অবশ্য আছে। দাস্যভাব অতি উত্তম তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দাস্য অপেক্ষা সখ্য আরও ভাল, যেহেতু সখ্যভাবে দাস্য ও সখ্য উভয়ই আছে। এইরূপ মধুর ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত,—এই চারি ভাবই জড়িত আছে। অতএব যিনি মধুর ভাবে ভজনা করেন, তিনি কর্ত্তব্যে—চারি ভাবেই ভজনা করেন, সুতরাং তিনিই সর্ব্বোত্তম অধিকারী।"

রামরায় বলিলেন যে, "মধুর ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত এই চারি ভাব আছে," ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। কান্ত মানে স্ত্রীলোকের স্বামী। স্ত্রী স্বামীর কখন দাসী হয়েন, কখন সখী হয়েন, কখন মাতার ন্যায় হয়েন, কখন বা বক্ষবিলাসিনী হয়েন। রামরায় বলিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কান্তভাবেই হয়। এইরূপে রামরায়, শ্রীভাগবতের রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইয়া বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন।

প্রভু ইহা শুনিয়া বলিতেছেন, "রামরায়, তুমি বলিলে যে, 'সাধনার এই শেষ সীমা' ইহা ঠিক। কিন্তু যদি আরও কিছু থাকে ত বল।"

এই কথা শুনিয়া রামরায় অবাক হইলেন!

রায় কহে—ইহা অগ্রে পুছে কোন জনে।
এত দিন নাহি জানি আছে এ ভুবনে॥—চৈতন্য চরিতামৃত।

রাম রায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে আবার কি? ইহা ভাবিবার কারণও রামরায়ের আছে। পাঠক মহাশয় যদি এ পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়া পড়িয়া থাকেন, তবে তিনিও ভাবিতে পারেন যে, ইহার পরে আবার কি হইতে পারে? রামরায় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে স্ফুর্ত্তি হইল; বলিতেছেন, ইহার অগ্রে, 'রাধার প্রেম!"

প্রভু বলিলেন, "রাধার প্রেম যদি কান্তভাব অপেক্ষাও গাঢ় হইল, তবে তাহার কারণ আছে; অতএব তাহা বল, আমি শ্রবণ করি। তোমার মুখে কৃষ্ণকথা যেন অমৃতের ধার। আমার অঙ্গ শীতল হইতেছে। বল বল রামরায়, রাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন?

রামরায় বলিতেছেন, "ত্রিজগতে রাধার প্রেমের তুলনা নাই। শত কোটী গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস করিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীভগবানের তৃপ্তি হইল না,—রাধা ব্যতীত তাঁহার প্রেম-পিপাসা শান্তি হইল না।

তখন প্রভু বলিতেছেন, ইহাই সাধনের সীমা তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আরও কিছু নিগূঢ় কি আছে? যদি থাকে তবে বলিয়া আমার কর্ণ শীতল কর।

প্রভু কহে—ইহা হয় আগে কহ আর।
রায় কহে—ইহা বহি বুদ্ধি-গতি নাহি আর॥

রামরায় যে এরূপ বলিলেন, ইহাতে তাঁহার কি দোষ? সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম সৃষ্টির নানা দ্রব্য আছে। কিন্তু জীবের দৃষ্টি সীমা-বিশিষ্ট, সেই সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

রামরায় ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া শেষে বলিতেছেন, "স্বামিন্! আর শক্তি নাই। যাহা দিয়াছিলেন সব নিঃশেষ হইয়াছে। যদি আর কিছু শক্তি দাও তাহা হইলে তোমার কথার উত্তর দিতে পারিব। তবে আমার নিজকৃত একটী গীত আছে। সেটী গাইতেছি শ্রবণ করুন। উহা ভাল কি মন্দ, আর উহাতে আপনাকে সুখ দিবে কি না জানি না।"

ইহা বলিয়া রামরায় এই গীতটী গাইতে লাগিলেন—

পহিলহি রাঁগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জনি॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোঁজলুঁ দোতী না খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেল দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্যের পরে আর একটী "পাত্রের" সহিত প্রভু এই মিলিত হইলেন। রামানন্দ রায় অনুরাগা ভক্ত, কাব্য ও সঙ্গীত তাঁহার ভজনের উপকরণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রসিক-শিরোমণি। রামানন্দ রায় গাইতে আরম্ভ করিলে, প্রভু প্রেমে চঞ্চল হইতে লাগিলেন। ক্রমে এরূপ অধীর হইলেন যে, আর শ্রবণ করিতে

না পারিয়া নিজ হস্ত দ্বারা, "চুপ্" "চুপ্" এই ভাব ব্যক্ত করিতে, রামানন্দের মুখ আবরণ করিলেন। মনের ভাব এই, "চুপ্, এ অতি পবিত্র বস্তু! বহিরঙ্গ লোকে শুনিবে,—চুপ্!"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি গীতার শেষ সীমা। গীতার আরম্ভ মায়াবাদ হইতে। শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তির অপর পারে, জ্ঞান-শূন্য ভক্তি হইতে। সেখান হইতে আরম্ভ হইয়া প্রেমের কাণ্ড রাধা-ভাবে সমাপ্ত। এখন রামরায় যাহা বলিলেন, ইহা কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণই সম্ভোগ করিতে পারেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত হইতে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর বাক্য—

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিত শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥ ১৮॥

যে মধুর ভক্তি-পথে ব্যাস প্রভৃতি মনীন্দ্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্ব্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহা শুকদেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের নিকটে প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌরভক্তগণ সুখে ক্রীড়া করিতেছেন॥ ১৮॥

রাম রায়ের উপরি উক্ত গীতে প্রেমের চরমসীমা বিরচিত হইতেছে, অতএব প্রেমের রাজ্যটী একবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জড়জগতে পরস্পরের মিলন করিবার শক্তিকে বলে আকর্ষণ, আর জীব-মণ্ডলীতে এই শক্তিকে বলে প্রেম। সূর্য্য মধ্যস্থলে থাকে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে গ্রহগণ উপগ্রহ সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এ সমুদায় আকর্ষণ-

শক্তি দ্বারা হয়। আকর্ষণে উপগ্রহ ও সংযোগ সিদ্ধ হয়, আর আকর্ষণে ইহারা সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইরূপ জীবগণ এই প্রীতি-বন্ধন দ্বারা সংসারবদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়। জড়-জগত ও জীব-জগত নানা নিয়মের অধীন, কিন্তু ইহাদের যত প্রভু আছে, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রভু আকর্ষণ কি প্রেম। ইহা অতিক্রম করিতে তাহারা পারে না; ইহারা এই শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। এই প্রেমের শক্তি এখন বিবেচনা কর। স্বামী দেহ ত্যাগ করিলে তাহার স্ত্রী ঐ দেহের সহিত স্ব ইচ্ছায়, এমন কি জিদ করিয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছে। কোন ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে? মনুষ্যের উপর, কেবল প্রীতিরই এরূপ আধিপত্য আছে। রেলের গাড়ি হইতে সন্তান পড়িয়া গেলে, তাহার পিতা তদ্দণ্ডে সেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি হইতে লম্ফ দিতে পারে। প্রেমের শক্তির আরও উদাহরণ দিতেছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর যে, তুমি জগতের এক প্রান্তে বাস করিবে। তুমি যদি এরূপ ইচ্ছা কর, তবে তুমি একটীও সঙ্গী পাইবে না। যদিও কেহ যায় তবে বিশেষ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যাইবে। কিন্তু যদি তুমি যাইবার সময় তোমার স্ত্রীকে ফেলিয়া যাও, তবে তিনি রোদন করিবেন, সমুদায় ভুবন অন্ধকার দেখিবেন ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে সাধ্যসাধনা করিবেন। যে শক্তিতে স্ত্রী ও স্বামীকে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে, তাহার তেজ এখন অনুভব করুন!

শাস্ত্রে বলে, কোন বংশে একজন সাধু হইলে তাহার বহু পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যদি স্বামী সাধু হন, তবে সেই সঙ্গে তাহার স্ত্রীও উদ্ধার হইতে পারেন। বেলুন যন্ত্র পৃথিবীর

আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠে, আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে সেই বেলুন অন্য দ্রব্য লইয়াও উঠিতে পারে। দুই জীব প্রীতিতে আবদ্ধ, এক জন পবিত্র, আর এক জন অপবিত্র। যে পবিত্র সে তাহার অপবিত্র সঙ্গীকে উর্দ্ধদিকে ও যে অপবিত্র সে তাহার পবিত্র সঙ্গীকে অধোদিকে আকর্ষণ করে। এই টানাটানিতে, কখন পবিত্র কখন অপবিত্র জীবের জয় হয়। বিলমঙ্গল ঠাকুর চিন্তামণি বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন, তাহাতে চিন্তামণি উদ্ধার হইয়া গেল। আবার মুনি ঋষি মহাতপ করিয়াও কুসঙ্গের শক্তিতে অধঃপাতে গিয়াছেন।

যেমন ধূমকেতু সূর্য্যের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্তগণ শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হন। যেরূপ ধূমকেতু তাহার পুচ্ছ লইয়া সূর্য্যের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ তাঁহাদের নিজ-জন লইয়া শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হন। সর্ব্বজীবে সমান দয়া, কি সমান স্নেহ জীবে সম্ভবে না; ইহা কেবল স্বয়ং ভগবানই পারেন। সেই নিমিত্ত প্রেম পরিবর্দ্ধনের জন্য শ্রীভগবান মনুষ্যকে সংসারবদ্ধ হইয়া থাকিবার বলবৎ বাসনা দিয়াছেন; তাই, জীব সংসার পাতাইয়া বাস করে। এই সংসার তাহার উদ্ধার কি পতনের কারণ হয়। যদি সে ব্যক্তি স্বয়ং, কি যে তাহার প্রিয় সে, সাধু হয়, তবে সে ব্যক্তি উদ্ধার হইয়া যায়। আর যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে সে সংসারে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এই নিমিত্ত প্রেম প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত সংসারে বাস করা জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যখন কোন জীব দেখেন যে, সংসার তাঁহাকে অধোদিকে লইয়া যাইতেছে, তিনি উহা ছাড়াইয়া উর্দ্ধে যাইতে পারিতেছেন না, তবে তাঁহার

শেষকালে সংসার হইতে দূরে বাস করাই কর্ত্তব্য। আর এই নিমিত্ত, আমাদের দেশের ভাল লোক সকলেই প্রৌঢ় বয়সে, হয় বনে না হয় তীর্থস্থানে, জীবন যাপন করিতেন। ইহাতে তাঁহারা স্বয়ং উদ্ধার হইতেন ও তাঁহাদের নিজ-জনকে উদ্ধার করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সন্ন্যাসী হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ আকুমার ব্রহ্মচারী। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ অনেকে সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। তখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তাঁহার সংসারে প্রবেশ করিয়া জীবগণকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি স্বয়ং এইরূপ সংসারে প্রবেশ না করিলে ভক্তগণ উহা করিবেন না।

অতএব সংসার ত্যাগ করা ধর্ম্ম নয়, সংসারে বাসই ধর্ম্ম। তবে সংসারে বাস, যত দূর পার, নির্লিপ্ত হইয়া করিতে হইবে। কাহাকেও অতিরিক্ত ভালবাসিও না, আর যদি তাহা কর, তবে ভজন দ্বারা আপনাকে এরূপ শক্তিসম্পন্ন কর যে, তাহার প্রেমে তোমার অধোগতি না হয়।

জড়জগতের আকর্ষণ যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু প্রেম পরিবর্দ্ধনশীল। সংসারে বাস করিয়া পরিবর্দ্ধন হয়, আর ভজন দ্বারা ভগবৎ প্রেম পরিবর্দ্ধন করিতে হয়।

প্রেম দুই রূপ, অহেতুক ও হেতুক, বা পরকীয় ও স্বকীয়। যে প্রেমের হেতু আছে সে স্বকীয়, যাহার হেতু নাই সে পরকীয়।

এখন বিবেচনা করুন, ঠিক বলিতে স্বকীয় প্রেম প্রেমই নয়। "সোণার পাথরের বাটি" যেরূপ অসংলগ্ন, "স্বকীয় প্রেমও" সেইরূপ দুটী অসংলগ্ন বস্তু। স্ত্রী স্বামীতে যে প্রেম উহা স্বকীয়। এ প্রেমের হেতু কি? ইহার হেতু এই যে, স্ত্রীর প্রেমের বস্তু স্বামী, কেন না,

তিনি তাঁহার স্বামী। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে ভাল বাসেন তাহার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার স্বামী। অন্য লোক যদি তাঁহার স্বামী হইতেন, তিনি তাঁহাকেও ঐরূপ ভাল বাসিতেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে ভাল বাসেন উহা প্রেম নয়, উহার মূল স্বার্থপরতা। জননী যে পুত্রকে ভাল বাসেন, তাহাও প্রেম নয়, কারণ সে তাঁহার পুত্র বলিয়া তাহাকে ভাল বাসেন, আর কোন কারণে নয়।

অতএব বিশুদ্ধ প্রেম পরকীয় ব্যতীত আর কোনরূপে হইতে পারে না। আর বিশুদ্ধ প্রেম কি না, অকৈতব প্রেম। এই অকৈতব প্রেম কি না, যাহাতে স্বার্থগন্ধ নাই। কিন্তু স্বকীয় প্রেম মাত্রেই স্বার্থগন্ধ আছে। অতএব অকৈতব প্রেম পরকীয় প্রেম হইতে উৎপন্ন। এই পরকীয়, অর্থাৎ অহেতুক, অর্থাৎ নিস্বার্থ বিমল প্রেম হইতে অখণ্ড আনন্দঘন যে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাকে পাওয়া যায়। স্বকীয় প্রেম অর্থাৎ কান্ত-ভাবে, স্বার্থ গন্ধ আছে বলিয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না।

আকর্ষণ জড়জগতের প্রাণ। আকর্ষণ যেরূপ নানা প্রকার আছে, প্রীতিও সেইরূপ, দাস্য সখ্যাদি নানা প্রকার আছে। আকর্ষণে যেরূপ জড়-জগৎকে পৃথকীকৃত করে, প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয়োজিত করে, ও প্রত্যেককে পৃথক পৃকৃক প্রকৃতি-সম্পন্ন করে, প্রীতিও জীবগণ সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণের তত্ব বিচার করিয়া জীবগণ উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে, করিয়া জড়-জগত্‌কে করায়ত্বে আনে। জীবগণ সেইরূপ প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়া প্রীতির উৎকর্ষ সাধন করে, করিয়া উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। অনুসন্ধানের দ্বারা জীবগণ জানিয়াছে যে, গন্ধক ও পারদে পরস্পরে আকর্ষণ আছে, ইহা জানিয়া পারদ

ও গন্ধক একত্র করিয়া কজ্জলি প্রস্তুত করে। সেইরূপ জীবগণ প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রীতি উৎকর্ষ করিয়া, উহার দ্বারা শ্রীভগবানের উপর পর্য্যন্ত আধিপত্য স্থাপন করে। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "এ তিন ভুবনে সারই পিরীতি।" আর এই প্রীতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীরাম রায়ের এই পদটীতে সেই প্রীতি-তত্ত্বের শেষে সীমা প্রকাশ করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের রাসলীলা বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, মধুর মুরলী রব শুনিয়া গোপীগণ আসিলেন, পরে সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিলেন। প্রত্যেক গোপী এক এক কৃষ্ণ পাইয়া তাঁহার সহিত নৃত্য গীতাদি বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধার আভাস মাত্র আছে। শ্রীভাগবতে যে আভাস আছে, তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করিলে, দুই এক জন ছাড়া জীবে বুঝিতে পারিত না।

শ্রীগৌরাঙ্গ এই রাধাতত্ত্ব জীবের নিকট বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া উহা নানারূপে বুঝাইলেন। আপনি রাধাভাব ধারণ করিয়া রাধার প্রেম কি তাহা দেখাইলেন। আর শ্রীরামানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, পরকীয় রসের প্রকাশ স্বরূপ যে শ্রীমতী, তাহার তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন।

এখন রাম রায়ের গীতের অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! আমার শ্যামের সহিত কিরূপে প্রীতি হইল তাহা বলিতেছি। প্রথমে, তাহার সহিত নয়নে নয়ন মিলন হইল। আমি তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। অমনি তদ্দণ্ডে

প্রীতির সৃষ্টি হইল। কেবল যে সৃষ্টি হইল তাহা নয়, বাড়িতে বাড়িতে চলিল, আর তাহার শেষ পাইলাম না।"

এখন শ্রীমতীর কথা লইয়া একটু বিচার করিব। শ্রীকৃষ্ণ কে, তাহা শ্রীমতী জানেন না। তাঁহাতে কোন গুণ আছে কি না, তিনি স্নেহশীল কি নিষ্ঠুর, দেব কি দৈত্য, ইহাও জানেন না। তবে দেখা মাত্র প্রীতি হইল কেন? এরূপ কি কখন হয়? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ হয়। কোন সুন্দরী রমণী ও সুন্দর যুবকে এইরূপ দেখা দেখি মাত্র পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাহা হয় কেন? তাহার কারণ, একজন পুরুষ, আর একজন রমণী। কিন্তু রাধার মনে সে ভাবের গন্ধও ছিল না। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

না সো রমণ না হাম রমণী

অর্থাৎ, "সখি! এই যে প্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ তাহা বলিয়া নহে। তিনি যে পুরুষ আর আমি যে নারী, তাহা আমি তখন কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।"

অতএব দেখ, সামান্য সুন্দরীতে ও সুন্দরে যে প্রীতি, সে প্রীতি ও রাধার প্রীতির সহিত অনেক বিভিন্নতা। পুরুষ যে স্ত্রীলোকের ও স্ত্রী যে পুরুষের সুখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহা কিছুই জানেন না। তবে এই যে প্রীতি হইল, তাহার হেতু কি? ইহার কিছু হেতু পাওয়া যায় না, তাই উহাকে বলে অহেতুক প্রেম।

শ্রীমতী বলিতেছেন, "সখি! যখন লোকে প্রীতি করে, তখন তাহার মধ্যস্থ একজন দূতী থাকে। সে মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া পরস্পরের পরিচয় করিয়া দেয়, আর পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনের সহায়তা করে।" শ্রীমতীর কথার তাৎপর্য্য এই যে, দূতী এরূপ

বলে যে, অমুক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে মৃতবৎ আছেন। এইরূপ বলিয়া পরস্পরের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিয়া দেয়।

শ্রীমতী বলিতেছেন যে, আমরা পরস্পরের দর্শনাবধি অধীন হইলাম, আমাদের প্রীতি আপনাপনি বাড়িতে থাকিল, দূতীর প্রয়োজন হইল না। তবে আমাদের দৌত্য কে করিল? আমাদের দূত ত কেবল "পাঁচ বাণ।"

"পাঁচ বাণ" কি, না পরস্পরের লোভ। এ "পাচ বাণ" কাম নয়, যেহেতু শ্রীমতী জানেন না, যে তিনি স্ত্রী ও শ্যাম পুরুষ। এইরূপ প্রীতি মনুষ্যে সম্ভবে না, যেহেতু তাহারা অপূর্ণ অর্থাৎ পরিবর্দ্ধনশীল। এরূপ প্রীতি কেবল সম্ভব শ্রীমতী রাধার। তিনি কে? না,—শ্রীভগবান, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্মিলিত, আর রাধা তাঁহার প্রকৃতি অংশ। অতএব শ্রীভগবানকে দুই ভাগ, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি করিয়া, সাধক তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা রূপে, সম্মুখে রাখিলেন। রাখিয়া এই অকৈতব প্রীতির খেলা খেলাইতে লাগিলেন।

কান্তভাবে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বিহার করেন; কিন্তু পরকীয় ভাবে গোপীগণ পরোক্ষ বিহার করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রীতির যে খেলা, তাই যোজকতা করিবার একজন হয়েন। কৃষ্ণের সহিত তাঁহারা আপনারা বিহার করেন না; রাধাকৃষ্ণের বিহার করাইয়া আনন্দ ভোগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধায় যে প্রীতি, উহা জীবে সম্ভবে না। সে এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত সূক্ষ্ম, এত মধুর, যে জীবে উহা প্রত্যক্ষ ভোগ করিবার শক্তি ধরে না। অতএঘ শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা-রস আস্বাদ করিয়া জীবে ক্রমে প্রীতিরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ পাইয়া ব্রহ্মত্ব ও ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে।

হে তত্ত্বকথা! তুমি সূর্য্যের ন্যায় অতি বৃহৎ তেজস্কর বস্তু,

তোমাকে আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুদ্র, তোমার তেজ আমি সহিতে পারি না। তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রভুর লীলারূপ সুধা-সাগরে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি।* আমি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি, তত্ত্বকথা সমুদায় বুঝি না। যাহা একটু বুঝি, তাহাও সমুদায় এখানে দিতে পারিলাম না, যেহেতু সকল কথা ভাষায় কুলায় না। যাঁহারা এ বিষয়ে রসিক, তাঁহারা শ্রীগোস্বামীগণের গ্রন্থ পড়িবেন।

সে দিনকার কথা, দিগম্বর শিশু ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। বৃদ্ধ যে হইয়াছি, তাহা সকল সময় বুঝিতে পারি না। লোকে বলে তাই শুনি, কি দর্পণে মুখ দেখিয়া বুঝি, কি আপনার শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়াও কতক জানিতে পাই। শিশুকাল হইতে মনে যে সকল সাধের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সাধগুলি আছে, একটিও যায় নাই। এখনও ইচ্ছা করে বালকের ন্যায় খেলা করি, তবে অঙ্গে শক্তি নাই তাই পারি না; কি লোকে হাসিবে তাই করি না। লোকে যাহাই বলুন, আমি দেখিতেছি যে, আমি ক্রমেই যেন শিশু হইতেছি, ক্রমেই যেন আমার সাধ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়া যাইতেছে। শুনিতে পাই যে, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে অন্তরেন্দ্রিয়গণ জড়বৎ হয়। কৈ, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না।

তবে এখন বিলাস-রূপ যে সুখ, তাহা ভোগ করিবার শক্তি আমার নাই। আমি এক দিন প্রাচীরের গায়ে এই কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, যথা—

হে ঐশ্বর্য্য! হে ইন্দ্রিয়সুখ! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিলাম।

---

* এই অধ্যায়ের শেষ এই কয়েক পংক্তি আমি আমার নিজজনের নিমিত্ত লিখিলাম। বহিরঙ্গ লোক ইচ্ছা করেন, তবে এই কয়েক পাত না পড়িয়া উল্টাইয়া যাইবেন।

সুখ তোমাদের নিকট নাই। বিষয়-জগতে যাহা যাহা প্রয়োজন,—ধন, জন, সম্পত্তি,—সমুদায় আমি পাইয়াছি। দরিদ্র ছিলাম, এখন দারিদ্র্য নাই; নগণ্য ছিলাম, প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি। প্রণয়ের বস্তু পাইয়াছি, এবং যতদূর সাধ্য ভাল বাসিয়াছি, আবার সেইরূপ ভালবাসাও পাইয়াছি। তবু সাধ মিটে নাই। যথেষ্ট অর্থ করায়ত্ত করিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, প্রণয়িনীকে হৃদয়ে লইয়া, ভ্রাতার গলা ধরিয়া, আনন্দ ভোগ কি শান্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সাধ মিটে নাই; ক্রমেই লালসা বাড়িয়া যাইতেছে। এ সাধটা কি? এই যে দিবানিশি প্রাণ কান্দিতেছে, এ কেন, কাহার জন্য?

এখন বুঝিতেছি যে, যদি আমি জগতের, এমন কি ইন্দ্রলোকের কি ব্রহ্মলোকের কর্ত্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটিবে না, তৃপ্তি হইবে না, তবু প্রাণ হা হুতাশ করিবে। কোথা যাব? কার কাছে যাব? কি করিব? কিসে আমার প্রাণ জুড়াবে? আমার এই হা হুতাশ কিছুতেই গেল না, বরং ক্রমে বাড়িতেছে।

আবার, আমার যে এই তাপ, ইহা কেন তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি কত দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, প্রাণ তুমি কেন কান্দ? কিন্তু বুঝিতে পারি না আমার এইরূপ দশা কেন।

এই মাত্র বলিলাম প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। শুধু তাই নয়; প্রণয়িনীকে হৃদয়ে করিয়াছি, আর যেন আগুণ শতগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে;—কেন? কাহার জন্যে? প্রণয়িনী অপেক্ষাও অধিক প্রণয়িনী আর কে?

অতি বড় অনেকটা শোক পাইয়াছি। এক একটি শোকে হৃদয়ে এক একটী গহ্বর খনন করিয়া রাখিয়াছে। আমার দাদা ও মেজদাদা এবং অন্যান্য পরলোকগত নিজ-জনের জন্য প্রাণ কান্দে;

ইচ্ছা করে তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করি। এমনও বোধ হয় যে, তাঁহাদের যদি পাই তবে আমার এই দুঃখ যাইবে, আমি শীতল হইব। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, সে আমার ভ্রম। তাঁহাদের এখন পাইলে আহ্লাদে মূর্চ্ছিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে আনন্দ কত দিন থাকিবে? ক্রমে উহা ক্ষয় হইবে, আবার প্রাণ কান্দিয়া উঠিবে, আবার হা হুতাশ আরম্ভ হইবে।

মহাজনগণ রাসমণ্ডল এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

রাস হাট পরে ছত্র শশধর ধরে রে।
পবন চামর হয়ে মন্দ মন্দ বহে রে॥
চৌদিকে ফিরত দীপ—তারকার মালা।
নটন হিল্লোলে দোলে নব ব্রজবালা॥
কোকিল কোটাল হয়ে কামেরে জাগায়।
ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে শ্যাম গুণ গায়॥
ভ্রমর হাটের বাদ্য, পসার যৌবন।
গ্রাহক রসিকবর—মদনমোহন॥

এখন ফাল্গুন মাস। মন্দ মন্দ, বলপ্রদ, স্নিগ্ধকারী, সুগন্ধ বায়ু বহিতেছে। এ বায়ু আমার অঙ্গে বরাবর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লাগে। শিমুলফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়া বোধ হয় যেন প্রভাতে ভানু উদয় হইতেছে। উহা দেখিলে আমার হৃদয়ে আনন্দ ডগমগ করিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক, পরক্ষণেই প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। ভাবি যে, এ সুখ কাহার সহিত ভোগ করিব, আমার এ সুখের সাথী কে?

ফাল্গুন মাস আমার নিকট চিরদিন বিষমকাল। এই ফাল্গুন মাসে সমুদায় আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। ফাল্গুন মাস আসিতেছে

মনে করিলে আনন্দ, কিন্তু আসিলে আনন্দ পাই না, আবার গত হইলে উহার কথা মনে করিয়া আনন্দ পাই। তাই বুঝিলাম, সম্ভোগে সুখ নাই, যদি কিছু থাকে, তবে সে পূর্ব্বের সম্ভোগ স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যৎ সম্ভোগের আশায়। ফাল্গুন মাস আসিতেছে মনে করিয়া সুখ হয়, কিন্তু আসিবা মাত্র সুখ ফুরাইয়া যায়, আবার গত হইলে উহা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখ হয়।

ফাল্গুন মাসে শিমুলফুল ফুটে। উহা দেখিলে মনে হয় প্রভাতের ভানু যেন বৃক্ষের আড়াল দিয়া উঠিতেছে। তখন আবার আম্র ও সজ্‌না বৃক্ষ মুকুলিত হয়। কেন, কি জানি, বলিতে পারি না, পুষ্পে সুশোভিত সাজ্‌নার গাছ দেখিলে আমার বোধ হয়, যেন একজন অতি প্রাচীন সাধু দাঁড়াইয়া আছেন। আবার মুকুলিত আম্রবৃক্ষ দেখিলেই বোধ হয় যেন স্বয়ং ভগবতী জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। মাঠের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে দ্রোণপুষ্প ও জল-কল্‌মীফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কল্‌মীফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, অথচ লতা প্রায় শুখাইয়া গিয়াছে। এ সমুদায় দেখি, আর আমার প্রাণ আনচান করে, মনে হয় আমি আমার প্রাণধনকে হারাইয়াছি। আবার জল-কল্‌মী অপেক্ষা স্থল-কল্‌মী আরো হৃদয়-ভেদী। উহা আমি দেখিতে পারি না। শ্রীবৈষ্ণবগণ, কীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ভঙ্গি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বলিয়া অক্ষর দিয়া থাকেন,—"ইহাতে কি অবলা বাঁচে?" প্রকৃতই স্থল-কল্‌মী দর্শন করিলে কি জীব বাঁচে?

একটী যাত্রার গীত এই বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে,—

বসন্ত-কাল সুখের কাল, সুখের কপাল নয়।
মনসুখে সারী শুকে, সুখেরি মিলন হয়॥

এই উপরের গীতটী মনে করিলে আমার হৃদয় দ্রব হয়। বসন্তকাল সুখের কাল বটে, কিন্তু একাকিনী, বিরহিণী, বিয়োগিনীদের পক্ষে ইহা বিষমকাল। দেখ, ভাটীরফুল ফুটিয়া দিক্ আমোদিত করিয়াছে, আর মধুমক্ষিকাগণ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া পুষ্পের সহিত বিহার করিতেছে। "ফটিক-জল" পক্ষী দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তার স্বরে অবলার প্রাণ থাকে না। সেই সঙ্গে হরিদ্রা পাখী ও কোকিল ডাকিতে লাগিল। উহারা বসন্তরাজার সেনা, সকলে একই কালে উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সহায় হইলেন আম্র-মুকুল এবং নেবু, ভাটী প্রভৃতি বন-ফুলের গন্ধ। ইহারা সমুদায় "কাম জাগাইবার কোটাল।" ইহারা বিরহিণীর হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দেন, তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারেন। একটী শ্লোক আছে তাহার অর্থ এই যে, কোকিলের ডাক শুনিয়া বিরহিণী "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। দেবতা ডাকিলে বজ্র-ভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত, লোকে "জৈমিনী ভারতী" নাম লইয়া থাকে। বিরহিণীর কর্ণে কোকিলের ডাক বজ্রঘাতের ন্যায় লাগিল, তাই ঐ নাম ধরিয়া ডাকিলেন। পূর্ব্বে আমি এই শ্লোকটী একটী কবিতা মাত্র ভাবিতাম। কিন্তু এখন আর সেরূপ বোধ হয় না। কোকিলের ডাক শুনিলে আমি "জৈমিনী ভারতী" বলিয়া উঠি না বটে, কিন্তু ঐ স্বর বাণের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, আমার শরীর শিহরিয়া উঠে, আর আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়ি।

চণ্ডীদাসের এই পদটীর ন্যায় গীত আমি আর কখনও শুনি নাই। এটী গোলক-চ্যুত সতেজ সুধা-চক্র। এই গীত গান করিয়া আমি কত দিন নয়ন-জল ফেলিয়াছি। গীতটী এখন শ্রবণ করুন—

নিকুঞ্জ মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি সুখ লাগিয়া রুহু।
মধু খাই খাই, ভ্রমরা মাতিল, বিরহ জ্বালাতে মহু॥

জাতি রুইনু, জুতি রুইনু, রুইনু গন্ধ-মালতী।
ফুলের সুবাসে, নিদ্রা নাহি আসে, কঠিন পুরুষ জাতি ॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা ফেলি দিয়া, শেয বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায়, কাঁটা বিন্ধে গায়, কালিয়া নাগর বিনে ॥
রতন মন্দিরে, সখীর সহিত, তা সঙ্গে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম ॥

চণ্ডীদাস বলিতেছেন কি না, কৃষ্ণ বিরহিণীর অবস্থা। কিন্তু আমি ত কৃষ্ণকে চিনি না; তাঁহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই। তাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে খুঁজি নাই, তবে তাঁহার জন্য কেন বিরহিণী হইব, তাঁহার জন্য কেন প্রাণ কান্দিবে, তবে তিনি কেন আমার সেই হারাধন, সেই হা হুতাশের কারণ হইবেন ?

বিশেষতঃ আমার যে অবস্থা, প্রায় জীব মাত্রের এইরূপ,—কাহার অধিক, কাহার অল্প। কেহ সংসারের কার্য্যে বিব্রত থাকায় এই মহা আগুনের তত্ত্ব লইতে পারেন না, কেহ বা নানা উপায়ে এই অগ্নিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছেন, এই মাত্র। কিন্তু অবস্থা সকলেরই এক, সকলই ধনহারা হইয়া আমারি মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

তাই বুঝিলাম, এই সংসারে কোকিল প্রভৃতি "কোটাল হইয়া কামকে জাগাইতে" থাকে, আর এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে উহা নির্ব্বাণ করিতে পারে। শিশুকাল হইতে শত সহস্র বাসনা সৃষ্টি হইতেছে, ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও মার্জ্জিত হইতেছে, ক্রমে মনাগুণ বাড়িতেছে, আর উহা শত সহস্র পৃথক পৃথক শিখাকারে হৃদয়ে জলিতেছে। যত শুভ ও সুন্দর দর্শনে এই মনাগুণকে উদ্রেক করে। এই কাম আর কোথায়ও নির্ব্বাপিত হইবে না। এই ব্যাধির এক মাত্র ঔষধ সেই চরমগতি,—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম; শ্রীকৃষ্ণ পরিণামে

জীবকে শীতল করিবেন, সেই নিমিত্ত তাহাদের হৃদয়ে এই শত সহস্র শিখা সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এইরূপে রাজা রামানন্দ রায় সন্ধ্যার সময় আসেন, প্রভুর সহিত সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ-কথায় যাপন করেন, আবার প্রত্যূষে বাড়ী ফিরিয়া যান। রামানন্দ ক্রমেই প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন, আর প্রভু সম্বন্ধে তাঁহার মনে ক্রমেই ধান্দা লাগিতেছে। রাম রায় আর এক দিন বলিলেন, "স্বামিন্! আমার বলিতে ভয় করে, আপনি দিন দশেক এখানে থাকুন্। যদি আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছেন, কিছু দিন না থাকিলে আমার এই দুষ্ট মন শোধিত হইবে না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বল কি? দশ দিন কেন, আমি যাবৎ বাঁচিব, তাবৎ তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিব না। আমি তোমার মহিমা শুনিয়া তোমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম। তাহা যেমন শুনিয়াছিলাম তেমনি দেখিলাম। কৃষ্ণ-কথা শুনাইয়া তুমি আমার মন শুদ্ধ করিলে। নীলাচলে তোমায় ও আমায় দুই জনে কৃষ্ণ-কথায় সুখে কাটাইব।"

আবার সন্ধ্যার সময় রাম রায় আসিলেন। ক্রমেই প্রেমের হিল্লোল বাড়িতেছে, ক্রমেই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম তত্ত্বের বিচার হইতেছে, ক্রমেই রাম রায় আর একরূপ হইতেছেন।

ক্রমেই তিনি বিহ্বল হইতেছেন। নিশাভাগে প্রভুর সহিত কৃষ্ণ-কথায় যাপন করেন, আর দিবাভাগে চিরদিনের নিয়মানুসারে পূজা করেন। পূজা আর কিছু নয়,—ধ্যান করেন, আর ধ্যানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাঁহার প্রতি কৃপাও সেইরূপ। রাম রায় ধ্যান করিতে বসিলেন, অমনি শ্রীবৃন্দাবন আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন,—শুধু বৃন্দাবন নয়, বৃন্দাবনের পরিকর সহিত স্বয়ং

শ্রীরাধাকৃষ্ণ আসিলেন। রাম রায় এইরূপ এক দিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে আনন্দের ধারা পড়িতেছে, এমন সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে রাম রায় বড় ব্যাকুলিত হইলেন। যাহারা ধ্যান-সুখের মাঝে এইরূপ বঞ্চিত হয়েন, তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। রাম রায় ব্যাকুলিত হইয়া হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিতে লাগিলেন? করিতে করিতে আবার রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে অতি আশ্চর্য্য একটী কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে রাধার অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে কৃষ্ণ একেবারে লুকাইলেন। রহিলেন কে, না—এক জন অতি গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী! দেখিলেন যে, সন্ন্যাসিটী আর কেহ নন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাধার অঙ্গ দ্বারা আবৃত!

তাহার পরে দেখিলেন যে, যে সন্ন্যাসী আসিয়াছেন ও যাঁহার সহিত তিনি এখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই সন্ন্যাসী!

রাম রায়ের এ সমুদায় কিছু ভাল লাগিতেছে না। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণ খুঁজিতেছিলেন, তাই খুঁজিতে লাগিলেন। আর সন্ন্যাসীকে উহার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর রূপ ক্রমেই ফুটিতে লাগিল, ক্রমেই তিনি তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিতে লাগিলেন। তখন রাম রায় অতি ব্যাকুলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, যথা, চৈতন্যমঙ্গল গীতে—

আজ এ কি হলো আমার হৃদয় মাঝার।
জাগে গোরা রূপ খানি অতি মনোহর॥
ধ্যান করি চিরদিন কালিয়া বরণ।
কাল বহি নাহি জানি, না দেখে নয়ন॥

গোপ-বেশ বেণুকর নবীন কিশোর।
কোথা লুকাইল আজ শ্যাম নটবর॥

কিন্তু গৌররূপ গেলেন না, তাঁহার প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

ধ্যান করে কৃষ্ণ, রাজা দেখে গৌরচন্দ্র।
পুনরপি ধ্যান করে, জপে মহামন্ত্র॥
পুনরপি গৌররূপ দেখয়ে নয়নে।
কি হৈল কি হৈল বলি গণে মনে মনে॥
পুনরপি ধ্যান করে সুস্থির হিয়ায়।
পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ার মাঝার॥

রাম রায় তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, জীবকে হরিনাম বিতরণ করিতে ও তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন,—

অন্তর্য্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়॥
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়।—চরিতামৃত।

তিনি বুঝিলেন, নবীন সন্ন্যাসী মুখে কিছু না বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার পরিচয় দিলেন। রাম রায় তখন আনন্দে বিহ্বল হইলেন!

সন্ধ্যা হইলে দ্রুতগমনে যাইয়া রাম রায় প্রভুকে বলিতেছেন, যথা,—

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥
এই তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পঁড়াইল নারায়ণ॥
অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥—চরিতামৃত।

রাম রায় বলিতেছেন, "তুমি আমার মুখ দিয়া যত তত্ত্ব প্রকাশ করিলে, ইহার আমি কিছুই জানিতাম না। ইহাতে বুঝিলাম যে, তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এ সমুদায় নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিলে। ইহাতে আমার বোধ হয় তুমি সেই অন্তর্যামী ঈশ্বর। এ সম্বন্ধে আরও গুহ্য কথা বলিতেছি। আমি যখন প্রথমে তোমাকে দর্শন করি, তখন তোমাকে একজন সন্ন্যাসী মাত্র ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন মুহুর্মুহু এইরূপ বোধ হইতেছে যে, তুমি আমার সেই শ্যামসুন্দর। আবার ভাবি যে, তাহা হইলে তোমার বর্ণ কাঁচা সোনার মত কেন? তখন ভাবি তুমি শ্রীমতী রাধা। কিন্তু এখন আমি একটী স্থির করিয়াছি যে, তুমি শ্যামসুন্দর, শ্রীমতী রাধার অঙ্গ দ্বারা আপনার রূপ লুকাইয়া জগতে বিচরণ করিতেছ।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি যে এরূপ বলিবে তাহাতে বিচিত্র কি? শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের ধর্ম্মই এই। যাঁহাদের এই কৃষ্ণ-প্রেম আছে, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাধাকৃষ্ণ ভাবিবে এ বিচিত্র কি? স্থাবর জঙ্গমও তোমার নিকট রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম হইবে।"

রাম রায় বলিতেছেন, "প্রভু! এই জঙ্গলময় দেশে, বিষয়কার্য্য লইয়া বিব্রত ছিলাম। আমাকে কৃপা করিবার নিমিত্ত তুমি তল্লাস করিয়া আমাকে বাহির করিলে। এখন তুমি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ! প্রভু, এ কি তোমার উচিত?"

শ্রীভক্তগণ শ্রীভগবানকে এইরূপ ধমকাইয়া কথা বলেন, আর শ্রীভগবানের নিকট অন্যের স্তুতি ও চাটুবাক্য অপেক্ষা ভক্তের তিরস্কার অনন্ত গুণ মধুর লাগে। এই ধমক খাইয়া,—

তবে প্রভু হাসি তারে দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥

দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্চ্ছিত।—চরিতামৃত।

প্রভু গাত্রে হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে চেতন করাইলেন। বিদ্যানগরে প্রভুর কার্য্য শেষ হইয়া গেল, তখন বিদায় মাগিলেন। প্রভু বিদায় হইবার সময় রাম রায়কে বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইতে বলিলেন। কিন্তু ওরূপ আজ্ঞার আর প্রয়োজন হইল না, রাম রায় তখন প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, বিষয় কার্য্য করিবার আর তাঁহার ক্ষমতা রহিল না। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "যাবৎ আমি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া না আসি, তাবৎ তুমি এখানে থাকিও।" রাম রায়, প্রভু প্রত্যাগমন করিবেন সেই আশায়, বিদ্যানগরে প্রভুর পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। প্রভু দক্ষিণ দেশে চলিয়া গেলে রাম রায় মূর্চ্ছিত হইলেন, আর বিদ্যানগরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রভু সেই নগরে দশ দিবস বাস করায় সমস্ত নগরবাসী প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছিল, আর শ্রীমহাপ্রভুকে একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল। তাহারাও রাজার সহিত শোকে অভিভূত হইল।

এইরূপে প্রভু এখন একেবারে গৌড়ীয় ভক্তগণের নয়নের অদর্শন হইলেন।

ও দিকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কথা পাঠক স্মরণ করুন। প্রভু আলালনাথে ভক্তদিগকে ফেলিয়া গমন করিলে, তাঁহারা অচেতন হইয়া সারা দিন রাত্রি পড়িয়া রহিলেন। পর দিবস প্রভাতে, প্রভুর আজ্ঞা ক্রমে, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন। যে প্রভুর নিমিত্ত তাঁহারা সমুদায় ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রভু তাঁহাদিগকে এখন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। আর তাঁহাদের গরব নাই, সুখ নাই, তেজ নাই, এমন কি চেতন যে আছে তাহাও

সব সময় বোধ হইত না। তাঁহারা জীবন ধারণের নিমিত্ত আহার করেন, কয়েক জনে বসিয়া একচিত্ত হইয়া প্রভুর কথা বলেন, গলাগলি হইয়া রোদন করেন, রাত্রে প্রভুকে স্বপন দেখেন,—এইরূপে দক্ষিণ মুখে চাহিয়া সকলে নিশি দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

সার্ব্বভৌম রোদন করিয়া তখন অন্য রূপ ধারণ করিয়াছেন। যখন বড় দুঃখ বোধ করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে প্রভুর কথা শুনিয়া মনকে সান্ত্বনা করেন। সৌভাগ্য অন্তর্দ্ধান না হইলে তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারে না। প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিলেই, তাঁহার মহিমা সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে এই সমুদায় কথার সৃষ্টি হইতে লাগিল,—যথা, শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিয়া এখন আবার অদর্শন হইয়াছেন। তখন নীলাচলবাসী ভক্ত ও অভক্তগণ সকলে সার্ব্বভৌমকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের আবেদন এই যে, প্রভুকে তাঁহারা দেখিবেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগকে ইহাই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিলেন যে, প্রভু দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছেন, সত্বর আসিবেন, আসিলে তাঁহাদের সহিত মিলাইয়া দিবেন।

ক্রমে এই জনরব মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণে গেল। তখন তিনি সার্ব্বভৌমকে আহ্বান করিয়া, কটক হইতে পুরীতে দূত পাঠাইলেন। সার্ব্বভৌম রাজার আজ্ঞা শুনিয়া একটু বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, অসময়ে রাজা তাঁহাকে কেন ডাকিলেন? মহারাজ প্রতাপরুদ্র দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত। তখন হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই কেবল মুসলমানগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছেন। স্বয়ং রাজপুত, আবার রাজপুত-

দিগের শ্রী পদ ও মর্য্যাদা তখন তিনিই কেবল রক্ষা করিতেছেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন, কাজেই নিজের রক্ষার নিমিত্ত তিনি দিবানিশি সৈন্য লইয়া যুদ্ধ কার্য্যে ব্যস্ত। তিনি ডাকিতেছেন, কাজেই সার্ব্বভৌমের ভয়ও হইল।

সার্ব্বভৌম দ্রুতগতিতে কটক গমন করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সহাস্যে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সার্ব্বভৌম আশ্বস্ত হইয়া বসিলেন। তখন রাজা বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য! আমি শুনিলাম, এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, তিনি নাকি বড় প্রতাপান্বিত, এমন কি অনেকে তাঁহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি নাকি তোমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন। তাই তোমাকে ডাকাইলাম। তুমি তাঁহার সমুদায় কথা বল, আমি শুনিব।"

সার্ব্বভৌম। মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, সে সমুদায় ঠিক। তিনি অতি মহাশয়, তাই আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়া আমার দুষ্ট মন শোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজা। বটে! তবে তুমি একবার তাঁহাকে আমাকে দেখাও।

সার্ব্বভৌম দেখিলেন যে, রাজার যেরূপ ভাব তাহাতে যেন তিনি প্রভুকে কটকে আজ্ঞা দিয়া লইয়া আইসেন; তাই ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "মহারাজ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন সমুদায় সত্য। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে ভজন করেন, রাজদর্শন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তিনি প্রাণ গেলেও তাঁহার যে ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন উহা বোধ হয় না।"

রাজা। সে কি! তোমরা সকলে উদ্ধার হইয়া যাইবে, কেবল আমি রাজা বলিয়া উদ্ধার হইব না?

সার্ব্বভৌম। তিনি কৃপাময়, মহারাজকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন, আমি সে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

রাজা। শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা বড় তীর্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্রে আসিয়া আবার তাঁহার তীর্থদর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল?

সার্ব্বভৌম। তাঁহার নিজের কিছু প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু জীবের কুকর্ম্মের নিমিত্ত তীর্থস্থান সমুদায় কলুষিত ও নিস্তেজ হয়। তাই মহাজনগণ সেখানে যাইয়া উহা পবিত্র করিয়া থাকেন।

রাজা। তুমি এরূপ কেন করিলে? তুমি তাঁহাকে যাইতে দিলে কেন? তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া রাখিলে না কেন? তাহা হইলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম।

সার্ব্বভৌম। তার ত্রুটি করি নাই। তবে তিনি স্বতন্ত্র, তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারিলাম না।

রাজা। তুমি কেন খুব জিদ করিয়া ধরিলে না?

সার্ব্বভৌম। আমি কোন অংশে ত্রুটী করি নাই। তাঁহার পা ধরিয়া রোদন করিয়াছি, তাঁহার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, ত্রিলোকের মধ্যে কাহারও তিনি বাধ্য নন।

রাজা। স্বতন্ত্র ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছি, তুমিও কি তাঁহাকে শ্রীভগবান বল না কি?

সার্ব্বভৌম। আমি মন্দমতি, তর্কনিষ্ঠ, তাঁহাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই। এখন তিনি, আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, আমার প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া, আমাকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা। তিনি শ্রীভগবান, আর আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে

পারিলাম না? তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিতেছ, সেখানে আর আমার সন্দেহ করা উচিত হয় না। তবে আমি শ্রীভগবানকে পাইয়া দেখিতে পাইলাম না!

সার্ব্বভৌম। তিনি আবার আসিবেন, এমন কি, শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবেন। অতএব মহারাজ ব্যগ্র হইবেন না। যখন আপনার স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য আপনাকে দর্শন দিবেন।

কথা এই যে, শ্রীভগবান আসিয়াছেন, আসিয়া তাঁহাকে দেখা না দিয়ে গমন করিয়াছেন, ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোভ হইতে পারে। প্রতাপরুদ্রের ত আরো ক্ষোভ হইবার কথা, যেহেতু তিনি রাজা, সকল বিষয়ে অগ্রভাগ তাঁহার। তাঁহার মনোদুঃখ দেখিয়া সার্ব্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি আসিবেন, আর শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন। রাজাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত আর একটী কথা উঠাইলেন। বলিতেছেন, "মহারাজ শ্রীভগবান ত সত্বরই প্রত্যাগমন করিবেন, কবে আসিবেন নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার থাকিবার একটী বাসস্থান চাই। এমন বাসা চাই যে, সেখানে অনেক স্থান থাকে, এবং উহা নির্জ্জন ও মন্দিরের অতি নিকট হয়।"

রাজা ইহাতে প্রভুকে একটু উপকার করিবার সুবিধা পাইয়া, সহর্ষে বলিতেছেন, "তাহার ভাবনা কি? ভাল বাসাই দেওয়া যাইবে। আমার বোধ হয় কাশী মিশ্রের বাটী দিলে হইতে পারে।" সার্ব্বভৌম এই বাসার কথা শুনিয়া মনের সহিত অনুমোদন করিলেন। অতএব প্রভু প্রত্যাগমন করিলে কাশী মিশ্রের বাড়ী থাকিবেন সাব্যস্ত হইল। কাশী মিশ্র রাজার গুরু।

তাহার পরে রাজা সার্ব্বভৌমের নিকট প্রভুর গুণ-চরিত্র শুনিতে

লাগিলেন। রাজা শ্রীমতী রাধার ন্যায়, সার্ব্বভৌম-রূপ যে ভাট তাঁহার মুখে প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়াই, চিত্ত-মনের অধিকাংশ তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

এ দিকে প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং" বলিয়া দক্ষিণদেশের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সহ এইরূপে বৌদ্ধাচার্য্য, জৈনাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, শৈব্যাচার্য্য প্রভৃতি যত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মিলন হইল। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা দাক্ষিণাত্য দর্শনে জানা যাইত। মুসলমানগণ সে দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং দক্ষিণদেশে মারামারি কাটাকাটি নাই, সেখানে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা, আর ইহা ভদ্রলোকের কেবল এক মাত্র কার্য্য। প্রভুর এইরূপ ভ্রমণ করিতে প্রায় দুই বৎসর গেল। দ্বারকা যাইতে পথে কুলিনগ্রাম-নিবাসী রামানন্দ বসুর সহিত দেখা হইল। তিনি প্রভুকে পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই, নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র। তখন তীর্থভ্রমণের ফলস্বরূপ, প্রভুকে পাইবা মাত্র, তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহার সহিত রহিয়া গেলেন, ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বসু রামানন্দের একটী গীতের ভণিতা শ্রবণ করুন—

বসু রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি,
গৌর আমায় পাগল কৈলে।

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ কাহিনী এখন লেখা হইবে না। ইহা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইবে। এখানে কেন উহা দিলাম না তাহার নানা কারণ আছে, সে কি কি তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, শুদ্ধ সেই লীলাই এক বৃহৎ গ্রন্থের ব্যাপার।

প্রভু যেখানে গমন করেন, আপনিই সেখানে এই কথা প্রচার হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সেখানেই লোকে ভক্তির শক্তিতে উন্মাদগ্রস্ত হয়। প্রভু সেখানে দুই একটা আচার্য্যকে সৃষ্টি করেন, আবার অন্য স্থানে গমন করেন। এই আচার্য্য সৃষ্টির মধ্যে আবার একটী রহস্য আছে। তিনি দক্ষিণদেশে, কোন বিশেষ ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান আচার্য্যকে ধরিতেছেন, ও তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন এবং তাঁহাকেই শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নিযুক্ত করিতেছেন। আবার আর এক অদ্ভুত কথা স্মরণ করুন। প্রভু যেখানে গমন করেন, সেই স্থানে একটী চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপিত হয়। সৌরাষ্ট্রে প্রভু যে বটবৃক্ষ তলে বসিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি লোকেরা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আমি একটা প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম ;—

"শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচি দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে গমন করেন। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। এই স্থান অতি দুর্গম, বোম্বাই হইতে কয়েক দিবস দূরে। রামযাদব বাবু কষ্টেসৃষ্টে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি যে, সেখানে একটী রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় ঐ মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল।

"কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি দেখিতেছেন যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাল লইয়া কয়েক জন ঐ দেশীয় বৈষ্ণব, আমাদের সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।' আমাদের সংকীর্ত্তন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সে সংকীর্ত্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু উহার আকৃতি ঠিক আমাদের সংকীর্ত্তনের মত। রামযাদব বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

শুনিতেছেন, এমন সময় সেই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহুদূরে সংকীর্ত্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ-কুমারটীর নাম কিরূপে আসিল? এই ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন।

"কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না! তখন রামযাদব বাবুর এই সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে রহিয়া গেলেন, ও দুই দিবসের অনুসন্ধানে একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেই বঙ্গদেশ হইতে এই খোল করতাল ও এই কীর্ত্তন আসিয়াছে। কিরূপে আসিল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্যদেব, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন।"

"পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন। সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। আর সে কথা ও সে তরঙ্গ অদ্যাপি সেখানে আছে! একবার এই বিষয়টী অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ বস্তু। "এখানে তোমাদের চৈতন্য নৃত্য করিয়াছিলেন," বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন তাহাতেই সেখানে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বীজ বপন করা হইল!

প্রভুর মস্তকে জটা, মুখে শ্মশ্রু, পরিধান জীর্ণ কৌপিন। সেই অতি দীর্ঘ দেহ এখন ক্ষীণ হইয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত, নয়ন প্রেমে ঢলঢল ও ঈষৎ লোহিত বর্ণ। প্রভুকে দর্শন মাত্রে লোকের হৃদয় দ্রব হয়। প্রভু এই যে প্রায় দুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিলেন, ইহার মধ্যে এক দিবস শ্রীনবদ্বীপ স্মরণ করিয়াছিলেন।

পুনা নগরের নিকট প্রভু বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া আছেন, যেন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন ও কাঙ্গাল। তাঁহার ভৃত্য একটু দূরে বসিয়া। হঠাৎ প্রভুর শ্রীনবদ্বীপ মনে পড়িল। তখন রোদন করিতে লাগিলেন, আর অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কোথা আমার প্রাণ-প্রতিম মুরারি, কোথা নরহরি? আমি তোমাদের না দেখিয়া বাঁচি না। কবে আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব?"

এ দিকে স্বপ্নবিলাসের কাহিনী মনে করুন্। শ্রীকৃষ্ণ গোপীর প্রেমঋণ শোধিতে পারিলেন না; বলিলেন, তোমরা অহেতুক আমাকে এত প্রীতি করিয়া আমাকে চিরঋণের দায়ে আবদ্ধ করিয়াছ। আমি তোমাদিগকে কিছু দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু নাই যাহাতে তোমাদের ধার শোধ হইতে পারে। তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন, "সে ঋণ শোধ করা বড় অধিক কথা নয়, তুমি তাহা অনায়াসে শোধিতে পার। তুমি জীবকে যদি হরিনাম দাও, তবে আমি তোমাকে ঋণ হইতে খালাস দিব।"

শ্রীমতী যদিও কতক রহস্য ভাবে এ কথা বলিবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অমনি বলিলেন "তথাস্তু"; তাই শ্রীকৃষ্ণ একখানি "দাস-খত" লিখিয়া দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, তিনি কলিযুগে সন্ন্যাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিবেন। শ্রীভগবান এই কার্য্য করিয়া শ্রীমতীর ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাই গৌর অবতার হইলেন। এই গেল স্বপ্নবিলাসের কথা। বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও যাত্রা হইয়া থাকে, তাহাতে সেই 'দাস-খত' খানি গীত হইয়া থাকে। সে দাস-খত এইরূপে লিখিত—

"ইয়াদি কৃত্য, গুণ সমুদ্র, সৎ সাধু শ্রীরাধা।
সচ্চরিত্র, চরিতেষু, পুরাহ মনের সাধা॥

তস্য খাতক, হরি নায়ক, বসতি ব্রজপুরি।
অস্য কর্জ্জং পত্র মিদং, লিখিত সুকুমারী॥
তারিখস্য দ্বাপরস্য, পরিশোধ কলিযুগে।
এই কথায়ে, খত লিখিনু, ইসাদি মঞ্জুরি ভাগে॥”

এখন উপরি উক্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়া মহাজনগণ যে পদ প্রস্তত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

কেন্দে আকুল হলো গৌরহরি।
(বলে কোথা রাই-কিশোরী। ধ্রু ॥
প্রেম-নয়নে দীনের পানে, চাও বারেক কৃপা করি।
ছেঁড়া কাঁথা, করোয়া হাতে, কেন্দে বেড়ায় পথে পথে,
তোমারি নাম নিতে নিতে এসেছি আশা করি॥
(খালাস হব বলে)

প্রভু এই ত্রিজগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীন হইয়া দক্ষিণে ভ্রমণ করিতেছেন। এদিকে এ কথা শ্রীনবদ্বীপে প্রকাশ হইল যে, নিমাই নীলাচল ত্যাগ করিয়া, একটী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছেন। তখন সমস্ত গৌড়দেশ ঘোর বিয়োগে অভিভূত হইলেন। শ্রীনিমাই নীলাচল বাস করিবেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, যত দিবস এরূপ সাব্যস্ত ছিল, তত দিবস লোকে এক প্রকার মনকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এখন এ কি কথা? নিমাই কোথায় গেলেন? তিনি একা গেলেন, তাঁহাকে রক্ষা কে করিবে? নিমাই কি আর ফিরিয়া আসিবেন?

যে নিমাই সর্ব্বদা প্রেমে বিভোর, আহার না করাইয়া দিলে যিনি আহার করেন না, যাঁহাকে সাধ্যসাধনা না করিলে কৃষ্ণভজন রাখিয়া শয়ন করেন না, তিনি এখন দূর ও জঙ্গলময় দেশে একাকী

হাঁটিতেছেন। কে ভিক্ষা দিতেছে, কে রন্ধন করিতেছে, কোথা রাত্রি বাস করিতেছেন, এই ভীষণ রৌদ্র কিরূপে সহিতেছেন? যে নিমাইকে নয়নের উপর রাখিয়াও, ভয় হয় যে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পদে পদে ব্যথা লাগিবে, তাঁহার এখন এই দশা! নবদ্বীপে হাহাকার পড়িয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জীবের পুরুষার্থের সীমা। এই কৃষ্ণ-বিরহ, প্রভু আপনি রাধা-ভাব ধারণ করিয়া, জীবকে দেখাইলেন। আর এই কৃষ্ণ-বিরহ কিরূপ, তাহা তিনি নবদ্বীপে নিজ পরিকরগণ দ্বারা জীবকে দেখাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রজবাসীগণের দশা যেরূপ হইয়াছিল, শ্রীনবদ্বীপবাসীগণের দশা প্রকৃত তাহাই হইল। গৌর-পরিকরগণ, গোপগোপীর যে দশা তাহাই পাইলেন। কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহ বা মধুর-ভাবে অভিভূত হইয়া গৌর-বিরহসাগরে ডুবিলেন।

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোর বিয়োগে চেতনহারা হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার যদিও একটু চেতন থাকিল, শচী একেবারে পাগল হইলেন। তাঁহার মনে এই ভাব বসিয়া গেল যে, তিনি শ্রীমতী যশোদা, আর নিমাই, তাঁহার কৃষ্ণ, এখন মথুরায় গিয়াছেন। শচী সেই ভাবে বিভোর। যখন একটু চেতন হয়, তখন শ্রীনবদ্বীপে অভ্যাগত সাধুগণকে অন্বেষণ করেন;—কাহার নিকট লোক পাঠাইয়া দেন, কাহাকেও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন। এই সমুদায় লোকের নিকট তাঁহার এক মাত্র প্রশ্ন এই যে,—"নিমাই নীলাচলে কি ফিরিয়া আসিয়াছেন? নিমাইকে দেখিতে বড় সুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপীন; মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, আর প্রেমে পাগলের মত ঢুলে ঢুলে চলে।" যথা, একটী প্রাচীন পদ হইতে উদ্ধৃত—

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, সন্ন্যাসী বৈরাগী যারা।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া শুধায়, শচী পাগলিনী পারা॥

তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখেছ ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, তাঁরে কি ভেটেছ ?
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তনু খানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম, বোলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা ॥

তাহারা বলে, "না দেখি নাই।"

যখন অচেতন থাকেন তখন নানা রঙ্গ করেন। কখন শ্রীবাসের বাড়ীতে নিমাইকে তল্লাস করিতে গমন করেন। কখন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা মথুরার সংবাদ বলিতে পার ? কখন নিমাইয়ের নিমিত্ত রন্ধন করেন। কখন নিমাইকে বসিয়া খাওয়ান।

লোকে দেখে যে, তিনি নিমাইকে খাওয়াইতেছেন, তাহার সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু নিমাইকে কেহ দেখিতে পায় না। কখন শচী রজ্জু লইয়া যশোদাভাবে রাগ করিয়া নিমাইকে বান্ধিতে গমন করেন, তখন সকলে যশোদার শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনরূপ লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। আবার রাত্রিতে কখন শচী স্বপ্ন দেখিয়া 'নিমাই নিমাই' বলিয়া কান্দিয়া উঠেন।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘোর বিয়োগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন। লোচন সেই বর্ণনা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন কি, কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীমতী উহার দুই এক স্থানে পরিবর্ত্তনও করেন। লোচনদাসের, সেই শ্রীমতীর বার-মাসের দুঃখ-বর্ণনা অর্থাৎ বারমাসিয়া শ্রবণ করুন, করিলে মন নির্ম্মল হইবে। যথা—

১। ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা-দিবসে।
উদ্বর্ত্তন-তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ-দীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ যুবা॥
২। চৈত্রে চাতকপক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্প-মধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে।
তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কার কোলে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! আমি কি বলিতে জানি
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥
৩। বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছান্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র॥
৪। জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিলে প্রভু পাদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দিন।
ছটফট করে যেন জল বিনে মীন॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
৫। আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে॥

শুনিয়া মেঘের নাদ, ময়ূরের নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তা চাও ॥
৬। শ্রাবণে ললিত-ধারা মন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু, কারে কব কথা ॥
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥
৭। ভাদ্রে ভাস্বত তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! বিষম ভাদ্রের খরা।
জীবন্ত মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা ॥
৮। আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা-মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে ॥
শরৎ সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥
৯। কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা ॥

কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপরাশি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তুমি অন্তর যামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥

১০। অগ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে, প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাট নেত ভোটে, প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা-চরণের ছায়া ॥

১১। পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! পরবাস নাহি সহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে ॥

১২। মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
এই ত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস ॥

শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা এখানে আর অধিক বলিব না। তাঁহাদের বিরহ-বর্ণনের স্থান আছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রভু দুই বৎসর দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে আগমন করিলেন। এই দুই বৎসরের ভ্রমণ-বৃতান্ত অতি সংক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল।

প্রভু বিদ্যানগর হইতে ত্রিমল্ল নগরে উপনীত হইলেন। এখানে বহু বৌদ্ধ বাস করেন, বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহাপণ্ডিত রামগিরির সহিত প্রভুর তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হইয়া প্রভুর চরণ আশ্রয় করেন। তৎপর ঢুণ্ডিরাম তীর্থে ঢুণ্ডিরাম নামক মহা পাণ্ডিত্যাভিমানীর সহিত প্রভুর বিচার হইল, এবং ঢুণ্ডিরাম প্রভুর কৃপা পাইয়া "হরিদাস" নামে খ্যাত হইলেন। প্রভু ক্রমে "অক্ষয়বট" নামক স্থানে আসিয়া তথাকার "বটেশ্বর" শিবকে দর্শন করিলেন। হঠাৎ সেখানে তীর্থরাম নামক ধনী বণিক, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নামক দুটি বেশ্যাসহ উপস্থিত হইয়া প্রভুকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর প্রেমের বেগ দেখিয়া ইহারা তিন জনই তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের পাপরাশি দূরীভূত করিল। তীর্থ-রামের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রভুর কৃপা পাইলেন। বটেশ্বরে সাত দিন থাকিয়া দশক্রোশব্যাপী এক বিশাল জঙ্গলে প্রভু প্রবেশ করিলেন। তৎপরে মুন্নানগরে আসিয়া প্রভু অদ্ভুত নৃত্য করিলেন, এবং উহা দর্শন করিয়া লক্ষলক্ষ লোক পবিত্র হইল। মুন্নানগর হইতে প্রভু বেঙ্কটনগরে পৌঁছিয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। এখন প্রভু পন্থভীল নামক দস্যুকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। বগুলা নামক বনে পন্থভীলের বাস। পন্থভীল প্রভুর দুই চারিটি কথা শুনিয়া

অমনি দল সমেত অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীন ধারণ করিল ও হরিনামে মত্ত হইল। এখান হইতে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রভু উন্মত্তের ন্যায় তিন দিবস অনাহারে গমন করিয়া চতুর্থ দিবসে দুগ্ধ ও আটা সেবা করিলেন।

তদন্তর গিরীশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভু নিজ হস্তে তথাকার শিবকে অঞ্জলি করিয়া বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। এখানে এক মৌনী সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্ন্যাসী নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন, কাহারও সহিত কথা কহেন না, কিন্তু প্রভু তাঁহার মৌন ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে প্রেমদান করিলেন। এখান হইতে ত্রিপদী নগরে উপস্থিত হইয়া প্রভু শ্রীরাম-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেখানে মথুরা নামক এক তার্কিক রামাইত-পণ্ডিত প্রভুর সহিত তর্ক করিতে আসিলেন, এবং প্রভুর ভাব দেখিয়া তখনই তাঁহার শরণাগত হইলেন। তৎপর পানা-নরসিংহ দর্শন করিয়া প্রভু বিষ্ণুকাঞ্চী-ধামে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করিলেন। সেখান হইতে ৪ ক্রোশ দূরে ত্রিকোণেশ্বর শিব আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভদ্রা নদীস্থ পক্ষগিরি তীর্থে আসিলেন। তৎপর কাল-তীর্থে বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি-তীর্থে আসিলেন। সেখানে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে ভক্তি প্রদান করিয়া চাঁইপন্দী তীর্থে যাত্রা করিলেন।

চাঁদপন্দী হইতে নাগর নগর ও সেখান হইতে তাঞ্জোরের কৃষ্ণভক্ত ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইলেন। তৎপরে চণ্ডালু নামক গিরি, —যেখানে বহু সন্ন্যাসীর বাস—সেখানে গমন করিলেন। তথাকার ভট্ট নামক ব্রাহ্মণ ও' সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসীবরকে কৃপা করিয়া, প্রভু পদ্ম-কোট তীর্থে অষ্টভুজা ভগবতীকে দর্শন করিলেন। এই স্থানে প্রভু যখন অষ্টভুজা দেবীকে বেড়িয়া বালক বালিকার সহিত হরি কীর্ত্তন

করেন, তখন হঠাৎ পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। এখানে প্রভু এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে চক্ষুদান করেন। কিন্তু এই অন্ধ-ব্রাহ্মণ প্রভুর রূপ দর্শন করিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিল, এবং প্রভু মহা সমারোহে তাহার সমাধি দিলেন। পদ্মকোট হইতে ত্রিপাত্র নগরে চণ্ডেশ্বর শিব ও তথাকার প্রধান দার্শনিক বৃদ্ধ ও অন্ধ ভর্গদেবকে কৃপা করেন। ত্রিপাত্র নগরে প্রভু সাত দিন ছিলেন।

প্রভু আবার গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। এক পক্ষ পরে এই বন পার হইয়া রঙ্গাধামে নরসিংহ দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এখান হইতে বাসভ পর্ব্বতে গমন করিয়া পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে রামনাথ নগরে আসিয়া রামের চরণ ও তদন্তর রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন। তিন দিন পরে সাধ্বীবন নামক স্থানে মৌনব্রতধারী মহাতাপসকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। মাঘি পূর্ণিমার দিন প্রভু তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করিয়া সমুদ্র পথ ধরিয়া কন্যাকুমারী চলিলেন।

কন্যাকুমারীতে সমুদ্রস্নান করিয়া প্রভু ফিরিলেন। সাঁতন দিয়া ত্রিবাঙ্কুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার ত্রিবাঙ্কুর রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল, ভক্ত ও পুণ্যবান। প্রভু এক বৃক্ষতলে হেলান দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে হরিনাম জপ করিতেছিলেন, আর শত শত নগরবাসী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল। ক্রমে রাজা রুদ্রপতি প্রভুর মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে রাজধানী আনিবার নিমিত্ত এক দূত পাঠাইলেন। প্রভু অবশ্য অস্বীকার করিলেন। শেষে রাজা স্বয়ং আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা অর্জ্জন করিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের নিকট রামগিরি নামক পর্ব্বতে অনেক গুলি শঙ্করের শিষ্য বাস করেন। প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া

মৎস্যতীর্থ, নাগপঞ্চপদী, চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। সেখান হইতে চণ্ডপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী নামক কোন জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে প্রেমদান করিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস রাখিলেন। তারপর চণ্ডপুর ত্যাগ করিয়া দুই দিবস ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ দিয়া চলিলেন। অনেক ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সহিত প্রভুর দেখা হইল। তাহারা প্রভুকে দেখিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রভু শর্ব্বত বেষ্টিত একটি অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া কোন ভক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে দর্শন দিলেন।

ক্রমে প্রভু নীলগিরি পর্ব্বতের নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে আসিয়া অনেক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া, প্রভু গুর্জ্জরী নগরে অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করিলেন। গুর্জ্জরী নগরে প্রভু প্রেমের হিল্লোল তুলিয়া সহস্র সহস্র লোককে ভক্তি প্রদান করিলেন। গুর্জ্জরী নগর হইতে বিজাপুর পর্ব্বত দিয়া সহ্য-কুলাচল ও মহেন্দ্র-মলয় দর্শন করিয়া পুনানগরে উপস্থিত হইলেন। পুনা নগর তখন কতকটা নদীয়ার মত চতুষ্পাঠিতে ও পণ্ডিতদলে পরিপূর্ণ। প্রভু তচ্ছর নামক জলাশয়ের ধারে বসিয়া, কৃষ্ণ-বিরহে বিভোর। সহস্র লোক দ্বারা অমনি তিনি বেষ্টিত হইলেন। একজন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ জলাশয়ের মধ্যে। অমনি প্রভু সরোবরের মধ্যে ঝম্প দিয়া জলমগ্ন হইলেন। উপস্থিত লোক সকল হাহাকার করিয়া তাঁহাকে কোন ক্রমে উঠাইলেন।

পুনা হইতে প্রভু ভোলেশ্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলেশ্বর, পটস্ গ্রামের সন্নিকটস্থ গোরঘাট নামক গ্রামে। সেখান হইতে দেবলেশ্বরে ও তথা হইতে খাণ্ডবায় খাণ্ডবা দেবকে দর্শন করিতে গমন

করিলেন। যে নারীর বিবাহ না হয়, তাহার পিতামাতা তাহাকে খাণ্ডবা দেবকে সেবা করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোকে "কুমারী" বলিয়া ডাকে। এই মুরারী অর্থাৎ দেববাসিগণের মধ্যে অনেকেই ভ্রষ্টাচারিণী। ইহাদের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া প্রভু ইহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে চোরানন্দী বনে প্রবেশ করিয়া নারোজী নামক প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে উদ্ধার ও সঙ্গে করিয়া শূলানদী তীরস্থ খণ্ডলা তীর্থে গমন করিলেন। সেখান হইতে নাসিক নগরে ও নাসিক নগর হইতে পঞ্চবটি বনে প্রবেশ করিয়া দমন নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে উত্তর দিক ধরিয়া ১৫ দিন পরে সুরাট নগরে আসিলেন। এখানে তিন দিন বাস করিয়া তথাকার অষ্ট-ভূজা ভগবতীর নিকট পশু বলিদান প্রথা নিবারণ করিয়া তাপ্তি নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। তার পর নর্ম্মদায় স্নান করিয়া বরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করিয়া বরোদায় আসিলেন। এখানে নারোজী ডাকাইত—যিনি প্রভু কৃপা পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে ছিলেন,—দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং মৃত্যুর সময় প্রভু স্বয়ং তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়াছিলেন। বরদার রাজা প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

মহানদী পার হইয়া প্রভু আহামেদাবাদে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে শুভ্রামতী নদীর তীরে পৌছিয়া প্রভু দুইজন বাঙ্গালী ভক্তের দেখা পাইলেন, অর্থাৎ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণ। প্রভু ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া দ্বারকায় চলিলেন। শুভ্রাসতী নদী পার হইয়া যোগা নামক স্থানে আশ্চর্য্য রূপে বারমুখী নামক বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া, সোমনাথ দর্শন করিতে ছুটিলেন, যাফেরাবাদ দিয়া ছয় দিন পরে সোমনাথে পৌছিলেন। যবনেরা

সোমনাথের দুর্দ্দশার এক শেষ করিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়া প্রভু হাহাকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন, এবং সোমনাথকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্যসহ পুনরায় তাঁহার ভক্তগণের চক্ষে উদয় হউন।

"এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার।
হৃদয়ের মধ্যে হেরি মুরতি তোমার॥"

প্রভু এই বাক্য দ্বারা সোমনাথকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

সোমনাথ হইতে জুনাগড় ও জুনাগড় হইতে গৃর্ণার পাহাড়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন এবং গয়ায় চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া প্রভুর হৃদয়ে যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সেইরূপ ভাব-তরঙ্গে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক কোন প্রতাপশালী সন্ন্যাসীকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া, তাঁহাকে প্রেমদান করিলেন এবং ভর্গদেবকে সঙ্গে লইয়া প্রভু চলিলেন। তৎপর ঝারিখণ্ড, অর্থাৎ নিবিড় জঙ্গল পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে ষোল জন ভক্ত। এই ঝারিখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রভু চলিয়াছেন, আর করতালি দিয়া সুস্বরে "হরে-কৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" এই গীত গাইতেছেন। সঙ্গীগণ আনন্দে বিভোর হইয়া বনের শোভা দর্শন ত অতি সুস্বাদু ফল আহার করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। সাতদিন পরে এই নিবিড় বন উত্তীর্ণ হইয়া অমরাপুয়ী গোপীতলা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহাকেই প্রভাস-তীর্থ বলে।' এই তীর্থ দর্শন করিয়া প্রভু একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন,—কখন কান্দিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, যেন চির পরিচিত স্থানে আসিয়া পূর্ব্বকার সমস্ত চিহ্ন দর্শন করিতেছেন।

অমরাপুরীর লোক একত্র জুটিয়া।
আনন্দ পাইল সবে প্রভুরে দেখিয়া॥
পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি চায়।
আবেশে উন্মত্ত হয়ে চারিদিকে ধায়॥
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হারা।
মিশিয়া গিয়াছে উর্দ্ধে নয়নের তারা॥

১লা আশ্বিন প্রভাসতীর্থ ছাড়িয়া প্রভু দ্বারকায় চলিলেন। সাগরের তীরে তীরে চলিলেন, এবং চারি দিন পরে দড়ার উপর দিয়া সাগরের খাড়ি পার হইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। প্রভাসের ন্যায়, দ্বারকায় আসিয়াও প্রভু এই তীর্থস্থান প্রেমের বন্যায় ডুবাইলেন। এক পক্ষকাল দ্বারকায় থাকিয়া, নানাবিধ রঙ্গ করিয়া শেষে নীলাচল মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; সঙ্গীগণকে বলিলেন যে, তিনি বিদ্যানগর হইতে রামানন্দ রায়কে সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ পৌছিবেন।

আশ্বিন মাসের শেষে প্রভু পুনরায় বরদা নগরে আইলেন। তাহার ষোল দিন পরে নর্ম্মদা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। এখানে ভর্গদেবের সহিত প্রভুর ছাড়াছাড়ি হইল, এবং ভর্গদেব বিদায় কালে প্রভুর চরণ ধূলি লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভর্গদেব দক্ষিণদিকে ও প্রভু নীলাচলের দিকে চলিলেন।

নর্ম্মদার ধারে ধারে প্রভু চলিয়াছেন। সঙ্গে রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণ। দোহদ নগর ত্যাগ করিয়া কুক্ষি নগরে অনেক বৈষ্ণবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে দুটী ভক্তকে বিশেষরূপে কৃপা করিয়া ক্রমে বিন্ধ্যাচলে উঠিয়া মন্দুরা নগরে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে তিন দিনে দেবঘর আসিয়া আদিনারায়ণ নামক

এক কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করেন। দেবঘর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানী নগর। দুই দিনে সেই স্থানে পৌছিয়া উহার পূর্ব্বভাগস্থ মহলপর্ব্বত দিয়া চণ্ডীনগরে আসিয়া চণ্ডীদেবী দর্শন করিলেন।

অতঃপর রায়পুর দিয়া অবশেষে বিদ্যানগরে রামনন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইলেন।

রামানন্দ যাইয়া চরণে পড়িলে, প্রভু তাঁহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া নগরে মহা কলরব হইল; লোকে নানারূপ উৎসব করিতে লাগিল। প্রভু তখন বলিলেন, "রাম রায় এখন নীলাচলে চল।" রাম রায় বলিলেন, "প্রভু তোমার আজ্ঞা পাইয়া আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমা হইতে আর বিষয়-কর্ম্ম হইবে না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়াছি। এখানে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমার মহা সমারোহের সহিত যাইতে হইবে। আমার সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, সৈন্য যাইবে, অতএব আপনি অগ্রে গমন করুন। আমি দিন দশেকের মধ্যে সমুদায় গোছাইয়া আপনার পশ্চাৎ আসিতেছি।

তখন প্রভু নীলাচল মুখে চলিলেন। মহানদীর তীরস্থ রত্নপুরে আসিলেন, এবং মহানদীর পূর্ব্বদিক দিয়া গমন করিয়া স্বর্ণগড়ে উপনীত হইলেন। রত্নপুরের রাজা শান্তীশ্বর পরম ধার্ম্মিক। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রভুকে ভূমি লোটাইয়া প্রণাম করিলেন, এবং প্রভু তাঁহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তৎপর সম্বলপুর দিয়া ভ্রমরানগর, প্রতাপনগর, দাসপালনগর উদ্ধার করিয়া রসালকুণ্ডেতে আসিলেন। এখানে কোন পাষণ্ড মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ

প্রভুকে মারিতে উদ্যত হয়; কেন না, তিনি তাহার পুত্রকে স্পর্শ করিয়া পরমভক্ত করিয়াছিলেন। পুত্রের আকিঞ্চনে প্রভু পরে মাড়ুয়া ব্রাহ্মণকে কৃপা করেন। শেষে ঋষিকুল্যা নামক স্থান পবিত্র করিয়া প্রভু আলালনাথের কাছে উপস্থিত হইলেন।

নীলাচলের এক দিবসের পথ থাকিতে প্রভু ভৃত্যদ্বারা অগ্রে আপন আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। প্রভুর ভক্তগণ বসিয়া আছেন, সকলেরই গৌরগত-প্রাণ, কিন্তু গৌর নাই। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রভু আসিতেছেন, আসুন।" ভৃত্য তাঁহাদিগকে এই সংবাদ দিয়া সার্ব্বভৌমকে এই সংবাদ দিতে চলিলেন। সকলে অমনি আনন্দে ডগমগ হইলেন ও নাচিতে নাচিতে চলিলেন; কিন্তু যাইবেন কি? এক সময়ে নৃত্য করা আর গমন করা সহজ কথা নয়, তাঁহারা নৃত্য করিবেন, না গমন করিবেন?

প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ, দমোদরপণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ॥—চরিতামৃত।

কিন্তু প্রভুকে আনিতে অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তগণও চলিলেন। যখন তিনি শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিলেন, তখন সঙ্গে পঞ্চজন ভক্ত ব্যতীত আর কাহাকেও আসিতে দিলেন না। প্রভু দেশ ছাড়িলে, কোন কোন ভক্ত আর গৌরশূন্য দেশে থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগদাধর, শ্রীনরহরি, শ্রীমুরারি, শ্রীভগবান (ইনি খঞ্জ), শ্রীরাম ভট্ট, প্রভৃতি নীলাচলে দৌড়িলেন। ইহাঁরা প্রায় সকলেই নবীন ব্রহ্মচারী। নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন যে, প্রভু দক্ষিণে গমন করিয়াছেন। ইহাতে আশা ভঙ্গ হইয়া তাঁহারা মৃত্যুবৎ

অবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত প্রভুর প্রতিক্ষায় সেখানে রহিয়া গেলেন।

সার্ব্বভৌম শুনিলেন প্রভু আসিতেছেন, আর সেই লোকমুখেই শুনিলেন ভক্তগণ তাঁহাকে আনিতে ছুটিয়াছেন। তখন তিনি কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান নীলাচলে আসিতেছেন, তাঁহাকে একটু আদর করিয়া আনা উচিত। আর এখন ভয় কি? রাজা টের পাইয়াছেন, আর এক প্রকার নবীন সন্ন্যাসীর নিজ-জন হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম নিশ্যন, পতাকা, খোল, করতালের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। পুরীময় রাষ্ট্র হইল 'সার্ব্বভৌমের সন্ন্যাসী' আসিতেছেন। সকলে শুনিয়াছেন স্বয়ং মহারাজা সেই সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। সুতরাং প্রভুকে আনিবার নিমিত্ত খোল করতাল ডঙ্কা ইত্যাদির সহিত বহুতর লোক চলিলেন। ইহারা পূর্ব্বে প্রভুকে কখন দেখেনও নাই।

বহু দিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ পাইয়া প্রভুর বদন অতি প্রফুল্ল হইল। সার্ব্বভৌম সমুদ্রধারে প্রতুকে পাইলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে রোদন করিয়া পড়িলেন, প্রভু উঠাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ৯ম :—

গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ্ পাঞা॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে॥
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে॥

প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে॥

শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ প্রণাম করিলেন। তাঁহারা জগন্নাথের সেবক শুনিয়া, প্রভু জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন যে, শ্রীজগন্নাথের সেবক সকলেরই প্রণামের পাত্র। ইঁহারা তাঁহাকে প্রণাম করেন ইহাতে তাঁহার ভয় হয়। প্রভু তখন সর্ব্বসমেত শ্রীমন্দির দর্শনের নিমিত্ত গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ তখন স্নান করিতেছেন, তখন তাঁহার দর্শন নাই, ইহাতে সেবকগণ একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সার্ব্বভৌমকে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। একদিনকাল প্রভু বিনা অনুমতিতে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডাগণের বিষম ক্রোধের ভাজন হইয়াছিলেন। এখন সেই পাণ্ডাগণ, যদিও তাঁহারা প্রভুর মহিমা প্রত্যক্ষ কিছু দেখেন নাই, তবু তাঁহাকে জগন্নাথের স্নানের নিমিত্ত তদ্দণ্ডে দর্শন করাইতে পারিবেন না বলিয়া ব্যস্ত হইলেন। প্রভু এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত দর্শন সুখে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া মনে বড় ব্যাথা পাইলেন। কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া বলিলেন যে, স্নান পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন।

গোপীনাথ সার্ব্বভৌমকে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দর্শনের পরে প্রভুকে কোথায় লইয়া যাওয়া যাইবে। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "অদ্য আমার ওখানে, আর কল্য তাঁহার বাসায়—কাশী মিশ্রের আলয়ে।" তাহার পরে প্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু, মহারাজা আপনার বাসা স্বয়ং ঠিক করিয়া দিয়াছেন। সে কাশী মিশ্রের বাড়ী। সেখানে স্থান বিস্তর আছে। আবার উহা শ্রীমন্দির ও সমুদ্রের নিকট, পরম নির্জ্জন ও কুসুম কাননে সুশোভিত।"

সার্ব্বভৌম এইরূপে রাজার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রথম দর্শন

হইতেই দৌত্যকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কপাট উৎঘাটিত হইলে প্রভু দর্শন সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে সুখ কিরূপ তাহা এখানে বর্ণনা করিতে পারিলাম না। বহু জনতা দেখিয়া প্রভু হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলেন। পাণ্ডাগণ, প্রসাদী মালা ও চন্দন আনিয়া প্রভুকে অর্পণ করিলেন। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে প্রভুর সহিত পরিচিত হন, আর সেই আবেদন সার্ব্বভৌমের নিকট জানাইলেন। সার্ব্বভৌম তাহাদিগকে পর দিবস প্রত্যুষে কাশী মিশ্রের বাটীতে যাইতে বলিলেন। বলিলেন, "কল্য প্রাতে আমি প্রভুকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইব। তোমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিও। একে একে তোমাদের সকলের সহিত প্রভুর মিলন করাইয়া দিব।" সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। তিনি পূর্ব্বেই আপনার বাড়ী প্রভুর অভ্যর্থনার নিমিত্ত ধৌত, পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র ষাটী ও চন্দনেশ্বরের মাতা অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের ঘরণী হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে অন্যান্য মঙ্গলসূচক আনন্দধ্বনি ও কলরব হইতে লাগিল। প্রভু ভক্তগণ লইয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন। এ দিকে সার্ব্বভৌম চব্যচোষ্য প্রভৃতি অতি উপাদেয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রভু হাস্যকৌতুকে ভক্তগণের সহিত নানারূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম আপনি পরিবেশন করিলেন, এবং আপনার সাধ মিটাইয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনে সিক্ত করিয়া গলায় ফুলের মালা দিয়া উত্তম শয্যায় শয়ন করাইলেন।

এইরূপে প্রভু দুই বৎসর পরে, উত্তম বস্তু সেবন এবং উত্তম শয্যায় শয়ন বরিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভু, নিজ জনের মনে ব্যথা

দিবেন এই ভয়ে সন্ন্যাসের যে সকল নিয়ম তাহা তাঁহাদের নিকট থাকিলে পালন করিতেন না।

সার্ব্বভৌম মনে ভাবিলেন যে, প্রভু দুই বৎসর হাঁটিয়া বেড়াইয়াছেন, অতএব তাঁহার শ্রীপদে ব্রণ হইয়া থাকিবে। অদ্য তিনি স্বহস্তে তাঁহার পদ-সেবা করিয়া আপনার মনের ও প্রভুর শ্রীচরণের দুঃখ দূর করিবেন। ইহাই ভাবিয়া প্রভু শয়ন করিলে, তাঁহার পদতলে বসিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অতি কাতর বদনে তাঁহাকে উহা করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ ভট্টাচার্য্য শুনিলেন কিনা জানি না। কিন্তু প্রভুর পদতলে বসিয়া সার্ব্বভৌম দেখিলেন যে, পদতল দুটীতে ব্রণের চিহ্ন মাত্র নাই, বরং উহা পদ্মফুলের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভু মলিন কৌপীন ধারণ করিলে কি ধূলায় ধূসরিত হইলেও, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দিয়া অনুক্ষণ পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। এমন কি, শুদ্ধ সেই গন্ধের লোভে, কেবল মনুষ্য নহে, পশু পক্ষী ও কীট পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইত। প্রভু জীবের দুঃখনাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাঁটিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের সাধনবলে তাঁহার পদতল চিরদিনই সমান মনোহর ; সে এত মনোহর ছিল যে পদতল দেখিলেই বুঝা যাইত যে, ইহা সামান্য মনুয্যের পদতল নহে।

সার্ব্বভৌম শ্রীপদ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তাঁহার মনের দুঃখ ও ভ্রম দূর হইল ; ভাবিলেন, পৃথিবী যাঁহার বিচরণে ধন্যা, তিনি তাঁহার শ্রীপদে আঘাত কেন করিবেন ? সার্ব্বভৌম প্রভুর আজ্ঞাক্রমে প্রসাদ পাইতে চলিলেন, তখন প্রভু একটু নিদ্রা গেলেন। তাহার পরে সারা নিশি প্রভু নির্জ্জনে ভক্তগণ লইয়া তীর্থযাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন ; বলিতেছেন, "দক্ষিণদেশে নানারূপ বিগ্রহ দেখিলাম,

মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, শৈব প্রভৃতি বহুবিধ সাধু দেখিলাম। বৈষ্ণব বড় দেখিলাম না। যাহা দেখিলাম তাহাদের মধ্যে তোমাদের মত একজনকেও দেখিতে পাইলাম না। তবে এক রামানন্দ রায় আমাকে সুখ দিয়াছেন। পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত আর দেখি নাই।

সার্ব্বভৌম অমনি বলিলেন, "তাই প্রভু তোমাকে তাঁহার সহিত মিলিতে বলিয়াছিলাম। অগ্রে যখন তিনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণকথা কি রসতত্ত্ব শুনাইতেন, তখন না বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতাম। কিন্তু তুমি যখন আমার বৃথা জ্ঞানরূপ অজ্ঞানতা দূর করিলে, তখনি তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিলাম।"

প্রভু বলিতেছেন, "সাধকেরা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির নিমিত্ত নানা পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, রামানন্দের মতই সর্ব্বোত্তম। তাই আমি তাঁহার মত অবলম্বন করিয়াছি।"

এইকথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাসিয়া উঠিলেন; বলিতেছেন, "রামানন্দ আর মত-কর্ত্তা হইতে পারেন না। তুমি তাঁহার কাছে শিক্ষা করিয়াছ, এ কথা তুমি যাহাকে দেখ তাহার কাছেই বলিয়া থাক। তবে বুঝিলাম যে, জগতে রামানন্দ রায়ের দ্বারা রসতত্ত্ব প্রচার করিবে।"

প্রভু বলিতেছেন, "দক্ষিণদেশে আর দুটি উপাদেয় বস্তু পাইয়াছি। সে দুই খানি গ্রন্থ,—ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। রামানন্দের কাছে যে মত শুনিলাম, এই দুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলাম। রামানন্দ এই দুই গ্রন্থ লিখাইয়া লইয়াছে। আমি উহা আনিয়াছি, লিখাইয়া লইব।

এইরূপে ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থকার বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের বিষয় এখন সকলে অবগত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ জগতে দুর্ল্লভ।

প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে যে কয়েক খানি গ্রন্থ সর্ব্বপ্রধান, সেই কয়েক খানি মহাগ্রন্থের নাম করিতেছি; যথা—জয়দেব, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শকুন্তলা, আর রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক।

শকুন্তলার নাম ইহার মধ্যে করিতাম না, কিন্তু যাঁহারা রসিক ভক্ত, তাঁহারা এই মহা-নাটকেতে কেবল কৃষ্ণলীলা আস্বাদ করিয়া থাকেন।

পর দিবস প্রাতে সার্ব্বভৌম প্রভুকে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশীমিশ্রের আবাসে লইয়া গেলেন। সেখানে কাশীমিশ্র গললগ্নবাস হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সে বাড়ীটী সর্ব্বপ্রকারে মনোমত। বাড়ীতে কয়েক খানি ঘর, মিশ্র মহাশয় সংস্কার ও ধৌত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। প্রভু আগমন করিবামাত্র কাশীমিশ্র চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আমার এই গৃহ গ্রহণ করুন্, আর সেই সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

কাশীমিশ্র মহারাজের গুরু। যখন মহারাজা পুরীতে আগমন করেন, তখন কাশীমিশ্রকে ভোজন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিয়া ও তাঁহাকে নিদ্রিত করাইয়া আপনি ভোজন ও আরাম করেন।

কাশীমিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার পরিচয় দিয়া দিলেন; বলিলেন, মহারাজ তোমার থাকিবার নিমিত্ত এই বাসা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। তোমার যোগ্য বাসা সন্দেহ নাই। এখন ইহা আপনি গ্রহণ করেন, ইহা কাশীমিশ্রের ও আমাদের সকলের নিতান্ত বাসনা।"

প্রভু কাশীমিশ্রকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিলেন, "এ দেহ তোমাদের, তোমরা যাহা বল সেই আমার কর্ত্তব্য।"

প্রভুর আলিঙ্গন পাইবামাত্র কাশীমিশ্র বিহ্বল হইলেন; দেখিলেন, প্রভু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। কাশীমিশ্র চিরদিনের নিমিত্ত প্রভুর হইলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

কাশীমিশ্র আসি পড়ে প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্ম তারে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভূজ মূর্ত্তি তারে দেখাইলা।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈলা॥

প্রভু আপনার বাসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কাশীমিশ্র বহির্বাটীর পীড়ায় দিব্যাসনে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইলেন। প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে সার্ব্বভৌম বসিলেন। তখন পূর্ব্বদিনের কথা অনুসারে শ্রীনীলাচলবাসী ভক্তগণ এবং জগন্নাথের-সেবকগণ প্রভুর সহিত মিলিত হইতে আসিলেন।

তাঁহারা জনে জনে প্রভুকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভু হাহাকার করিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসী সকলেরই প্রণম্য; সন্ন্যাসীর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কাজেই প্রভু উঠিয়া প্রত্যেককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। যিনি যখন প্রণাম করিতেছেন, সার্ব্বভৌম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছেন; বলিতেছেন, ইনি পরীক্ষা মহাপাত্র, এই শ্রীমন্দিরের কর্ত্তা। ইনি জনার্দ্দন মহাপাত্র, শ্রীজগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবা করিয়া থাকেন। ইনি কৃষ্ণদাস, ইহাঁর কার্য্য সুবর্ণ বেত্র ধরিয়া শ্রীজগন্নাথের প্রহরীর কার্য্য করা। ইনি শিখি মাইতি, ইনি কায়স্থ ও লিখনাধিকারী, আর ইহার দুই ভ্রাতা মুরারি ও মাধবী। ইনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরম বৈষ্ণব। ইনি প্রহরিরাজ মহাপাত্র, ভাগবতোত্তম। সার্ব্বভৌম এইরূপে শ্রীজগন্নাথের প্রধান প্রধান সেবকগণকে

প্রভুর সহিত মিলন করিয়া দিতেছেন। এমন সময় মহারাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চন্দনেশ্বর, মুরারি ও হংসেশ্বর,—এই তিনজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদিও ইহাঁরা রাজপাত্র, তথাপি মহাভক্ত। ইহারা আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলে, সার্ব্বভৌম ইঁহাদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

এমন সময় চারিপুত্রের সহিত ভবানন্দ রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ ও তাঁহার পুত্রগণ প্রভুকে প্রণাম করিলে, সার্ব্বভৌম পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, "ইঁনি ভবানন্দ রায়; রামানন্দ রায় ইহার প্রথম পুত্র, আর এই চারিজন রামানন্দের ভ্রাতা। এই কথা শুনিয়া প্রভু মহা আনন্দিত হইয়া বৃদ্ধ ভবানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন; বলিতেছেন, "তুমি রামানন্দের পিতা? তোমার মত ভাগ্যবান ত্রিজগতে আর নাই। রামানন্দ যাঁহার পুত্র তাঁহার আর অভাব কি?" ভবানন্দ রায় তখন করযোড়ে বলিলেন, "আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম। আমাকে যে তুমি স্পর্শ কর, ইহা কেবল তুমি শ্রীভগবান বলিয়া। তোমার কাছে ছোট বড় সবই সমান।

নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে।
আত্ম সঁপিলাম আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রবে তোমার চরণে॥
যবে যে আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে॥—চরিতামৃত

এইরূপে ভবানন্দ রায় আপন পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে প্রভুর কাছে রাখিলেন। তাঁহার কার্য্য হইল ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রভুর সেবা করা।

প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এই সংবাদ নবদ্বীপে পাঠাইবার জন্য ভক্তগণ বড় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু প্রভুর বিনা অনুমতিতে তাহারা কিছু

করিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দ তাহাই প্রভুকে জানাইলেন যে, শচী মা ও ভক্তগণ বড় ব্যস্ত আছেন। প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ পাইলে নবদ্বীপবাসীরা সজীব হইবেন। অতএব, "প্রভু আজ্ঞা করুন, নবদ্বীপে তোমার আগমন সংবাদ পাঠাই।" প্রভু "পাঠাও" বলিলেন না; বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিরুচি তাহাই কর।" প্রভু দুই বৎসর পূর্ব্বে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন, এবং আবার একাদশ মাস পরে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রীনবদ্বীপের লোকে চৈত্র মাসে পাইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভু ইচ্ছা করিয়া অলৌকিক কোন কার্য্য করিতেন না। কিন্তু তবু এইরূপ অলৌকিক কার্য্য সকল অনবরত যেন আপনাপনি তাঁহার সহিত বিচরণ করিত। প্রভু যে মাত্র নীলাচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে তাঁহার এই লীলার সহকারীগণ বিনা সংবাদে নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন। প্রভু শীতের শেষ মাসে নীলাচলে আসিলেন, আর দুই চারি সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চিরসঙ্গীগণ, আপনি আপনি তাঁহার চরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে কয়েক স্থানে বলিয়াছি যে, এই গৌর অবতারে "পাত্র" কেবল সাড়ে তিনজন। অর্থাৎ—স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি ও মাধবী দাসী। শিখি মাহাতি ও মাধবীর কথা এই মাত্র উপরে বলিলাম। রামানন্দের কথা শুনিয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের কথাও বারম্বার পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই স্বরূপ দামোদর এখন নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন, প্রভু প্রকাশ পাইলেই তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন; কিন্তু সে গোপনে।

তিনি যে প্রভুর এক জন, কি বিশেষ এক জন, তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না। সে কেবল তিনি জানিতেন, আর প্রভু জানিতেন। শ্রীপ্রভুর লীলাঘটিত যত গুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট বড় শত শত ভক্তের নাম উল্লেখ করা আছে, কিন্তু পুরুষোত্তম আচার্য্যের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। শ্রীমহাপ্রভুর অবতারের পরে মহাজনের লক্ষ পদ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল একটীতে পুরুষোত্তমের নাম পাইয়াছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারানসী গিয়া॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ-প্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ-প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করেন পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ॥

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥

পুরুষোত্তম আচার্য্য শ্রীনবদ্বীপে গোপনে বাস করেন, অন্তরঙ্গ সেবা করেন, রস লইয়া থাকেন, হৈ চৈ হইতে দূরে পলায়ন করেন; সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য প্রভু ব্যতীত আর প্রায় কেহ জানিতেন না। পুরুষোত্তম প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ!" প্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভুর উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, যেখানে প্রভুর নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই, যেখানে সাধুগণ ভক্তিধর্ম্মের বিরোধী, সেই বারাণসী নগরে পলায়ন করিলেন; করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সেখানে তাঁহার নাম হইল স্বরূপ দামোদর। এই স্বরূপ প্রভুকে কেবল যে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন তাহা নহে, প্রভুর তত্ত্ব তিনিই প্রথম তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রেমের শক্তি দেখুন, অকৈতব প্রেমের সূক্ষ্মগতি অনুভব করুন। পুরুষোত্তম প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন; অথচ তাঁহার উপর রাগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, চলিয়া গেলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের উপর যে রাধার প্রেমজনিত মান উহা যে অসম্ভব নয়, তাহা স্বরূপ কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন।

এই স্বরূপ চিরদিন নীলাচলে প্রভুর সহিত বাস করিয়াছিলেন; শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, সুখে দুঃখে, প্রভুর সহিত থাকিতেন।

এই স্বরূপ, দাসরূপে প্রভুর সেবা করিতেন, সখারূপে তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী হইতেন, মাতারূপে তাঁহাকে পালন করিতেন। প্রভুকে যত্ন করিয়া আহার করাইতেন, শয্যায় শয়ন করাইতেন ও নানারূপে রক্ষা করিতেন। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সেবার নিমিত্ত স্বরূপের প্রয়োজন হইত; আর প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহাকে পাওয়া যাইত। প্রভু শয্যায়

যাইতেছেন না; রজনী অধিক হইতেছে, প্রভু নামজপ করিতেছেন, কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিদ্রা যাইবেন না। কিন্তু শরীর অতি দুর্ব্বল, একটু নিদ্রা না গেলে শরীর থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া স্বরূপ নানারূপ সাধ্যসাধনা করিতেছেন; বলিতেছেন, "প্রভু চলুন, অধিক রজনী হইয়াছে।" শ্রীনবদ্বীপে শচী তাঁহার নিমাইকে ঐ সেবা করিতেন। প্রভু যাইবেন না, স্বরূপও ছাড়িবেন না। তখন প্রভু স্বরূপকে খোসামোদ আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "স্বরূপ! একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি যাইতেছি।" কিন্তু স্বরূপ! রাত্রি ত অধিক হয় নাই, আমাকে আর একটু কৃষ্ণনাম করিতে দাও, তোমাকে মিনতি করি।" কি, "স্বরূপ! আমার নিদ্রা আসিতেছে না, শয়ন করিয়া কি করিব?" কি, একেবারে ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! আমি শয়ন করিব কিরূপে? কৃষ্ণ এখনই আসিবেন, আমি তাই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া আছি।"

প্রভু যাহাই বলুন, স্বরূপের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কোন প্রকারে স্বরূপ প্রভুকে শয্যায় লইয়া গেলেন, প্রভু শয়ন করিলেন। স্বরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, থাকিয়া প্রভু কি করেন তাহাই জানিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া রহিলেন। দেখেন যে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া, প্রভু আবার চুপে চুপে নামজপ করিতেছেন। তখন স্বরূপ আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন, আর প্রভু দেখিলেন যে ধরা পড়িয়াছেন, অমনি ভয়ে তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল। স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, ভক্তগণকে দুঃখ দিতে তোমার একটুও কষ্ট হয় না? ভাল, তোমার যেন নিদ্রা নাই, কি কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ সুখ ত্যাগ করিয়া

নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমরা ত সামান্য জীব? আমাদের ত দেহধর্ম্ম আছে? আমরা একটু নিদ্রা না গেলে বাঁচিব কিরূপে?"

প্রভু অতিশয় লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "স্বরূপ! ক্ষমা দাও, আমি এখনি নিদ্রা যাইতেছি।" প্রভু ও স্বরূপে নিতি নিতি এইরূপ কাণ্ড হয়।

প্রভু, কৃষ্ণ বিরহে কি মিলনে, যে ভাবে বিভাবিত হয়েন, তাহা স্বরূপের গলা ধরিয়া কান্দিয়া বলেন।

প্রভু, কৃষ্ণবিরহে রাই-উন্মাদিনী ভাবে বিভাবিত হইলেন। অমনি স্বরূপ তাঁহার নিকট ললিতা-রূপে প্রকাশ পাইলেন। প্রভু স্বরূপকে ললিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রভু স্বরূপের গলা ধরিয়া মন উঘাড়িয়া মনের বেদনা বলিতেছেন, আর স্বরূপও তখন সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রস আস্বাদন করিতেছেন।

প্রভু যখন রাধারূপে কৃষ্ণদর্শনে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, স্বরূপ তখন ললিতা-রূপে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্রভু যখন কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, স্বরূপ তখন প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহাকে চেতন করাইতেছেন। প্রভুর চিত্ত ও স্বরূপের চিত্ত এক হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে ভাবে বিভাবিত হইলেন, স্বরূপ অমনি আপনা আপনি, সেই ভাবে বিভাবিত হইলেন। প্রভুর বিরহ ভাব উপস্থিত, স্বরূপ অমনি আপনা আপনি বিরহের পদ গাইয়া প্রভুকে শান্ত করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি প্রভুর "দ্বিতীয় স্বরূপ" নামে অভিহিত হন।

প্রভু ও স্বরূপ দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া, এক চিত্ত হইয়া, প্রেমের যে নিবিড় মালঞ্চ, তাহাতে দিব্যচক্ষে দ্বাদশবর্ষ বিচরণ করিযাছিলেন। চন্দ্রোদয় নাটককার স্বরূপকে এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

অহো রস ফলবান কৃষ্ণ ভগবান।
তার রসাচার্য্য ভাব হইতে মূর্ত্তিমান॥
সন্ন্যাসীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া।
অবতীর্ণ হৈল লোক কৃপা যুক্ত হইয়া॥
সর্ব্বলোক দামোদর স্বরূপ বলেন।
প্রেম হইতে অপৃথক তাঁহারে মানেন॥

প্রভু গদগদ হইয়া কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। প্রভু, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কত ভালবাসা, তাহা বর্ণনা করিতেছেন, স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন। সেই গোলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, সেই দুর্ল্লভ সুধা,—যাহা চিরদিন জীবের নিকট গুপ্ত ছিল,—তাহা ভোগ করিবার প্রধান অধিকারী স্বরূপ।

প্রভু দ্বাদশবর্ষ, গোপনে, এই সমুদায় ব্রজের রস নিঙ্গড়াইয়া সুধা বাহির করিলেন। স্বরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইলে, প্রভুর অবতার বৃথা হইয়া যাইত। সুতরাং স্বরূপ সেই সুধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্য উহা চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন।

এই সুধা কি, না ব্রজের নিগূঢ়-রস। এই রস বাহির করিতে আমাদের প্রভুর ন্যায় বস্তুর দ্বাদশবর্ষ লাগিয়াছিল। এই রসের চর্চ্চা জনতার মধ্যে হইত না। তাই প্রভু আপনার কুটীরে, রজনীতে, স্বরূপের গলা ধরিয়া, উহা উদ্গীরণ করিলেন। স্বরূপ এই সমুদায় ভাব তাঁহার কড়চায় লিখিয়া রাখিলেন, আর সঙ্গীত দ্বারা উহার জীবন্ত আকার দিলেন।

স্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম। এখন যে উন্মাদকারী কীর্ত্তনের সুর শুনা যায়, স্বরূপ, প্রভুর কৃপা পাইয়া, তাহা সৃষ্টি করেন। শুধু সুর

নয়, তালও বটে। এইরূপে দশ সহস্র মহাজনের পদের স্থষ্টি হইল।

স্বরূপ যদি প্রভুর সহিত দ্বাদশবর্ষ বাস না করিতেন, তবে প্রভু যে এত দিন কি করিয়াছিলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিত না।

স্বরূপ রাগ করিয়া কাশীতে চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাস লইলেন। গুরু বলিলেন, বেদ পড়, কিন্তু স্বরূপের বেদ পড়িতে ব'য়ে যাইতেছে। তিনি গোপনে গৌররূপ ধ্যান করেন, আর রোদন করেন, শেষে আর থাকিতে পারিলেন না। শুনিয়াছেন, প্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গিয়াছেন, আর তাঁহার তল্লাসের নিমিত্ত কাশী হইতে নীলাচলে ছুটিলেন। নীলাচলে আসিয়া শুনিলেন, প্রভু কয়েক দিন মাত্র দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভু কাশীমিশ্রের আলয়ে ভক্তগণ লইয়া বসিয়া নামজপ করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ আসিলেন, আসিয়া প্রভুর দ্বারের আগে দাঁড়াইলেন। গোপীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, ত্বরিত প্রভুর নিকট গমন করিলেন, করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। বলিলেন, "শ্রীনবদ্বীপের পুরুষোত্তম আচার্য্য এখন অবধূত বেশে আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

প্রভুর চন্দ্রবদন আনন্দে প্রফুল্ল হইল। তাঁহাকে আনয়ন কর না বলিয়া, আপনিই অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আনিতে চলিলেন।

উভয়ে যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন উভয়ের মধ্যে প্রীতির স্থষ্টি হয়। এখন উভয়ে সন্ন্যাসী, মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ের নয়নে নয়ন মিলিত হইল।

স্বরূপের বুক দুর্‌দুর্ করিতেছে, তবু কষ্টেশ্রেষ্টে এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া চরণে পড়িতে গেলেন। যথা—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধি, তব দয়া সাধ্যাবধি,
মোরে হও আনন্দ উদয়া।
মাধুর্য্য মর্য্যাদা যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই,
সে মাধুর্য্য মর্য্যাদা বিশদা।
খেদকে কাঁপায় হৈলে, রস দেই সর্ব্বকালে,
আমোদ উন্মীলে তাহে সদা॥
যাহা হতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ,
মাধুর্য্য মর্য্যদা মত্তা অতি।
নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়,
শ্রীকৃষ্ণচরণে দেই রতি॥
হেন দয়া মোরে কর, এত বলি দামোদর,
প্রভুর নিকটে চলি যায়।

স্বরূপ চরণে পড়িতে গেলে প্রভু তাঁহাকে দুই বাহু দ্বারা ধরিলেন, আর দুই জনে এলাইয়া পড়িলেন। উভয় উভয়কে ভুজলতায় বন্ধন করিয়া অচেতন হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন।

ভক্তগণ স্থিরনয়নে দেখিতেছেন। অনেকক্ষণ পরে উভয়ের চেতন হইল, উভয়ে উঠিয়া বসিলেন। তখন সেখানে বসিয়াই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। প্রভু বলিতেছেন, "তুমি যে আসিবে তাহা কল্য আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি। আসিয়া বড় ভাল করিয়াছ। তোমা বিনা আমি অন্ধ ছিলাম, এখন আমি দুই চক্ষু পাইলাম।

স্বরূপ বলিতেছেন, "প্রভু, আমি আপনি আসি নাই, তোমার কৃপা-পাশে আমাকে বান্ধিয়া আনিয়াছ। আমি অতিশয় অধম তাই তোমাকে ছাড়িয়া দূর দেশে গিয়াছিলাম। তোমার চরণে যদি লেশ মাত্র প্রেম থাকিত তবে আমি আর যাইতে পারিতাম না।" স্বরূপ তখন শ্রীনিত্যানন্দকে ও পরমানন্দপুরীকে প্রণাম করিলেন ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। প্রভু স্বরূপকে একখানি ঘর ও তাঁহার সেবার নিমিত্ত একজন কিঙ্কর দিলেন।

এই যে পরমানন্দপুরীর কথা বলিলাম, ইঁহার মাহাত্ম্যের কথা কিছু বলিব। ইঁহাতে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপের শক্তি ছিল! ইনি ত্রিহুত নিবাসী, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, অতএব ঈশ্বরপুরীর পরমার্থ ভাই, আর তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের অংশী। দেখিতে পরম সুন্দর, প্রকৃতি অতি মধুর, ভারত-বিখ্যাত সুখ্যাতি। প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন। যদিও তখন দেশে মুসলমান ও হিন্দু যুদ্ধে ছারেখারে যাইতেছে এবং উহাতে সমস্ত রাজপথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তবুও শ্রীগৌরাঙ্গের কথা তখন সমস্ত ভারতে প্রচার হইতেছে। পরানন্দ-পুরী প্রভুর কথা শুনিবা মাত্র তাঁহাতে আকৃষ্ট হইলেন। শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের যে কৃষ্ণ-প্রেম তাহার এক কণা তাঁহার গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর ছিল না। তাঁহার যেরূপ প্রেম তাহা জীবে সম্ভবে না। আরও শুনিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং—তিনি। শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং তিনি, পরমানন্দ ইহা কতক বিশ্বাস করিলেন। আবার তাঁহার সমুদায় কাণ্ড শুনিয়া তাহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে তাঁহাকে খুজিতে বাহির হইলেন। শুনিলেন, তিনি দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন; তাই তীর্থভ্রমণ ছল করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। সেখানে

শুনিলেন, প্রভু উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন আবার উত্তরে আসিতে লাগিলেন। শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানেই থাকুন, সম্ভবতঃ শ্রীনবদ্বীপে গমন করিলে তাঁহার ঠিকানা জানিতে পারিবেন; ইহাই ভাবিয়া একেবারে নবদ্বীপে আসিলেন। নবদ্বীপে কেন, একেবারে শ্রীশচীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীর তখন যত কুটুম্বিতা তাহা সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সন্ন্যাসী মাত্রকেই আদর করেন। এখন আর সন্ন্যাসীকে তাঁহার ভয় নাই, তাঁহাদের যাহা করিবার তাহা তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কোন সংবাদ পান না। তাই নিমাইকে তল্লাস করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন, আর বলেন যদি তাঁহার সহিত দেখা হয়, তবে আমাদের দুর্দ্দশার কথা বলিবে, আর একবার আমাকে দেখা দিয়া যাইতে বলিবে।

পরমানন্দপুরীকে দেখিয়া শচীর বোধ হইল যেন বিশ্বরূপ আসিয়াছেন। ফল কথা, শচী তখনও জানেন না যে বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। পুরী ভাবিলেন, শচীর নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের সংবাদ পাইবেন; আর শচী ভাবিলেন, পুরীর নিকট নিমাইয়ের সংবাদ পাইবেন। কিন্তু উভয়ের আশা ভঙ্গ হইল। তবে পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভুর লীলার মধ্যে পদে পদে অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হইত। পরমানন্দপুরী শচীর বাটী আসিলেন। শচী ও তিনি প্রভুর সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রেরিত লোক নীলাচল হইতে সংবাদ আনিলেন যে, প্রভূ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐ সংবাদে আনন্দ কলরব উঠিল। সকলেই নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে সাজিলেন। ভক্তগণের মধ্যে গমনোপযোগী আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু পরমানন্দপুরীর দেরি সহিল না, তিনি

কমলাকান্ত নামক প্রভুর জনৈক ব্রাহ্মণ-ভক্তকে সঙ্গে করিয়া, শচীর নিকট বিদায় লইয়া, নীলাচল মুখে দৌড়িলেন।

শ্রীক্ষেত্রে ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শনের নিমিত্ত গমন করেন। কিন্তু ভক্তোত্তম পরমানন্দ, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন। শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ মন্দির তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন শ্রীজগন্নাথকে মনে পড়িল। ইহাতে পুরী অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন। ভাবিতেছেন, "এ আমি কি করিলাম?" ভক্তগণের ঠাকুর জীবন্ত সামগ্রী। পুরী ভাবিতেছেন যে, শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অগ্রে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন না করিয়া এ কি কুকার্য্য করিলেন? শ্রীজগন্নাথকে অবমাননা করিলেন? তখন করযোড়ে শ্রীমন্দিরের দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, যথা চন্দ্রোদয় নাটকে,—

আগে না দেখিয়া প্রভু তোমার চরণ।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে করি অন্বেষণ॥
ইথে মোর যদ্যাপি হইল অপরাধ।
তাহা ক্ষমি জগন্নাথ করিবে প্রসাদ॥
তুমি সে সর্ব্বজ্ঞ, জান সবার অন্তর।
মোর উৎকণ্ঠার কথা তোমার গোচর॥
উৎকণ্ঠাতে লয়ে যায় কি করিব আমি।
ইহা জানি মোর অপরাধ ক্ষম তুমি॥

মন্দির পানে চাহিয়া শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন মন্দিরের নিকট জনতা হইয়াছে। ইহাতে আপনা-আপনি একটু অগ্রবর্ত্তী হইলেন। আবার দেখিলেন, সম্মুখে লোক সমূহ, আর মধ্যস্থানে একটী সন্ন্যাসী বসিয়া। সন্ন্যাসী অতিশয় দীর্ঘাঙ্গ বলিয়া সবার উপরে তাঁহার মস্তক দেখা যাইতেছে।

দেখিলেন, সমুদয় লোকের দৃষ্টি এই সন্ন্যাসীর উপর রহিয়াছে। দেখিলেন, সন্ন্যাসীর অঙ্গের বর্ণ বিমল হেমের ন্যায় উজ্জ্বল। আর একটু নিকটে যাইয়া দেখিতেছেন, সন্ন্যাসীটী অল্পবয়স্ক। আর দেখিলেন যে, তাঁহার অতুলনীয় রূপ। শুনিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ অমানুষিক, তাই যুবক-সন্ন্যাসীটীকে দেখিয়া ভাবিতেছেন, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ,—তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরী গোসাঞি, প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন তাহা চন্দ্রোদয় নাটক এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

দেখিলাম মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
জগন্নাথ দেখি বসিয়াছেন অতি রঙ্গে॥
জগন্নাথ রূপ গুণ কহিতে কহিতে।
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে শতে শতে॥
হেন মণি শিলা বিলাসিত বক্ষঃস্থল।
তাহা বাঞা পড়িছে আনন্দ অশ্রুজল॥
আপাদ মস্তক সব পুলকে বেষ্টিত।

শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পুরী গোসাঞির মনে যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা গেল, তিনি বুঝিলেন যে এরূপ চিত্তাকর্ষণ, এরূপ রূপ ও লাবণ্য ধারণ, শ্রীভগবান ব্যতীত কোন মনুষ্য করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া পুরী গোসাঞির আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র, তাহারা দর্শন-সুখ অপেক্ষা আর অধিক কোন সুখ আছে তাহা জানেন না।

পুরী গোসাঞি অগ্রে দাঁড়াইলেন। মহাপুরুষ দেখিলেই লোকে চিনিতে পারেন। লোকেরা বুঝিলেন যে, একটী মহাপুরুষ আসিয়াছেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসীর প্রেমানন্দে বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর সেবক

কমলাকান্ত অমনি পরিচয় দিলেন যে, ইনি পরমানন্দপুরী। পরমানন্দপুরীর ভারত-বিখ্যাত নাম, শুনিবামাত্র সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন, করিয়া পুরী গোসাঞিকে যাইয়া প্রণাম করিলেন। পুরী গোসাঞি উহাতে ভয় পাইলেন, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রভু যদি প্রণাম করিলেন, পুরী তখন তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলিলেন, "গোসাঞি, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন।" পুরী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা তোমার নিকট থাকি। তোমার তল্লাসে শ্রীনবদ্বীপে গিয়াছিলাম, সেখানে শচী জননী আমাকে ভিক্ষা দিলেন। সেখানে শুনিলাম, তুমি নীলাচলে আসিয়াছ। এ কথা শুনিয়া জননী শচী ও অন্যান্য সকলে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছেন। ভক্তগণ, সম্মুখে রথযাত্রা উপলক্ষ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিতেছেন। আমার তত বিলম্ব সহিল না, তাই অগ্রে আসিলাম। এখন তোমার রূপ দর্শন করিয়া নয়ন শীতল হইল।" যথা—

দেখিয়া তোমার রূপ নেত্র জুড়াইল।
তীর্থযাত্রাদি মোর সফল হইল॥—চন্দ্রোদয়।

প্রভু তাঁহাকে নিজ বাসায় একখানি ঘর দিলেন ও সেবার নিমিত্ত একজন কিঙ্কর দিলেন। তাহার অনতিবিলম্বে স্বরূপ আসিলেন। যখন পুরী ও স্বরূপ আসিলেন, তখন সার্ব্বভৌম এই শ্লোক পড়িলেন যে, যেখানে যত নদী থাকে সমুদায় সাগরে গমন করে। পুরীকে সে দিবস জগদানন্দ ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন।

তাহার পর গোবিন্দ আসিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বসিয়া নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া

করযোড়ে দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, "আমি শূদ্রাধম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক। তিনি যখন দেহত্যাগ করেন, তখন আমাকে আর তাঁহার অন্য সেবক কাশীশ্বরকে বলিলেন, "তোমরা যাও, যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সেবা করিবে। আর আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলিবে যে, "তিনি যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন তখন আমি তাঁহার মধুর নটেন্দ্ররূপ দর্শন ও হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছি। এখন তাঁহাকে দর্শন করিলে আর সেরূপ দেখিতে পাইব না, বরং আমার প্রাপ্ত ধন হারাইব। তাই তাঁহাকে দেখিতে যাই নাই। শ্রীপাদ পুরী গোসাঞির আজ্ঞাক্রমে আমি শ্রীচরণে উপস্থিত হইলাম। এখন প্রভু কৃপা করিয়া আমাকে স্থান দিতে আজ্ঞা হয়। কাশীশ্বর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, করিয়া সত্বর আসিবেন।"

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "আমার প্রতি তাঁহার যে বাৎসল্যপ্রেম তাহার অবধি নাই।" কিন্তু পাঠক মহাশয়! একবার ঈশ্বরপুরী কি বস্তু তাহা অনুভব করুন্। যে নিমাই শ্রীভগবান বলিয়া জগতে পূজিত, তাঁহার গুরু তিনি। পাছে তাঁহার হৃদয় হইতে প্রভুর গৌর-নটেন্দ্র রূপ কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে তাঁহার যে শিষ্য, যিনি জগতে শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত, তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন না। সার্ব্বভৌম গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিত কায়স্থ, তুমি ঈশ্বরপুরী গোসাঞির কি কার্য্য করিতে?" গোবিন্দ বলিলেন, "সমুদায় কার্য্য করিতাম, এমন কি রন্ধন পর্য্যন্ত।" ইহাতে সার্ব্বভৌম পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "পুরী গোসাঞি সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি কিরূপে শূদ্র-সেবক রাখিলেন?"

এ কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। জাতিবিচার হিন্দুধর্ম্মের মজ্জাগত। সন্ন্যাসীদেরও শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্র-সেবক রাখিতে নাই।

প্রভু বলিলেন, যাঁহারা মহাজন তাঁহারা লোকের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিচার করেন, জাতি দেখিয়া বিচার করেন না। সার্ব্বভৌম তখন বলিলেন, "তা বটে! বৈষ্ণবের কাছে এ সমুদায় ক্ষুদ্র বিধি আবার কি?"

সার্ব্বভৌম বলে প্রভু এই সুনিশ্চয়।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের চেষ্টা লৌকিক না হয়।—চন্দ্রোদয়।

প্রভু গোবিন্দের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সার্ব্বভৌমকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি ইহার বিচার কর। যিনি গুরুকে সেবা করিয়াছেন তিনি পূজ্য, আমি তাঁহার সেবা কিরূপে লইব? আবার এ দিকে গুরুর আজ্ঞা। এখন আমি কি করি?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "গুরুর সাক্ষাত আজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। অতএব গোবিন্দকে গ্রহণ করা উচিত।"

তখন প্রভু উঠিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। এই হইতে গোবিন্দ প্রভুর সেবক হইলেন। এই গোবিন্দের কথা কি বলিব। যেমন প্রভু তেমনি সেবক। নিজে উদাসীন, পরম ভক্ত, অন্যকে সেবা করা গোবিন্দের ধর্ম্ম। গোবিন্দ প্রভুকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বলিব। ত্রিভুবনে গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যবান্ আর নাই।

অগ্রে কাশীশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোসাঞি, বামে ভারতী গোসাঞি, পশ্চাদে স্বরূপ ও গোবিন্দ, আর মধ্যস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ। এইরূপে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেন। সকলের কথা বলিলাম, এখন ভারতী ঠাকুরের আগমনবার্ত্তা বলি।

কেশব ভারতী প্রভুকে সন্ন্যাসমন্ত্র দেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাহার পরমার্থ ভাই। গোবিন্দের আগমনের পরেই তিনি নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার যেমন গৌরবর্ণ রূপ, তেমনি প্রকাণ্ড দেহ, আবার সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু তিনি ভক্ত নহেন, শান্ত অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই, তাঁহার মহিমা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মুকুন্দ প্রভুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আসিয়া ভারতী আপনার পরিচয় দিয়া প্রভুকে দর্শন করিবেন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন মুকুন্দ শীঘ্র প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঠাকুর আসিয়াছেন, তোমাকে দর্শন করিতে চাহেন।" প্রভু একটু মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, "তিনি গুরু, আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইব; বিশেষতঃ তিনি শান্ত। এই যে বলিলেন, তিনি "শান্ত," ইহাতে ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি অন্যজাতীয়, প্রভুর গণ নহেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে দ্বারে যে ভারতী ঠাকুর দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে আনিতে চলিলেন। ভারতী দেখিলেন যে, প্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার নয়ন-ভৃঙ্গ প্রভুর শ্রীবদন-পদ্ম প্রতি আকৃষ্ট হইল।

চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বম্ভর।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
দূর হৈতে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা অতি বিস্ময় পাইয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইহোঁ জানিল নিশ্চয়।
যে অপূর্ব্ব শুনিয়াছি সেইরূপ হয়॥

কণক পরিঘ সম দীর্ঘ বাহুদ্বয়।
স্ফুটতর কনক কেতকী কান্তি হয়॥
নব দমনক মাল্য লাল্যমণি দ্যুতি।
উদয় করিল গৌরচন্দ্র চারু গতি॥
এই মত ব্রহ্মানন্দ দেখে নেত্র ভরি।
তাহার নিকট আইলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥—চন্দ্রোদর নাটক

প্রভু প্রথমেই নাম শুনিয়া বলিয়াছেন, "ইনি শান্ত, ইঁহার নিকট আমি যাইব।" তাহার পরে দেখেন ভারতী ঠাকুর চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন। দেখিবামাত্র প্রভু চটিয়া গেলেন। তখন মুকুন্দের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "কৈ ভারতী গোসাঞি কোথায়?" মুকুন্দ বলিলেন, "ঐ তোমার অগ্রে দাঁড়াইয়া।" প্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ, তুমি অজ্ঞান। তুমি কাহাকে ভারতী বলিতেছ, উনি ভারতী গোসাঞি হইলে চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন?" যথা, প্রভু বলিতেছেন—

যদি হইতেন তিহঁ ভারতী গোসাঞি।
বাহ্য বেশ চর্ম্মাম্বর পরিতেন নাই॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় যে সভাকার।
চর্ম্মাম্বর বাহ্য প্রতারণা নাহি তার॥—চন্দ্রোদয় নাটক।

এই কথা শুনিয়া ভালমানুষ ভারতীর মুখ শুখাইয়া গেল। ভারতীর প্রভুর সহিত পাল্লাপাল্লি দিবার ইচ্ছা নাই। প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া অনেকটা বিশ্বাস হইয়াছিল, এখন দর্শন মাত্রে সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। অতএব প্রভু যখন মধুর ভর্ৎসনা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না, তবে মুখের ভাবে বলিলেন, ক্ষমা কর, আমি এখনি চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিতেছি। প্রভু তখন

পণ্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন। দামোদর ইঙ্গিত বুঝিয়া একখানি নূতন বহির্ব্বাস আনিলেন। ভারতী উহা গ্রহণ করিয়া পরিধান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ঠিক্! আমি এখন বুঝিলাম, আমি যে চর্ম্মাম্বর পরিতাম ইহা কেবল দম্ভের নিমিত্ত। চর্ম্মাম্বর পরিয়া ভবসাগর পার হওয়া যায় না।"

যে মাত্র ভারতী গোসাঞি বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, অমনি প্রভু আসিয়া তাঁহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন।

কাপড়ের বহির্ব্বাস পরিবর্ত্তে চর্ম্মের বহির্ব্বাস, প্রভুর বাহ্য প্রতারণা বলিয়া সহ্য হয় নাই, কিন্তু এখন বাহ্য প্রতারণা ব্যতীত, তাঁহার ধর্ম্মের মধ্যে, আর কই কি আছে? মাঝে মাঝে দুই একটী বিমল বস্তু দর্শন হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাহ্য প্রতারণা।

যখন প্রভু ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করিলেন, তখন ভারতী অতিশয় ভয় পাইলেন। কারণ প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহায় চিরকালের বিশ্বাস নষ্ট হইয়া পুনর্জ্জন্ম হইয়া গিয়াছে। প্রভু যে স্বয়ং শ্রীভগবান তাঁহার তখন এই বিশ্বাস হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ ভয় পাইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "স্বামিন্! তোমার জীব শিক্ষা দিবার লাগি অবতার। আমাকে সেই নিমিত্ত প্রণাম করিলে। তুমি তোমার জীবকে দৈন্য ও গুরু-সম্পর্কীয় জনকে ভক্তি শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু তবু আমার এই মিনতি রাখিবেন, আমাকে ওরূপ আর করিবেন না, আমাকে প্রণাম করিবেন না, আমার মনে বড় ভয় হয়।" তখন প্রভুর ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মানন্দের পরিচয় হইল, আর স্বরূপ প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন;

তাহার পরে ব্রহ্মানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন, শ্রীজগন্নাথ দেবের মহিমা বর্ণিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু এখন সেই মহিমা আরো

উজ্জ্বল হইয়াছে। যেহেতু সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে উভয় স্থির ও জঙ্গম ব্রহ্ম উপস্থিত। স্থির-ব্রহ্ম নীল, জঙ্গম গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছেন।

প্রভু উপরের কথা শুনিয়া সামান্য অপ্রস্তুত হইলেন, হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "স্বামী যাহা বলিলে তাহা ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ ধরিয়া স্থির জগন্নাথ ছিলেন, এখন তুমি, জঙ্গম জগন্নাথ, গৌরবর্ণ ধরিয়া উদয় হইয়াছ"। ব্রহ্মানন্দ-স্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি গৌর, পূর্ব্বে বলেছি।

ব্রহ্মানন্দ তখন প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি নৈয়ায়িকের শিরোমণি, তুমি বিচার কর। যিনি ব্যাপ্য তিনি জীব, যিনি ব্যাপক তিনি শ্রীভগবান,—এই শাস্ত্রের বচন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বামী আমাকে চর্ম্মাম্বর ঘুচাইলেন, ইহাতে আমি হইলাম ব্যাপ্য অর্থাৎ জীব, স্বামী হইলেন ব্যাপক্ষ অর্থাৎ শ্রীভগবান্।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "স্বামী আপনারই জয় হইল, আপনার কথাই শাস্ত্রসম্মত।

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "শাস্ত্রের কথাও বটে, আর শ্রীভগবানের যে প্রকৃতি তাহার কথাও বটে। শ্রীভগবানের প্রকৃতিই এই যে, চিরদিন ভক্তের নিকট তিনি হারি মানিয়া থাকেন।" তাহার পরে, আবার প্রভুকে বলিতেছেন, "স্বামী, আর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর। চিরদিন আমি নিরাকার ধ্যান করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তোমাকে দর্শন মাত্রে আমার সে ভাব দূরে গিয়াছে। আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়া আনন্দ দিতেছেন, আমার মন শ্রীকৃষ্ণতে আকৃষ্ট হইতেছে, আমার জিহ্বা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছে। অধিক কি, তোমাকে আমার সেই কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" যখন ব্রহ্মানন্দ এই কথাগুলি বলিলেন, তখন তিনি ভাবে

এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, প্রভু আর উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; তখন প্রভু তাঁহার চিরদিনের পন্থা অবলম্বন করিলেন, সেকি তাহা বলিতেছি। চরিতামৃতে এই যে কথাটী আছে—

"অন্তর্য্যামি ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহি বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥"

এই কথাটী স্মরণ করুন। প্রভুর এই এক প্রভাব ছিল। প্রভু আপনাকে শ্রীভগবান, কি অবতার, কি শ্রীভগবানের কেহ, এরূপ কোন কথা মুখাগ্রে আনিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস হইত। অর্থাৎ মুখে তিনি কাহার নিকট আপনার পরিচয় দিতেন না, তবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, তিনি বস্তু কি, তাহা প্রকাশ করিতেন। এরূপ ঘটনা যখন হইত, তখনই সেই ভাগ্যবানের নিকট তিনি এইরূপে অন্তরে অন্তরে নিজের পরিচয় দিতেন। সেই ব্যক্তি স্বভাবতঃ, "তুমি নিশ্চিত সেই তিনি, জীবের প্রাণ, যেহেতু তোমাকে আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে," এরূপ বলিলে, প্রভুর একটী উত্তর ছিল; তিনি তাহাই বলিয়া সেই ভাগ্যবানের নিকট আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মানন্দকে এখন সেই উত্তরটী দিলেন; অর্থাৎ বলিলেন, "স্বামী, তোমার কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ। যাহার এরূপ ভাব, সে চারিদিকে কৃষ্ণময় দেখে; এমন কি, তাহার স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, আমাকে হইবে তাহার বিচিত্র কি?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "সে ঠিক কথা। কৃষ্ণ-প্রেম গাঢ় হইলে এরূপ হয়। আবার যাহার কৃষ্ণ-প্রেম নাই, তাহাকে যদি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন দেন, কিম্বা যদি তিনি ছদ্মবেশেও উদয় হয়েন, তাহা হইলেও ঐরূপ হয়।

প্রভু অমনি কর্ণে হস্ত দিয়া বলিতেছেন, "শ্রীবিষ্ণু! সার্ব্বভৌম, তুমি কি ভুলে গেলে যে অতি স্তুতি আর নিন্দা ইহা উভয় সমান?"

ব্রহ্মানন্দ আবার প্রভুকে ছাড়িয়া দিয়া, কতক যেন আপন মনে আর কতক সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, যিনি শ্রীভগবান তিনি পরমসুন্দর। তাঁহার দর্শনে, জীবকে আনন্দে বিহ্বল করে। সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া যে নিরাকার ধ্যান করে, তাহার কেবল দুর্ব্বাসনা। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যাহার দর্শনে আনন্দে বিহ্বল করে, সেই বস্তু শ্রীভগবান। এই যে বস্তুটী সন্ন্যাসী রূপ ধরিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ইঁহার দর্শনে আমার মন শুধু যে নির্ম্মল হইয়াছে ও রুচি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নয়, আনন্দে তাহাকে একেবারে উন্মাদ করিয়াছে। ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত করি যে, এই যে বস্তুটী, ইনি সেই তিনি, যিনি তাঁহার রূপে ও গুণে সর্ব্বজীবকে আকর্ষণ করেন। ভট্টাচার্য্য তুমি কি বল?" এই কথা আরম্ভ হইলেই প্রভু অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন, আর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া তত্ত্ব বিচার করিতে লাগিলেন। যথা—

চৈতন্য গোসাঞি হন স্বয়ং ভগবান।
সার্ব্বভৌম হন বৃহস্পতি বিদ্যমান॥
ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞতম।
দামোদর (স্বরূপ) পণ্ডিতাদি শাস্ত্রজ্ঞ উত্তম॥
সবে মেলি কৈল পরম ব্রহ্মের বিচার॥

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "স্বামী, আপনার সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার।"

ব্রহ্মানন্দ বলিতেছেন, "দেখ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রে ও মহাভারতে আমরা এই কথার অপরূপ প্রমাণ পাইতেছি। শ্রীভগবানের সহস্র নামের মধ্যে এই একটী আছে, যথা—

স্থবর্ণোবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

এই যে শ্রীভগবান স্থবর্ণবর্ণ ধরিয়া সন্ন্যাসী হইবেন শাস্ত্রে উক্তি আছে, ইহা এতদিন সফল হয় নাই, এখন হইল। শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দ, স্থতরাং তিনি জীবকে আনন্দ দিয়া থাকেন। নিরাকার ধ্যানে আনন্দ কি? তিনি যাহাকে কৃপাবান হয়েন তাহার নিকট ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে আনন্দ দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভাগ্যবান, সে সেই আনন্দপ্রদ রূপ ধ্যান না করিয়া নিরাকার ধ্যান কেন করিবে?"

এমন সময় পণ্ডিত দামোদর আসিয়া গলায় বসন দিয়া ব্রহ্মানন্দকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর তাঁহাকে আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন। ভারতীকে প্রভু বাসা করিয়া দিলেন, আর একটী ভৃত্য দিলেন।

সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত অহোরহ রহিয়াছেন, আবার তাঁহার মনে অহোরহ একটী বাসনা রহিয়াছে। প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার অন্নদাতা। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন, তাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। রাজার প্রধান ভরসা তিনি। সার্ব্বভৌম এই কথা প্রভুর নিকট উত্থাপন করিবেন বলিয়া অনবরত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাহস হইতেছে না। বলিতে যান, আবার পারেন না। রাজার সহিত যদি তাঁহার নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ থাকিত, তবে এরূপ কুণ্ঠিত হইতেন না। ও দিকে বিলম্বও আর করিতে পারেন না, যেহেতু রাজার নিকট হইতে পত্র আসিল। রাজা এই পত্রে জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহার কথা প্রভুর নিকট বলা হইয়াছিল কি না, আর প্রভুর কিরূপ অনুমতি হইয়াছে। তখন ভট্টাচার্য্য সাহস করিয়া করোযোড়ে প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, একটী নিবেদন।" প্রভু মুখ তুলিয়া কথা শুনিবার

সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, অভয় দেন ত বলি।" তখন প্রভু বুঝিলেন যে সর্ব্বভৌমের অভিপ্রায় ঠিক সৎ নহে। তাই—

প্রভু কহে কহ তুমি, নাই কিছু ভয়।
যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হইলে নয়॥—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

সার্ব্বভৌম বলিতেছেন, "মহারাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমাকে লইয়া যাইয়া তোমাকে এই কথা বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াছেন। আবার সম্প্রতি অতি কাতর হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। একবার তাঁহাকে দর্শন দেও, এই আমাদের ইচ্ছা।" প্রভু এই কথা শুনিয়া সিহরিয়া কর্ণে হস্ত দিলেন। বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি বিজ্ঞতম, তুমি ওরূপ কথা কিরূপে বল? যে নিষ্ঠাবান, শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবে, তাহার পক্ষে বিষয়ী-ব্যক্তি ও নারী দর্শন অপেক্ষা বিষ খাইয়া মরা ভাল। তুমি আমাকে রাজদর্শন-রূপ অবৈধ কার্য্যে রত করিও না, যেহেতু আমি ভিক্ষুকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, তুমি যে শাস্ত্রের কথা বলিলে তাহা আমি জানি। রাজা সামান্য বিষয়ী হইলে আমি কখন এ কথা বলিতাম না। রাজা শ্রীজগন্নাথের সেবক, পরম ভক্ত, তাই তুমি তাহাকে দর্শন দিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য হইবে না।"

প্রভু বলিলেন, "তাহা হইলেও বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী ভিক্ষুকের পক্ষে বিষ। এমন কি, বিষয়ী ব্যক্তির কি স্ত্রীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ভিক্ষুকের দর্শন করিতে নাই, কি জানি যদি মন বিচলিত হয়। ঐশ্বর্য্যশালী রাজার সহিত আমাকে মিলিতে বল?

সার্ব্বভৌম তবু নিরস্ত হইলেন না, যেন প্রত্যুত্তরে কি বলিবেন

তাহারই উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভু একটু কঠিন হইয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি আর্য্য, তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। তুমি যদি এরূপ অন্যায় আজ্ঞা কর, তবে নীলাচল হইতে আমায় পলাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য করযোড়ে ক্ষমা মাগিলেন, আর বলিলেন, এমন কার্য্য আর করিবেন না।

সার্ব্বভৌম তখন রাজাকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, প্রভুর অনুমতি হইল না। আবার ইহাও লিখিলেন যে, প্রভুর অনুমতি অবশ্য হইবে, যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল। কিন্তু রাজার বিলম্ব সহিতেছে না। তিনি আবার সার্ব্বভৌমকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, প্রভু যদি অস্বীকার করেন, তবে তাঁহার ভক্তগণ দ্বারা তাঁহার মন দ্রব করাইবে। রাজা আরো লিখিলেন যে, প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার রাজ্য পর্য্যন্ত ভাল লাগিতেছে না। এমন কি, প্রভু যদি তাঁহাকে দেখা না দেন, তবে তিনি কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগী হইয়া বাহির হইবেন। এই পত্র পড়িয়া সার্ব্বভৌম বড় চিন্তিত হইলেন। প্রভুর নিকট আবার গমন করেন এ সাহস হইল না, তখন ভক্তগণ লইয়া ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তাঁহাদের নিকট সমুদায় কহিলেন ও তাঁহাদিগকে রাজার পত্র দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম তখন শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তিনি যদি প্রভুর মন কোমল করিতে পারেন তবেই হইবে। শ্রীনিত্যানন্দের সাহস হইল না। তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "চল সকলে যাই! প্রভুকে রাজার সহিত মিলিতে বলিব না, তবে চল রাজার চরিত্র বলি গিয়া।" এইরূপে সকলে দল বান্ধিয়া যাইয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; সার্ব্বভৌম সকলের পাছে, নিতাই সকলের আগে।

সকলের মুখ দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কোন কথা আছে,

তাই শুনিবার নিমিত্ত মুখ উঠাইলেন। নিতাই বলিতে গেলেন, কিন্তু একটু একটু তোতলা, তাহাতে আবার কথাটা তত ভাল নয়, তাই বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "তোমরা যেন কি বলিবে? বল, আমি শুনিতেছি।" ইহাতে নিতাই সাহস বান্ধিয়া বলিলেন, "তোমাকে না বলিলে মরি, বলিতেও সাহস হয় না। আর কিছু নহে, রাজা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। রাজা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের তাহার প্রতি বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। রাজা লিখিয়াছেন যে, যদি তোমায় দর্শন না পান, তবে কর্ণে কড়ি দিয়া উদাসীন হইবেন, তাঁহার রাজ্য সুখ আর ভাল লাগিতেছে না, তাহার মনের এক মাত্র সাধ যে তোমার চরণ ও শ্রীবদন নয়ন ভরিয়া একবার দেখিবেন।"

প্রভু, এই কথা শুনিয়া কতক রুক্ষ কতক ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা যে আমাকে লইয়া এখন কটকে চল। তাহা হইলে তোমাদের বড় ভাল হইবে, না? তোমরা যদি পরমার্থ না মান লোকে কি বলিবে, তাই একবার ভাব দেখি? অপরের কথা দূরে থাকুক, দামোদর পর্য্যন্ত আমাকে নিন্দা করিবেন। ভাল, দামোদর আমাকে আজ্ঞা করিলে আমার রাজার সহিত মিলিতে আপত্তি থাকিবে না।"

দামোদর বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব তুমি শ্রীভগবান, তোমাকে আমি বিধি দিব ইহা হইতে পারে না। তবে রাজার যদি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রেম থাকে, তবে তিনি অবশ্য তোমার চরণ পাইবেন, ইহা আমি বলিতে পারি।" শ্রীনিত্যানন্দ তাড়া খাইয়া ভয় পাইয়াছেন। বলিতেছেন, "সর্ব্বনাশ! রাজদর্শন কর, তোমাকে এ কথা কে বলিবে? তবে রাজা যখন তোমার নিমিত্ত প্রাণ ছাড়িতে প্রস্তুত, তখন তোমার কৃপা-চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে এক খানা তোমার

বহির্ব্বাস পাঠাইতে অনুমতি দাও, তাহা পাইলে রাজা এখন সুস্থির হইবেন।" প্রভু বলিলেন, "যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে তাহা কর, আমার আপত্তি নাই।"

তাহা করা হইল, রাজাও বস্ত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, কিন্তু নিরস্থ হইলেন না, তাহার কারণ বলিতেছি।

প্রভু যে রাজার সম্বন্ধে এই বাহ্য নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহার আর কোন কারণ নাই, কেবল এই যে, ভূপতির তখন প্রভু-দর্শনে অধিকার হয় নাই। রাজা সকলের কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাঁহার বাসনা রোধ করে এমন লোক নাই। ইচ্ছা হইয়াছে প্রভুকে দেখিবেন, তখন দেখিবেনই দেখিবেন। এই যে ইচ্ছা, উহা কেবল প্রেম ও ভক্তি জনিত নহে। তাহা হইলে, প্রভু-দর্শন সুলভ হইত। কিন্তু এই ইচ্ছার হেতু প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আরও কিছু ছিল, তাহা এই যে,—তিনি রাজা। তিনি রাজা, প্রভুর সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন, তাহা পারিবেন না, তাহা কিরূপে হইবে? তিনি না সে দেশের রাজা? তাই, প্রভু নিষ্ঠুর হইয়া বলিলেন যে, এ কথা পুনরায় উত্থাপিত হইলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন। রাজা শুধু বহির্ব্বাস পাইয়া ঠাণ্ডা হইতেন না, তবে সার্ব্বভৌমের পত্রে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। সার্ব্বভৌম লিখিলেন যে, প্রভু অবশ্য তাঁহাকে দর্শন দিবেন, তিনি যেন ব্যস্ত না হন।

প্রতাপরুদ্র স্নানযাত্রার দুই তিন দিন থাকিতে প্রতি বৎসর পুরীতে আসিয়া থাকেন, সেই নিয়মানুসারে নীলাচলে আইলেন। রাজা আইলেন, রাম রায়ও আইলেন। রামানন্দ, প্রভুকে বিদ্যানগর হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাজার কাছে গমন করিলেন; করিয়া, তাঁহাকে সমুদায় বিষয়কার্য্য বুঝাইয়া দিয়া চির-

দিনের নিমিত্ত অবসর লইলেন, এখন রাজার সহিত নীলাচলে আইলেন।

রাজা পুরীতে আসিয়াই, "কে আছ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া আন," বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। দূত দৌড়িয়া আসিয়া সার্ব্বভৌমকে রাজার আজ্ঞা জানাইল।

শ্রীরামানন্দ রায় রাজার সহিত আইলেন, রাজা আসিয়া যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন, তখনি তাঁহার রায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইল। রাম রায় জগন্নাথ না দেখিয়া প্রভুকে দেখিতে দৌড়িলেন।

রাজা শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়া, চন্দ্রাতপের ছায়াতে পাত্র মিত্র লইয়া বসিয়া, সার্ব্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতেছেন। রাজার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত। শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছেন বলিয়া নয়, প্রভুকে দর্শন করিবেন সেই আশয়ে। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে পূর্ব্বে আশা দিয়া লিখেন, তাহাতে রাজা ইহাই বুঝেন যে, তিনি নীলাচলে আইলেই প্রভুর দর্শন পাইবেন। তাহার পরে রামানন্দ তাঁহার নিকট কটকে আইলেন, আসিয়া কার্য্য হইতে অবসর মাগিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি বিষয় ত্যাগ করিবেন, করিয়া প্রভুর চরণে থাকিবেন। এইরূপে রাজার নিকট আবার প্রভুর কথা উত্থাপিত হইল। তখন রামানন্দ সহস্র মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিয়াছিলেন পূর্ব্বে শ্রীপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে রাজার যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা রাম-রায়ের সহিত কথা কহিয়া দূর হইল। রাজা তখন কাতর হইয়া রামানন্দের শরণাগত হইয়া বলিলেন, "তুমি প্রভুর প্রিয়পাত্র, আমায় প্রভুকে দেখাও।" রাম রায়ও স্বীকার করিলেন যে, তাহা অবশ্য হইবে। তিনি বলিলেন, "প্রভু প্রেমভক্তির বশ, তোমার সময় হইলে তোমাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তাঁহার রীতিই এই।"

রাজা প্রতি বৎসর স্নানযাত্রাব কিছু পূর্ব্বে নীলাচলে যেরূপ আসিয়া থাকেন এবারও সেইরূপ আসিয়াছেন। কিন্তু এবার জগন্নাথ দর্শন করিতে তত নয়, যত প্রভুকে দর্শন করিতে। দূতী প্রেরণ করিয়া প্রিয়তমের নিমিত্ত বাসরসজ্জা করিয়া, প্রিয়তমের আগমন সংবাদ প্রতীক্ষায়, উল্লাসে, প্রিয়া যেরূপ বসিয়া থাকে, রাজা সেইরূপ সার্ব্বভৌমকে প্রত্যাশা করিতেছেন।

সার্ব্বভৌম আইলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন, রাজা প্রণাম করিলেন, ভট্টাচার্য্যকে বসাইলেন, বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য চল, প্রভুর নিকট লইয়া চল।" ভট্টাচার্য্যের মুখ মলিন হইয়া গেল। কষ্টে শ্রেষ্টে বলিলেন যে, প্রভুর এখনও অনুমতি হয় নাই। তাহার পরে রাজাকে তুইটা আশ্বাস বাক্য বলিতে গেলেন, কিন্তু রাজা সে অবসর দিলেন না; প্রভুর অনুমতি হয় নাই শুনিবামাত্র ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

না দিবেন অভাগার প্রতি, শ্রীচৈতন্য দরশন,
হাহা ধিক রাজত্ব, ইহা হইতে সুনীচত্ব,
পৃথিবীতে আর আছে কতি।
দর্শন না করি যারে, হেন নীচ অধমেরে,
মহাপ্রভু করে দরশন।

রাজা বলিতেছেন, "ভট্টাচার্য্য, ধিক আমার রাজত্ব, আমি কি এত নীচ! আমি যাহাকে ঘৃণা করিয়া দেখি না তাহাকে প্রভু দেখা দেন, তবু আমাকে দেখা দিবেন না! ভাল ভট্টাচার্য্য, আমি নয় নীচ হইলাম, তিনি ত শ্রীভগবান? তিনি পতিত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তবে আমাকে উপেক্ষা কি বলিয়া করিলেন? তবে কি তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন যে, একা প্রতাপরুদ্র

ব্যতীত জগতের তাবৎকে উদ্ধার করিবেন? ভট্টাচার্য্য, আমারও প্রতিজ্ঞা শুন। তিনি শ্রীভগবান, আমাকে দর্শন দিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন; আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহার দর্শন না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এরূপ যাহার দৃঢ়সঙ্কল্প তাহার অভাব কি? অবশ্য প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তবে আরও দুই এক দিন অপেক্ষা কর।"

তেঁহ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥—চরিতামৃত।

এদিকে রাজা শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন দেখিয়া, রামানন্দ, তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া, প্রভুকে দর্শন নিমিত্ত আইলেন। রামানন্দ আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, উভয়ে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামানন্দের সহিত প্রভুর এত গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়া তাঁহার নিজ ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পরে বসিয়া দুইজনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। রাজা রামানন্দকে দূতী নিযুক্ত করিয়াছেন, আবার রাজা রামানন্দের চিরদিনের অন্নদাতা। রাজাকে যে প্রভুর সহিত মিলাইবেন, ইহা তাঁহার কাযেই আন্তরিক ইচ্ছা। রামানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি তখন নীলাচলে আইলে, আমি তাহার কিছু দিন পরে রাজার নিকট গমন করিলাম। আমি যাইয়া বিষয় হইতে আমাকে অব্যাহতি দিতে রাজার অনুমতি চাহিলাম। রাজা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি যতদিন বাঁচিব, প্রভুর চরণ পূজা করিব, এই সঙ্কল্প করিয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র রাজা মহা প্রেমে চঞ্চল হইলেন, হইয়া উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

করিয়া বলিতেছেন, 'তুমি ধন্য, প্রভুর কৃপা পাইয়াছ। আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ্য নহি। তুমি সচ্ছন্দে যাও, যাইয়া তাঁহার চরণ ভজন কর। আরও বলিতেছি, তুমি বিষয় কার্য্য করিও না, কিন্তু তোমার যে বেতন ইহার দুগুণ পাইবা। তুমি তাঁহার শ্রীচরণ ভজন করিয়া জন্ম সার্থক কর। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাময়; যদিও এ জন্মে আমাকে কৃপা না করেন, অবশ্য কোন জন্মে করিবেন।'"

এই সমুদয় বলিয়া রাম রায় বলিতেছেন, "রাজার তোমার প্রতি যে প্রেম দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সে প্রেমের লেশও আমাতে নাই।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, "তুমি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তোমায় যিনি ভক্তি করেন, তিনি ভাগ্যবান। রাজার এই গুণে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পাত্র হইবেন।" এই প্রথমে প্রভু রাজাকে যে কৃপা করিলেন, তাহার আভাস দিলেন।

তাহার পরে প্রভু বলিতেছেন, "রামানন্দ, শ্রীমুখ দর্শন করিয়াছ?" রাম রায় বলিলেন, "না, এই এখন যাইব।" ইহাতে প্রভু বলিলেন, "এ কি অকার্য্য করিলে! জগন্নাথ ঈশ্বর, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া কেন এখানে আইলে? রাম রায় বলিলেন, "চরণ রথ, হৃদয় সারথী। সারথী যে দিকে লইয়া যায়, চরণ সেই দিকে গমন করে। হৃদয় সারথী এই দিকেই আনিলেন।" প্রভু বলিলেন, "তবে যাও, এখন জগন্নাথ দর্শন ও পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত দেখা শুনা কর গিয়া।" রাম রায়, প্রভু ও ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন, এবং জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামানন্দ, প্রভুর নিকট নিবেদন করেছিলে?" রাম রায় বলিলেন, "ধৈর্য্য ধরুন। প্রায় হইয়াছে, একটু বিলম্ব

আছে, আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন।" রামানন্দ আপন উদ্যানে মহা বিষয়ীর ন্যায় বাস করেন, প্রভুর ওখানে প্রায় দিবানিশি যাপন করেন, আবার রাজাকেও একবার দর্শন করিতে গমন করেন। রাজার নিকট গমন করিলেই রাজা জিজ্ঞাসা করেন, "কত দূর? প্রভুর কি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু মন শিথিল হয়েছে?"

রামানন্দ শেয়ে প্রভুকে ধরিলেন। তাঁহাকে বলিতেছেন, "প্রভু! রাজার সহিত দেখা করা আমার দুর্ঘট হয়েছে। দেখা হইলেই কেবল এক কথা, 'প্রভুর সহিত মিলাইয়া দাও। তুমি মনে করিলেই পারিবে।' রাজা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার যেরূপ ভাব তাহাতে তাঁহাকে দেখা না দিলে তিনি প্রাণে বাঁচিবেন এরূপ বোধ হয় না।"

প্রভু একটু কাতর হইলেন। বলিতেছেন, "রামানন্দ, তোমরা আমাকে রাজার কথা বলিয়া কেন দুঃখ দাও? আমার তাঁহাকে দর্শন দিতে ত কোন আপত্তি নাই! তবে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ কিরূপে করি?"

রামানন্দ বলিলেন, "তোমার আবার কি বিধি মানিতে হইবে জানি না; যদি বল, জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তোমার সমুদায় বিধি পালন করা কর্ত্তব্য; তাহা সত্য, কিন্তু প্রতাপরুদ্র নামে রাজা, কর্ত্তব্যে ভক্ত।"

প্রভু বলিলেন, "তাহা আমি জানি। কিন্তু আমার যে অবস্থা, সমুদায় বিচার করিতে হইলে আমার অতি সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। আমার একটু ছিদ্র পাইলে জীবে আর হরিনাম লইবে না।"

রামানন্দ। প্রভু, কত লক্ষ অধম পতিত অস্পৃশ্য পামরকে অধম হইতে উত্তম করিলে, এমন কি ব্রজরস দান করিলে। রাজা তোমার ভক্ত, তাঁহাকে বঞ্চিত করিবা ইহাও ত সঙ্গত হয় না।

প্রভু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "রামানন্দ, তুমি এক কার্য্য কর।

তুমি তাঁহার পুত্রকে লইয়া আইস।” শাস্ত্রে “আত্মা বৈ জায়তে পুত্র” বলে। রাজার পুত্রের সহিত মিলিব, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হউন।”

রামানন্দ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক আনন্দিত হইলেন, সন্দেহ নাই। আর সেই আনন্দ মনে, রাজার নিকট গমন করিয়া, সমুদায় কথা বলিলেন। বলিলেন, “প্রভুর তোমার উপর পূর্ণ কৃপা, আর সেই কৃপার আরম্ভ এই।” রাজাও আনন্দিত হইলেন। তখন রসিকভক্তচূড়ামণি জগন্নাথবল্লভ-নাটক-লেখক রামানন্দ রাজপুত্রকে সাজাইতে লাগিলেন। রাজকুমারের কেবল যৌবনারম্ভ, বর্ণ শ্যাম, কাজেই তাঁহাকে কৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা দিলেন। তাঁহাকে পীতাম্বর পরাইলেন, আর তাহার উপযোগী আভরণ সমুদায় পরাইলেন। রাজকুমার কিরূপে চলিলেন, না যেরূপে যুবতী পতির সহিত প্রথম ঘরে মিলিতে যান। সেইরূপ মন্থর গতিতে, প্রতি পদ বিক্ষেপে মঞ্জরী-ধ্বনি করিয়া, রাজপুত্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

রামানন্দের ইচ্ছা রাজপুত্রের হাবভাব লাবণ্যে প্রভুকে ভুলাইবেন। রামানন্দ সেইরূপ করিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াছেন। তাঁহাকে সেইরূপ অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। প্রকৃতই প্রভু রাজপুত্রকে দেখিয়া ভুলিলেন, রাজকুমারকে দর্শন মাত্র তাঁহার রাধা-ভাবে শ্যামসুন্দরের স্মৃতি হইল। প্রভু তখন উঠিয়া বিবশীকৃত হইয়া রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন, “তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমার দর্শনে আমার ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্মৃতি হইল।” প্রভু ইহা বলিতে বলিতে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু রাজকুমার কি করিলেন?

প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক’রে নাচে করয়ে রোদন।—চরিতামৃত।

প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া শান্ত করাইলেন ও নৃত্য হইতে তাহাকে ক্ষান্ত করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি ভাগবতোত্তম। তুমি এখানে প্রত্যহ আসিবা।" রাজকুমার প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া পিতার নিকট চলিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রাজকুমার আনন্দে টলমল করিতেছেন, অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে, অধিক কি তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে। তাহার রূপ এত মনোহর হইয়াছে যে, তাঁহাকে চেনা যাইতেছে না। রাজপুত্রের দশা দেখিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন দিয়া সেই আনন্দের অংশ পাইলেন। যে ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গের পরশ পাইয়াছে তাহার অঙ্গ-পরশের আস্বাদ করিয়া, রাজার শ্রীপ্রভুর প্রতি লোভ নিবৃত্তি হইল না, বরং বর্দ্ধিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

একবার এস হৃদি-মন্দিরে,
কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।
একবার এস হে, এস হে, এস হে, গৌর এস হে।
তুমি আসিবে আশায় হৃদি-পদ্মাসন পাতিয়া রাখিয়াছি।
একবার এস নাথ সেই আসনে বস।
আমি হেরিব বদন, পূজিব চরণ,
আমি ধোয়াব চরণ নয়নের জলে,
আর মাগিব এক ভিক্ষা।
আবি চাহি না ধন, চাহি না জন,
চাহি না পদ, চাহি না সম্পদ।
শুভ দৃষ্টিপাত জীবগণ প্রতি কর।
বলরাম দাসের চিরদুঃখ হর॥

নীলাচল হইতে সংবাদ আসিল যে, নবদ্বীপের চাঁদ দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া, সচ্ছন্দে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া সেখানে বাস করিতেছেন। এই সংবাদ শচীর মন্দিরে পৌছিল; শচী শুনিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও শুনিলেন। দূত প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ শচীর অগ্রে রাখিলেন। ঘোর বিয়োগানলে উত্তপ্ত শচীবিষ্ণুপ্রিয়া অমিয়-সাগরে ডুবিলেন। এই দুই বৎসর স্বপ্নের ন্যায় দুঃখ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাদের দুঃখ-সাগর শুখাইয়া, সুখের সাগর বহিল। "অবশ্য নিমাই আমার বাড়ী আসে নাই. তবত বেঁচে আছে? তবত ভাল

আছে?"—এই শচীর আনন্দ। "আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রকূলে নৃত্য করিয়া এখন নীলাচলবাসীকে সুখ দিতেছেন, কত শত লোক উদ্ধার পাইতেছে।"—এই বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ।

"প্রাণনাথ মোর সিন্ধুকূলে প্রেমে নাচিছে। ধ্রু।
হরি বলে কত লোকে সুখে ভাসিছে॥"

যখন দুঃখ থাকে, তখন বোধহয় ইহার আর প্রতিকার নাই। আবার অনেক সময় সেই দুঃখই সুখের আকর হয়।

এই যে ভুবনমোহন দুর্ল্লভ ধন, এই যে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্তু, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া, সন্ন্যাসী হইয়া, বৃক্ষতলবাসী হয়েছে, এ কথা শচীবিষ্ণুপ্রিয়া, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ শুনিবামাত্র ভুলিয়া গেলেন। এই গেল রসিকশেখরের এক অত্যাশ্চর্য্য রঙ্গ। তবে আবার দুঃখ কি গা? তাঁহার ইচ্ছায় অগ্নির গহ্বরও সুখসাগরে পরিণত হইতে পারে। প্রভুব প্রত্যাগমন সংবাদ এক মুহূর্ত্তে শ্রীনবদ্বীপময় ছড়াইয়া পড়িল, তখনি প্রভুর বাড়ী লোকারণ্য হইল। "জয় নবদ্বীপ-চন্দ্রের জয়!" এই ধ্বনি মুহুর্মূহু হইতে লাগিল। সকলে বলিয়া উঠিলেন, "চল যাই প্রভুকে দর্শন করি গিয়া।" যেন প্রভু ও-পাড়ায় আছেন। কিন্তু প্রভু বিংশতি দিনের পথ দূরে, শুধু তাহা নহে; পথ অতি দুর্গম।

কিন্তু কে লইয়া যাইবে? প্রভু না যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, আমার অভাবে তোমরা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে ভজনা করিও? চল সকলে সেখানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। এই কথা সাব্যস্ত করিয়া প্রভুর ভক্তগণ, নীলাচলের দূত সঙ্গে করিয়া অদ্বৈতের বাড়ী শান্তিপুরে চলিলেন।

সেখানে দিন কয়েক মহোৎসব হইল। শ্রীঅদ্বৈত অন্নদানে কখন

কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটিয়া, তাঁহাকে অগ্রে করিয়া, শচীর মন্দিরে আসিলেন। সেখানে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল। সকলে পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শচীর আজ্ঞা লইয়া, উহাঁর দত্ত সামগ্রী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বহস্তে প্রস্তুত উপহার লইয়া, সকলে "জয় জগন্নাথ", "জয় নবদ্বীপচাঁদ" বলিয়া চলিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে দূরদেশে গমন করা সুখের কার্য্য নয়, কিন্তু ভক্তগণ উহা মনে করিলেন না। সকলে প্রভুর নিমিত্ত অতি উপাদেয় খাদ্য সঙ্গে লইলেন, আর অনেকে, মহাপ্রভুর প্রাণের সম্পত্তি—মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা—বহন করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভক্তগণ আসিতেছেন, এই সংবাদ প্রচার হওয়ায় রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্ত-আগমন দর্শন করিতে, গোপীনাথকে সঙ্গে করিয়া অট্টালিকায় উঠিলেন। ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে পোঁছিয়া পায়ে নুপুর পরিলেন, এবং খোল ও করতাল বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীতধ্বনি উঠিল। দুই শত ভক্ত বহুতর মৃদঙ্গ ও করতালের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুকে দর্শন করিতে চলিলেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানকে ভীষণ ভাবিয়া ভজন করেন, তাঁহারা ভয়ে ভীত হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, "তুমি দয়াময়" "তুমি দয়াময়" ইত্যাদি চাটুবাক্য বলিতে বলিতে গমন করেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর গণ, তাঁহারা ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয় ভাবিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে, নূপুর পায় দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন।

কৃষ্ণমঙ্গল গীত শুনিয়া রাজা বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, একি সুধা-বর্ষণ? কথা একটীও ত বুঝিতেছি না, কেবল স্বর শুনিয়া অন্তরে ভক্তির উদ্রেক, অঙ্গ পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য!

গোপীনাথ বলিলেন, "মহারাজ! আমাদের বদান্যবর মহাপ্রভু জীবকে এই সংকীর্ত্তন-রূপ সম্পত্তি দান করিয়াছেন।"

ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না; মন্দির দক্ষিণে রাখিয়া কাশী মিশ্রের আলয়ে গমন করিলেন। এই স্থানে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন রহিয়াছেন। সেই আলয়ের নিকট পর্য্যন্ত আসিলে, প্রভু তাঁহার নীলাচলস্থ সঙ্গীগণ লইয়া বাহির হইলেন।

তখন প্রভুর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর। প্রভুর বদন আনন্দে প্রফুল্ল, পদ্ম-সদৃশ নয়ন হইতে ধারা বহিতেছে।

তখন নয়নে নয়নে মিলন হইল। সকলের নয়ন প্রভুর শ্রীমুখে, আর প্রভুর নয়ন সকলের মুখে! সকলে দেখিতেছেন যে, প্রভু তাঁহাকেই দেখিতেছেন, আর তাঁহাকে নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা প্রাণের সহিত আহ্বান করিতেছেন।

সমাপ্ত